কেনেথ অ্যাণ্ডারসন

বাঘের গর্জন

ভাষান্তর : অলক কুমার সেন ও পবিতোষ পাল

শৈব্যা ● প্রকাশন বিভাগ

৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

THE TIGER ROARS

BY KENNETH ARDERSON

Bengali Translation Published by arrangement with George Allen & Unwin Ltd. London.

প্রচ্ছদ : সঞ্জয় দে

মূল্য : পনের টাকা

প্রকাশক :
দুলাল বল
শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মুদ্রাকর :
শ্রীরণজিৎ কুমার মণ্ডল
লক্ষ্মীজনার্দন প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

To the old India where I lived in happiness for so many years; and to the new India in her venture for freedom and democracy and a new way of life.

Kenneth Anderson



সূচীপত্র

ভূমিকা

পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বইয়ের ভূমিকা মোটেই জনপ্রিয় নয়। খুব কম জনই ভূমিকা পড়ে থাকেন। সত্যি কথা বলতে কি, পাঠক বই কেনেন বইটি থেকে কতটা আনন্দ, উদ্দীপনা ও জ্ঞানলাভ করা যাবে তা ভেবেই। তাই সে-ক্ষেত্রে ভূমিকার কোন মূল্যই নেই। তবুও আমি কিছু বলতে চাই, প্রাণী সংরক্ষণ প্রসঙ্গে। তারপর না হয় পড়বেন দক্ষিণ ভারতের অরণ্য-অভিযানের রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত। বন্যপ্রাণীদের আরণ্যক জীবন ও তাদের সৌন্দর্যকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই প্রাণী সংরক্ষণ জরুরী বলে আমি মনে করি। শুধুমাত্র যে বন্য প্রাণীদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই এই সংরক্ষণ প্রয়োজন তা নয় বরং আমাদের উত্তরসূরীরাও যাতে অরণ্য প্রান্তরে বন্য প্রাণীদের উপস্থিতির সীমাহীন সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে পারেন সেজন্যও প্রাণী সংরক্ষণ জরুরী। ঠিক আজ যেমনটি আমরা উপভোগ করছি, আনন্দ পাচ্ছি।

এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দেরী হয়ে গিয়েছে। এখনই কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলিকে সচেষ্ট হতে হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সরকারের উপরে চাপিয়ে দিলেই চলবে না, বরং প্রত্যেক শিকারীরও দায়িত্ব রয়েছে, দায়িত্ব রয়েছে প্রতিটি ভারতবাসীর।

বন্যপ্রাণী ও পাখিদের জন্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে সত্যি, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। এ ব্যাপারে যে আইন রয়েছে তাকে কোনভাবেই কার্যকর করা যাচ্ছে না। আরেকটি জিনিস, বন দেখাশুনার দায়িত্ব যে প্রহরী ও কর্মীদের উপর তাদের বেতন অতি সামান্য। এছাড়া রয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি।

গোটা মহীশূর রাজ্যের এবং মাদ্রাজের সালেম জেলার বাঘ ও চিতাবাঘ তো অবলুপ্তির পথে। গ্রামবাসীরা সরকারের কাছ থেকে চাষের জমিতে পোকামাকড় মারার জন্য বিনা পয়সায় পাওয়া বিষ একের পর এক বাঘ ও চিতাবাঘ মারার কাজে লাগাচ্ছে। সাধারণতঃ বাঘ ও চিতাবাঘ যে সব প্রাণী শিকার করে গ্রামবাসীরা তাদের দেহে বিষাক্ত এই বিষ মাখিয়ে রাখে। এক সময় বাঘ বা চিতাবাঘ ফিরে এসে সেই মাংস খেয়ে মৃত্যুমুখে

ঢলে পড়ে। এমনি ভাবে গ্রামবাসীদের হাতে বাঘ ও চিতাবাঘ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। এই একই পথে শিয়াল, হায়না, কাক এবং শকুনও বিষাক্ত মাংস খেয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে।

বন থেকে হরিণের দলও নিশ্চিহ্ন হচ্ছে ব্যাপক ভাবে। প্রতি বছর গরমকালে চোরা শিকারীর হাতে মারা পড়ছে অসংখ্য হরিণ। সাধারণতঃ জলাশয়ে হরিণ জল খেতে এলে তখন শিকারীর দল তাদের গুলি করে হত্যা করে। অথচ এইসব প্রাণীদের রক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর তারা সামান্য কয়েকটা টাকা বা এক টুকরো হরিণের মাংস পেয়েই চুপ করে যায়।

তাই মনে হয়, অবলুপ্তিই ভারতের বন্য-প্রাণীদের অনিবার্য পরিণতি। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং জনগণকে এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। বাস্তব অবস্থাকে অনুধাবন করতে হবে। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।

এবার আসি বইয়ের কাহিনীর প্রসঙ্গে। গল্প শোনাতে গিয়ে আমি প্রায়ই অরণ্যবাসী মানুষ ও জীবজন্তুর বৈচিত্র্যময় জীবনকাহিনী বলেছি। শুধু অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে মগ্ন যা থেকে শুনিয়েছি অরণ্যের রোমাঞ্চকর ইতিহাস, তার অপূর্ব সুন্দর দৃশ্যাবলী বর্ণনা করেছি, বনের অজস্র রকমের গন্ধ ও অদ্ভুত সব শব্দের উৎস সন্ধান করেছি। অরণ্য জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। সেখানকার প্রাণ-চাঞ্চল্য ও জীবন নাটকের করুণ পরিণতির কথাও বলার চেষ্টা করেছি।

আশা করি, শিকার সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা কাহিনীগুলো পড়ে আনন্দ পাবেন, ঠিক আমি যেমন পেয়েছি সেগুলি লিখে।

গ্রন্থকার

মাঞ্চির অনভিজ্ঞ নরখাদক

১

বিশাল বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে একেবেঁকে চলে গিয়েছে একটি সরু পথ। চারিদিকে শুধু বাঁশ আর বাঁশ। বাঁশগুলো পথের ওপর নুয়ে পড়ে যেন তোরণ তৈরী করেছে। আর লম্বা সুন্দর পাতাগুলো তার বুকে এনেছে অপরূপ সৌন্দর্য্য। সেগুলো এমনভাবে সাজানো রয়েছে মনে হচ্ছে যেন বিশাল ফুলের তোড়া সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

গোটা বাঁশবনে এখন বসন্তের ছোঁয়া। প্রতিটি বাঁশগাছ তার শীর্ষভাগ পর্যন্ত নিজেকে সাজিয়েছে হাজার হাজার বীজের সমারোহে। বীজগুলো দেখতে অনেকটা পাকা গম দানার মতো। তবে আকারে ছোট। তাহলেও অসংখ্য বীজের ভারে নুয়ে পড়েছে বাঁশগাছগুলো। আর জঙ্গল পথে ছুটে আসা বাতাসের ছন্দে আন্দোলিত হচ্ছে গোটা বাঁশবন।

বৃষ্টির সময় বাঁশগাছের বীজেরা ভূমিশয্যা নেয়। গোটা অঞ্চল জুড়ে বিছিয়ে দেয় বিরাট এক কার্পেট। এই বনপথেও তৈরী হয়েছে একটি ঘন আবরণ। মাটিতে পড়ে থাকা এই সব বীজের মধ্যে অধিকাংশই বিবর্ণ হয়ে গেছে; এরই মধ্যে এখানে ওখানে দু' একটি বীজের বুকে প্রাণের স্পন্দন রয়েছে। বীজের তৈরী কার্পেটটিকে দেখে যেন মনে হচ্ছে করাত দিয়ে কাটা কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। এর রয়েছে একটা তরঙ্গায়িত সত্তা। শব্দকে শুষে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে এর। বাঁশবনে এখন যে হত্যাকারী শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেও তাই নিঃশব্দে ছুটে চলেছে এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে।

এদিকে, মাথার উপরে হাজার হাজার লম্বা লেজওয়ালা ছোট টিয়ার দল পা দিয়ে ডাল আকড়ে ধরে ঝুলতে ঝুলতে চীৎকার করে চলেছে। তাদের মাথাগুলো নীচের দিকে, কিন্তু বাঁকা লেজ ওপরে তোলা। ছুরির মতো ধারালো বাঁকানো ঠোঁটে তারা খুঁটে খাচ্ছে দানা। সাবধানে খোসা ছাড়িয়ে

মুখে ঢোকাচ্ছে। গিলে ফেলার আগেই সেগুলোকে পরিণত করছে মিহি পাউডারে।

টিয়া পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে তুলনা করলে এদের চেহারা নেহাতই ছোট, পোষমানানো হয় যে অষ্ট্রেলিয় টিয়াগুলো সেগুলোর অর্ধেকেরও ছোট এরা। কিন্তু রঙবাহারে কারো চেয়ে কম নয়। চিকণ সবুজ থেকে ময়ূর নীলিমা, কারো আছে বিবর্ণ হলুদ রঙা ডানা, মাথার পরে গোলাপের গোলাপী আভা অথবা রক্ত লালের চুম্বন, অনেকের রঙ সবুজ, গলায় লাল কালো ছোট্ট হার পরানো।

জঙ্গলের সরু পথ ধরে সাবধানী পা ফেলে এগিয়ে চলেছে এক নিঃসঙ্গ পথিক। মাথার উপরে যে অসংখ্য টিয়া ও অন্য পাখির দল চিৎকার করে চলেছে সেদিকে তার কোন মনোযোগ নেই। টিয়া ছাড়া অন্য যে হাজার হাজার পাখী রয়েছে মাথার উপরে তার মধ্যে রয়েছে বুনো পায়রা ও ঘুঘু। বাঁশের বীজ খেয়েই এরা জীবন ধারণ করে।

নিঃসঙ্গ সেই পথিকের দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ। তার অনুসন্ধানী চোখ মাঝে মাঝে দু'পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে সে। কখনো থেমে যাচ্ছে। বাঁশ ঝোপগুলো সতর্কভাবে পরীক্ষা করছে। তার তীক্ষ্ণ, চঞ্চল চোখ দুটি বাঁশঝাড়ের ঘনত্ব ভেদ করে দেখতে চাইছে ঝোপের আড়ালে কোন কিছু লুকিয়ে রয়েছে কিনা। তার কান দুটি উৎকর্ণ চারপাশ থেকে ছুটে আসা শব্দ শিকারে। এই জঙ্গলপথে পথিক আতঙ্কজনক শব্দ শোনার জন্য সময় গুনছে তা হলো বাঁশগাছ ভেঙ্গে পড়ার তীক্ষ্ণ ধ্বনি অথবা পরিতৃপ্তির সঙ্গে কিছু খাবার গম্ভীর আওয়াজ অথবা বীজের কার্পেটে ও ঝড়ে পড়া পাতার বুকে চকিত পায়ের আওয়াজ।

অরণ্যপথিক বুনো হাতি অথবা তাদের দলের মুখোমুখি হবার ভয়ে শঙ্কিত। বছরের এই সময় এই অরণ্যে ঐ মারাত্মক জন্তুটিকে প্রায়ই চোখে পড়ে। কিন্তু হত্যাকারীর পদশব্দ শুনে নেওয়া পথিকের পক্ষে খুবই কঠিন। কেননা হত্যাকারী প্রথমেই পথিকের উপস্থিতিকে অনুভব করবে তারপর তাকে অবলোকন করবে। পাখির দলের মতো কিচির মিচির করে কিংবা নিরামিষ খাবারের সন্ধানে ছুটে যাওয়া হাতির দলের মতো মাটি কাঁপিয়ে এই হত্যাকারী আসবে না। বরং সে আসবে নিঃশব্দে। তাছাড়া জঙ্গলে এখন যে ঘাতক রয়েছে সে কোনমতেই নিরীহ নয় এবং নিরামিষাশীও নয়। বরং ঘাতক

শয়তানির প্রতিমূর্তি। অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে মৃত্যুকে নিশ্চিত করার ব্যাপারে তার জুড়ি নেই। এই মুহূর্তে সে খুব ক্ষুধার্তও।

জঙ্গলপথে হেঁটে চলেছে যে মানুষটি সে একজন পূজারী। দক্ষিণ ভারতের সালেম জেলার অরণ্য অঞ্চলের আদিবাসী উপজাতির মানুষ সে। যে সরু পথটি দিয়ে সে চলেছে সেটি আয়ুর পল্লী থেকে শুরু হয়ে বনের মধ্য দিয়ে সোজা চলে গিয়েছে দশমাইল দক্ষিণে পাহাড়ের বিশাল উপত্যকার ঢালু এলাকায় গড়ে ওঠা ছোট্ট গ্রাম মাঞ্চির দিকে।

পথটি অবশ্য ছুটে গেছে উপত্যকার দিকে, যেমন ছুটে গেছে পার্বত্য ঝর্ণা। এরা দু'জন একে অন্যকে আলিঙ্গন করেছে বারে বারে। আবার কখনো বা বিচ্ছেদে থেকেছে পাশাপাশি। সাক্ষী থেকেছে পূবে ও পশ্চিমে সমান্তরালভাবে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড় শ্রেণী, আর সাক্ষী থেকেছে অরণ্যের ধারাবাহিক বিস্তার। জঙ্গলের মধ্যে পথটিকে কখনো দেখা যাচ্ছে, কখনো সে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বন্য বাতাসের মৃদুমন্দ প্রবাহে নুয়ে পড়া বাঁশগাছের আড়ালে।

পূজারী যখন বুনো হাতির পদশব্দ শোনার চেষ্টায় ব্যগ্র ঠিক তখনই প্রায় অদৃশ্য স্বচ্ছ মাকড়সার দল এসে তার মুখের ওপর জাল বাঁধার চেষ্টা করছে। সে রেগে গিয়ে দু'হাতের চেষ্টায় ছিঁড়ে ফেলছে সেই জাল আর তাতেই বড় বড় লম্বা পা-ওয়ালা হলুদ-কালো-লাল মাকড়সার দল রেগে উঠছে। লম্বায় এই মাকড়সাগুলো দু' ইঞ্চির বেশী, তাদের জাল এক গাছ থেকে অন্য গাছে বিস্তৃত। এদের লালা দিয়ে তৈরী তন্তুগুলো অবিশ্বাস্যরকমের শক্ত এবং যা আট থেকে দশ ফুট বিশিষ্ট বিরাট এক অঞ্চলকে ঘিরে তৈরী করেছে জটিল অথচ সুচারু কারুকাজে মণ্ডিত অপূর্ব শিল্প। এই জালে ঘনীভূত হয়েছে ভোরের শিশির। আর এই শিশির বিন্দুগুলো সূর্যের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে বাঁশঝোপের মধ্য দিয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে চুম্বন করছে ভূমিখণ্ডকে।

গোটা বন এখন নিথর শান্তিময়, শুধু নীরবতা ভাঙছে পাখিদের কল-কাকলী।

কিরা, সেই পূজারী, ঘন বাঁশ ঝোপের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সে এতক্ষণে একটা ব্যাপারে সুনিশ্চিত হয়েছে যে, সামনের ঐ ঝোপের আড়ালে কোন হাতি লুকিয়ে নেই। কিন্তু মরিচ রঙা আবরণের যে ঘাতক অন্তরাল থেকে তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তাকে পূজারী দেখতে পায়নি।

হঠাৎ পূজারী কিরা শুনতে পেলো প্রচণ্ড গর্জন, দুবার—হালুম্! হুম! তারপরেই বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কিরা একবার মাত্র ঘুরে দাঁড়াবার সময় পেয়েছিলো। কিন্তু দু'টি হিংস্র কঠিন থাবার চাপে মুহূর্তে নিশ্চল হয়ে গেলো। বাঁচাও বলে একবার মাত্র চীৎকার করতে পেরেছিলো সে। তারপর তার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেলো। ওপর থেকে যে পাখীগুলো এই ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখে মুহূর্তের জন্য তাদের কিচির মিচির বন্ধ করে দিয়েছিল, আবার আগের মতো তারা ডাকতে শুরু করলো। শুধু তাই নয়, তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলো বাঘের শিকার থেকে ছিটকে আসা মাংস ও হাড়ের জন্য।

এদিকে অদূরে পাহাড়ের বুকে একদল লেঙ্গুর বানর হুপ্ হুপ্ শব্দ তুলে আনন্দে আহার করছে। তাদের সেই আওয়াজ সংকীর্ণ উপত্যকার বুকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে। এরই মধ্যে লেঙ্গুর বানর প্রহরীর তীক্ষ্ণ কানে ধরা পড়লো দূরাগত বাঘের গর্জন, ধরা পড়লো আতঙ্কিত মানুষের আর্তনাদের ক্রমবিলীয়মান ধ্বনি। সে জানে বাঘ তার হত্যা শেষ করেছে। তবুও সে শুরু করলো সংকেত-কান্না। নিজের দেহটাকে উঁচুডালের পাতার আড়ালে রেখে একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রইলো হত্যাকারীর সম্ভাব্য গতিপথের দিকে।

হা! হায়! হায়! এইভাবে ডাকতে থাকে লেঙ্গুর বানর প্রহরী। আর এই আওয়াজ শুনেই অন্যান্য লেঙ্গুর বানরেরা খেলা বন্ধ করে আতংকে জড়সড় হয়ে গাছের মগডালে উঠে যাচ্ছে। যে সমস্ত হরিণ ও অন্য প্রাণীরা জঙ্গলভূমিতে বিচরণ করছিল, যাদের তীক্ষ্ণ কানে মৃত্যু আর্তনাদ ও বানরদের সঙ্কেতধ্বনি প্রবেশ করেছে তারাও দ্রুত বিভীষিকার উপত্যকা থেকে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

সময় বয়ে যায়। আরণ্যক জীবনে ফিরে আসে স্বাভাবিকতা। পাখিরা কয়েকমুহূর্তে ভুলে যায় বিয়োগান্ত ঘটনাটি। কিন্তু বানররা ও অন্যান্য প্রাণীরা শান্ত হতে সময় নেয় প্রায় এক ঘণ্টা। মাঝি গ্রামের পূজারীরাও দু'এক মাসের মধ্যেই তাদের জাতভাই কিরার মৃত্যুর কথা ভুলে যেতো যদি না পনেরো দিনের মাথায় আর একটি হত্যা সংঘটিত হতো, আর তারও দশদিন বাদে তৃতীয় হত্যাকাণ্ডটি।

পূজারীরা তাই এই ঘটনাগুলোর স্মৃতি ভুলতে পারে না। আতঙ্কিত ভয়

এসে তাদের গ্রাস করে। তাদের ছোট্ট গ্রামের আকাশে ঘনিয়ে আসে কালো মেঘ। কেননা, এক নরখাদক এসে আস্তানা গেড়েছে অদূরের জঙ্গলে।

মাঞ্জিগ্রামের পূজারীরা বন্য সম্পদ খেয়েই জীবন ধারণ করে। উঁচু গাছ আর পাহাড়ের বুকে গড়ে ওঠা বিরাট মৌচাকগুলো থেকে তারা বুনো মধু সংগ্রহ করে। গোসাপ ধরে খাবার জন্য। অনেক সময় সেগুলো বিক্রীও করে। কেননা তাদের ধারণা যে এর ল্যাজের মধ্যে আশ্চর্যগুণ আছে। এছাড়াও এরা আয়ুর্বেদিক শেকড় সংগ্রহ করে ওষুধ হিসেবে বিক্রী করে, বাঁশ কাটে, ঘাস তোলে, নবঅঙ্কুরিত ফল তুলে নেয়। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তারা তাদের জীবনের ধারা পাল্টায়। গাছগাছড়া বিক্রী করে এরা যে অর্থ উপার্জন করে তা দিয়ে ইউরোপ বা আমেরিকায় একজন সাধারণ মানুষ শুধু তাদের পোষা কুকুরের খাদ্য জোগাড় করতে পারে।

মাঞ্জিগ্রামের পূজারীদের জীবিকা, এমনকি এদের অস্তিত্বের সবটুকু ঐ জঙ্গলের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। অথচ সেই জঙ্গলেই এখন ভয়ার্ত বিভীষিকা বাসা বেঁধেছে। যে মানুষটি প্রথম উষার আলোয় তার ছোট্ট কুটির ছেড়ে দূরে বনপথে যাত্রা করেছে সে জানে না সেই রাত্রে সে ফিরে আসতে পারবে কিনা। নারী অথবা শিশু—কেউই নিরাপদ নয়। কেননা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিকার দুটি হলো যথাক্রমে ন'বছরের এক বালিকা এবং চৌদ্দ বছরের এক গর্ভবতী বধূ।

জঙ্গলের বুকে এই যে হত্যাগুলো হয়ে গেলো পর পর সেগুলোর ব্যাপারে মাঞ্জিগ্রামের কারুর কিছু করার নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো আমার পুরানো বন্ধু পূজারী বায়রা। এই বায়রা আমার অনেক অরণ্য অভিযানের সঙ্গী। কেমপেকারাইর নরখাদককে মারার জন্য আগে একবার সে আমাকে ডাক দিয়েছিল। এবার আমাকে সে ডাক দিয়েছে মাঞ্জি গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে।

এবার আর পত্রবাহক পাঠায়নি, বায়রা নিজেই এসেছে। মাঞ্জি থেকে মাইল দশেক হেঁটে সে পৌচেছে আয়ুর গ্রামে। তারপর আরো ন'মাইল পথ হেঁটে ডেনকানিকোটা শহরে, এবং সেখান থেকে একটি বাসে চড়ে সোজা ব্যাঙ্গালোরে এসেছে সে।

বায়রা আমাকে নরখাদকের হত্যা অভিযান সম্পর্কে যে গল্প শোনালো তা থেকে এটা বোঝা গেলো যে তিনটি হত্যাই সংঘটিত হয়েছে অপেক্ষাকৃত

দ্রুততার মধ্যে, যার সময় সীমা হলো মাত্র চব্বিশ দিন। শুধু তাই নয়, প্রতিটি ঘটনাই ঘটেছে মাক্ষি থেকে চার মাইলের মধ্যে। আয়ুর থেকে কেমপেকোরাই পর্যন্ত গভীর উপত্যকাটি বিস্তৃত, আমি যার নাম দিয়েছি 'মাকড়সা উপত্যকা' (কেননা সেখানে বড় বড় মাকড়সা বাস করে), হত্যাকাণ্ডগুলি তারই কাছাকাছি ঘটেছে।

হত্যাকাণ্ডগুলি থেকে আরও একটা জিনিস পরিষ্কার যে, ঘাতকটি মানুষ মারার ব্যাপারে নেহাতই অনভিজ্ঞ। হয় সে বয়সে তরুণ, কোন কারণে নরখাদক হয়েছে অথবা সে আহত, আছে তার প্রচণ্ড খিদে, কিন্তু সাধারণ শিকার ধরার সামর্থ্য নেই অথবা এমনও হতে পারে যে সে হয়তো এক বাঘিনী, তার বাচ্চাদের খাওয়াবে বলে মানুষ হত্যা করছে। অবশ্য শেষের সন্দেহটি নেহাতই অমূলক। কেননা, আশে পাশের পাহাড়ে বুনো জন্তুর অভাব নেই। বিশেষ করে আয়ুর, গুসহাটি ও বেট্টামুগালামের গ্রামাঞ্চলে তো গবাদি পশুর ছড়াছড়ি।

সবদিক বিবেচনা করে বলা যায় সে এক নতুন আগন্তুক। কোন অভিজ্ঞ নরখাদক এত তাড়াতাড়ি একই জায়গার মধ্যে একাধিক মানুষ হত্যা করে না। যেমন করেছে এই বাঘটি। অভিজ্ঞরা এই ব্যাপারে ভারী চালাক। তারা অনেক মাইল বিস্তৃত বনাঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়ে সুবিশাল অরণ্যকে স্পন্দিত করে আচম্বিতে এবং অনিয়মিত অবসরে মানুষ শিকার করে। আর এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের জন্যেই অভিজ্ঞ নরখাদক শিকার করা অত্যন্ত কঠিন।

আমার এখন প্রথম কাজ হলো বাঘটাকে আর অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ না দেওয়া, যাতে সে আরো বেশী মারাত্মক না হয়ে ওঠে। এই সাবধানতা অবলম্বনের অবশ্য আরও একটি কারণ আছে। গ্রামবাসীরা যদি প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায় বাঘটিকে বুলেট বিদ্ধ করে অথবা অন্য কোন উপায়ে তাকে আহত করে তাহলে সে আরও বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, হবে বিজ্ঞও। তখন সে হবে এক মারাত্মক নরখাদক।

মাক্ষিগ্রামের অদূরে যে অঞ্চলে বাঘটির উৎপাত সেই অঞ্চলটি আমার নখদর্পণে। কেননা, বহু বছর আমি সমান্তরালভাবে বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত এই উপত্যকাময় ঘন বাঁশবনে ইতস্ততঃ পদচারণা করেছি। এই অঞ্চলটি উত্তরে দক্ষিণে প্রসারিত হতে হতে ক্ষীণতনু ঝর্ণার সাথে মিলেমিশে দক্ষিণগামী হয়ে অবশেষে সোপাথিতে চিনার নদীর সাথে মিশে গেছে। এই

দুই পর্বতশ্রেণীর মধ্যে পূবের পর্বতমালা অপেক্ষাকৃত উঁচু। এর সুউচ্চ শৃঙ্গটির নাম গুধেরায়ান, যার বুকে আছে ছবির মতো এক অরণ্য আবাস—কোদেকারাই ফরেষ্ট লজ।

কেমপেকারাই গ্রামটি পশ্চিম পর্বতমালার ঢালু উপত্যকায় অবস্থিত, সেখান থেকে সামান্য দূরে বয়ে চলেছে একটি ছোট্ট ঝর্ণা। এবারের পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে আগের অভিযানের পারিপার্শ্বিকতার তেমন কোন তফাত নেই, তবে কেমপাকারাইর নরখাদকটি ছিল অনেক বেশী অভিজ্ঞ। মাঞ্চি গ্রামের আশেপাশে আমি অতীতে বহুবার শিকার করেছি। তাই এই অঞ্চল আমার জানা। সর্বোপরি এবারের বাঘটি তার গতিবিধি সীমায়িত রেখেছে আয়ুরের কাছে মাঞ্চির উত্তরাঞ্চলে। তাই সে এক সহজ শিকার।

বায়রার পরামর্শে আমার ব্যাগের মধ্যে বোঝাই করি এক সপ্তাহের খাবার—চাপাটি বানানোর আটা, পাউরুটি, মাখন, তরিতরকারী বিশেষ করে আলু আর চা, কফি, চিনি। কাঁধে তুলে নিই তাঁবু খাটাবার ত্রিপল এবং বেডিং। সব নিয়ে বোঝাই করি স্টুডিবেকারে। তারপর যাত্রা শুরু করি ডেনকানিকোটা হয়ে আয়ুরের দিকে। আয়ুর থেকে মাঞ্চি অবধি পায়ে হাঁটতে হবে, তার মানে কাঁধে বোঝা নিয়ে আমাদের মাইল দশেক চড়াই ভাঙতে হবে। সৌভাগ্যবশতঃ পথটা খুব দুর্গম নয়।

এই ধরনের অভিযানে আমি যতটা সম্ভব টিনভর্তি খাবার না নেওয়ার চেষ্টা করি। যদিও বহন করার পক্ষে তা অত্যন্ত সুবিধাজনক, কিন্তু ভারতের গ্রামবাসীদের মতো আমিও আমার খাবার টাটকা ও তাজা পছন্দ করি। আর এরফলেই আমাকে ভারতীয় ও ইউরোপীয়ান সমেত পৃথিবীর সমস্ত শহুরে সৌখীন লোকের অর্ধেকের বেশী লোক যে রোগে ভোগে, সেই পেটের গোলমালে ভুগতে হয়নি।

তাঁবু চাপিয়ে দিলাম বায়রার মাথায়। আমি কাঁধে নিলাম বেডিং। ময়দা আর তরকারী ভর্তি কিডব্যাগ দিলাম বায়রাকে। রাইফেল সহ বাকী মালপত্র রইলো আমার হেফাজতে। ওজন কম ছিল না। কিন্তু বায়রার কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। সে দিব্যি গট গট করে আমার সামনে সামনে চলেছে।

গোটা উপত্যকাটি গরম। তার উপর এই অঞ্চলের আবহাওয়া এতই আর্দ্র যে অল্পেতেই ঘেমে নেয়ে উঠছি। তাছাড়া রয়েছে ভয়। আমার সঙ্গীটি সামনা সামনি হেঁটে যখন তখন বুনো হাতির নজরে পড়তে পারে, আর

পিছিয়ে থাকায় আমাকে পড়তে হতে পারে বাঘের খপ্পরে। বিশেষ করে নরখাদকরা তো শেষের মানুষকেই আক্রমণ করে। আর এই দু'টির কোনটি যদি ঘটে তবে আমাদের পক্ষে এখন তার মোকাবিলা করার সাধ্য নেই। কেননা দুজনের কাঁধে বোঝা। অবশ্য আমরা দু'জনের কেউই বাঘ বা হাতির কথা ভাবতে পারছি না। মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু একটাই চিন্তা, কখন নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে কাঁধের বোঝা মাটিতে নামাবো।

অবশেষে আমরা পৌছলাম। রাইফেল ছাড়া বাকী সবকিছু নামিয়ে রাখলাম ছোট্ট পুকুরের ধারে। এখুনি গরম গরম চা চাই কাপের পর কাপ। কেটলীতে পুকুরের জল ভরে আনতে বললাম বায়রাকে। তারপর আগুন জ্বালাতে বললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গরম চা পান করতে করতে জীবনের উষ্ণতা'কে নতুন করে খুঁজে পেলাম।

এদিকে, এই সময়ের মধ্যে বারবার গ্রামবাসী বন্ধুরা এসে জড়ো হয়েছে আমাদের পাশে। এরা সবাই পূজারী—খালি পা, পবিধানে সামান্য কাপড়, কিন্তু তারা সবাই পেরেকের মতো শক্ত। পুরুষদের পরনে ছোট্ট ধুতি, মেয়েদের উর্দ্ধাঙ্গে কোন আবরণ নেই। ছোট শাড়িতে বাকিটুকু ঢাকা। শিশুরা একেবারে উলঙ্গ।

তারা বায়রাকে অভিনন্দিত করছে। বায়রা শোনাচ্ছে সে কিভাবে ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে তার প্রিয় বন্ধুকে ধরে এনেছে তাদের সাহায্যের জন্য। শ্রোতা'দের মধ্যে বিস্ময়ের গুঞ্জন ওঠে। আমি এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে কয়েকটি কিশোরকে জ্বালানী কাঠ আনতে বলি। একটি লোককে ডেকে অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি ও জলের বোতল দিয়ে জল আনতে বলি। তারপর সেদ্ধ কবা মাংস আর মাখন ও জেলি মাখানো পাঁউরুটি খেতে খেতে ওদের বলি বাঘটি সম্পর্কে তোমরা যা জানো বল।

বায়রা বাঘটি সম্পর্কে যা বলেছে তার চেয়ে বেশী কিছু জানা গেল না। শুধু একটি নতুন তথ্য পেলাম। আগের দিন সকালে বায়রা যখন ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল, ঐ দিনই বেলা তিনটে নাগাদ গ্রামের চারজন মেয়ে পুকুর থেকে জল আনতে যায়। তারা একে অন্যকে নিরাপত্তার কঠিন নজরে বেঁধে রাখে।

মেয়েরা জল তুলে যখন কুটিরের পথে ফিরছিল তখন দলের সবচেয়ে প্রবীন মহিলাটি পঞ্চাশগজ-দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা ঝোঁপ যেন কেঁপে উঠতে দেখে।

সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তাকে দেখে সঙ্গীরাও সবাই তাকায় ঐ ঝোপটির দিকে। আর তারা সবাই ঝোপের নীচে তাকিয়ে দেখে মাটিতে এক বিরাট বাঘের মুখ। সে ক্ষুধার্ত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখ দিয়ে ঝরছে লালা। প্রচণ্ড চীৎকার করে তারা কলসী ফেলে দিয়ে দৌড়তে শুরু করে। ওখান থেকে গ্রাম্য কুটিরের দূরত্ব দুশো গজের মতো। ওদের ভাগ্য ভাল বাঘটি এবার আক্রমণের চেষ্টা করেনি। ওরা সবাই নিরাপদে ফিরে এসেছে।

সেই চারজন মেয়ের মধ্যে দু'জন এই মুহূর্তে আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের একজন দু'হাত প্রসারিত করে এক গজের মতো দূরত্ব দেখিয়ে বললো, বাঘের মাথাটা ছিল এত বড। তার সঙ্গীনী, বয়সে সে কিশোরী, মাথায় যার দুষ্টু বুদ্ধি সুরসুর করছে, সে মুচকী হেসে বলল—বাঘটা ইচ্ছে করলে তোমাকে শুদ্ধ আমাদের চারজনকে গপ করে গিলে ফেলতে পারতো। তার হাসি যেন বলছে. বাঘের পেটে আমার সময়টা নেহাত মন্দ কাটতো না, বিশেষ করে তার সাহচর্যে।

এই নতুন সংবাদটিতে আমরা খুব খুশী হলাম। বায়মার চোখের তারায় দেখলাম তৃপ্তির আলো। কেননা, সে একজন প্রবীণ শিকারী, তাই সে জানে যে কাজটা এবার কত সহজতর হয়ে গেলো। যেহেতু বাঘটা কাল বিকেলে ছিল পুকুর ধারে, তাই আজ সন্ধ্যায় সে হয়তো সেখানে নাও আসতে পারে। কিংবা কে জানে এখনই সে আমাদের ওর নজর রেখেছে কিনা!

এই নতুন ঘটনাটি শোনার পর আমি আবার সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলি। না, পুকুর ধারে তাঁবু খাটাবো না। আবার গ্রামের মধ্যে তাঁবু খাটালে অনেক অসুবিধা দেখা দেবে। তাই ভেবে চিন্তে গ্রাম থেকে কিছু দূরে একটা কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তাঁবু খাটালাম।

পুকুর ধারে বাঘটার উপস্থিতি আমার আগের পরিকল্পনাটাকে ভেস্তে দিয়েছে। এই ধরনের ঘটনায় প্রতীক্ষার প্রহর বেড়ে যায়। নরখাদকের জন্য অপেক্ষার সময় বুঝি ফুরোয় না। অনেক বছর আগে, মাত্র ক'মাইল দূরে কেমপেকারাইর অভিযানে আমি সারারাত ধরে নরখাদকের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম, যাতে সে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমার প্রতীক্ষা বিফলে যায়। তবে এ বাঘটি অভিজ্ঞ নয় বলে হয়তো আক্রমণ করে বসতে পারে। তাই পুকুর ধারে সাদা ত্রিপলের তাঁবু না খাটিয়ে আমি

নিরাপদ দূরে চলে এসেছি। বছর কয়েক আগে যে নরখাদক এমন পরিবেশে আক্রমণে পিছপা হতো না এক্ষেত্রে এই নতুন হত্যাকারী হয়তো ভয়ে দূরে থাকবে। আমার যুক্তিগুলো বায়রা অস্বীকার করতে পারে না।

কিন্তু সেই রাতে যা ঘটলো তা আমাদের দুজনকেই ভুল প্রমাণিত করলো।

সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ই আমি খাবার খেয়ে নিলাম। এটাই হলো বাড়ী থেকে আনা মাংসের শেষ টুকরো। এবার আর চা খেলাম না। শুধু তাই নয়, বলা যেতে পারে জলও খেলাম না। কেননা যে রাতে নিদ্রাহীন চোখে নরখাদকের সন্ধান করতে হবে সে রাতে পেটে তরল প্রবেশ করলে আর রক্ষে নেই। প্রকৃতি তার নিজের ইচ্ছেতেই চলবে। তাই শিকারী যদি সামান্যতম অঙ্গ সঞ্চালন করে তাহলে তার অন্বেষণই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

রাতটি গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। তাই আগের অভিযানের পরিকল্পনা বদলে নিলাম। সেটা ছিল জ্যোৎস্না আলোকিত রাত। আর সে যাত্রায় আমি কুয়োতে দড়ি টেনে জল তোলার ভান করে বাঘটার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু আজ রাতে আলোর মুখ দেখা যাবে না। তাই নিজেকে উন্মুক্ত করার মতো বোকামি আর কিছুতে নেই। কেননা, এক্ষেত্রে হত্যাকারী আমার উপস্থিতি অনুভব করবে এবং আমাকে দেখতে পাবে, কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাবো না। এমন কি যথেষ্ট দেরী হবার আগে পর্যন্ত তার গর্জনও শুনতে পাবো না।

আমি তাই আমার পরিকল্পনাটা সামান্য অদল বদল করে নিলাম। কাছের বাবুল গাছটাকে পেছনে রেখে বসলাম। পেছনে ফুটকুড়ি দূরেই জল আর সামনে জঙ্গল। মনে মনে ঠিক করে নিলাম বসে থাকবো চুপচাপ একদম নড়াচড়া করবো না। কাছ থেকে নরখাদকটি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না। কেননা, তাকে হয় সামনে থেকে নয় পেছন থেকে আসতে হবে। আর নিশ্চলভাবে বসে থাকলে আমি যেমন তার পদশব্দ শুনতে পাবো অন্যদিকে বাঘটিরও ধাঁধা লাগাবে। হয়তো সে আমাকে নাও দেখতে পারে। যদি দেখেও তবু অনভিজ্ঞ বলে আমার অচঞ্চলতায় অবাক হয়ে যাবে। হয়তো রহস্য সমাধানে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসবে। আমার মনে হয়, সে ক্ষেত্রে সে অবিরাম গর্জন করতে থাকবে।

বায়রা আমার পরিকল্পনাটা মন দিয়ে শুনলো ঠিকই কিন্তু সে যা বললো তা হচ্ছে, আমি নাকি ভীষণ বোকামী করছি। তার মতে, বাঘটা কোন শব্দ

না করেই সরাসড়ি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সে পেছন থেকেও লাফিয়ে পড়তে পারে। অন্ধকারে আমি কিছু দেখতেও পাবো না, শুনতেও পাবো না। অথচ নরখাদকটা সব দেখতে পাবে। এমনটি হলে তার (বায়রায়) আমার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না। তাই সে বললো আমার তো মনে হয় বাঘটা আজ আর এই পথেই আসবে না। মধ্য রাতে সে কেন সাধ করে পুকুর ধারে আসবে। সে ভালো করেই জানে যে, লোকেরা দিনের বেলা জল তুলতে পুকুরে আসে, রাতের বেলায় আসে না।

কথা বলতে বলতে বায়রা আমার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে, যার অর্থ আমার জানা। সে আমাকে ফেরাতে চাইছে।

আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলি আমার সব জানা আছে। কিন্তু কি করবো বল? আর কোন উপায় দেখছি না।

বুড়ো লোকটি তার জেদ ছাড়ে বটে, কিন্তু পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। সে একটু রেগে গিয়েই বলে, আমি তোমাকে বলছি না যে বাঘের জন্য অপেক্ষা করবে না। আমি বলতে চাইছি, তুমি আমার পাশে বসবে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে নরখাদকটির জন্য অপেক্ষা করবো।

যতটা সম্ভব গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলাম– তুমি একেবারে বোকা। মাথায় তোমার কিচ্ছু নেই। তুমি থাকলে কি অন্ধকারটা পাতলা হয়ে যাবে? আজকের রাতটুকু আমাকে আমার ইচ্ছেমত চলতে দাও। দরকার হলে কাল না হয় তোমার কথা শোনা যাবে।

সে গজগজ করে—তুমি যদি আমার কথা শুনতে···।

সূর্য অস্ত যাবার ঘণ্টা খানেক আগে বাবুল গাছে পিঠ দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে পুকুর পাড়ে বসে পড়লাম। পিছনে বয়ে চলেছে ছোট্ট ঝর্ণা, আর ওধারে সেই বনপথ, যে পথ দিয়ে আজই সকালে আমি এসেছি। মনে মনে ভেবেছিলাম, বাঘটার আসতে দেরী হবে না এবং আমাকে দেখেই সে মাথা তুলে দাঁড়াবে, যেমনটি করেছিল ঐ চারজন মেয়ের বেলায়। তার মানে অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার আগেই কাহিনীটা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার দুভাগ্য বাঘটা আমার কথা রাখলো না।

এদিকে গ্রামবাসী পূজারীরা তাদের পর্ণ কুটিরের চারপাশে গোছা গোছা কাঁটার অস্ত্র সাজিয়েছে। ঝর্ণার তল থেকে কুড়িয়ে আনা নুড়ির শব্দ পাচ্ছি, যা দিয়ে ওরা দরজা বন্ধ করছে। মাঝি গ্রামের এই মানুষগুলোর স্বাবলম্বী

হবার একটা ঝোঁক রয়েছে। তাছাড়া তারা আমার শক্তি বা সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না, বিশেষ করে ঘাতক যেখানে তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

সূর্য এইমাত্র পশ্চিম দিগন্তে দাঁড়িয়ে থাকা পর্বতমালার পেছনে অস্ত গেলো। নীল পটভূমি পরিণত হলো গোলাপীতে, তারপর কমলায়। আমি যেহেতু উত্তর-পূর্ব দিকে মুখ করে বসে আছি তাই এই অস্ত বেলায় সৌন্দর্য্যের রেশটুকু মাত্র আমার চোখে ধরা পড়ছে। কমলা রঙ ঘনীভূত হলো রক্ত লালে। তারপর ঘন লাল, সবুজ, হলুদ, বেগুনি ও ফিকে লাল। এক মুহূর্ত বাদে আকাশ ছেয়ে গেলো অন্ধকার।

আমি যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার সৌন্দর্যটুকু উদাসভাবে উপলব্ধি করছিলাম তখন আবার কানে এসে বাজছিল অরণ্যক সঙ্গীত। আমার কাছে সব সময়ই বিশেষ করে দিনের শেষে ও দিনের শুরুতে এই আরণ্যক সঙ্গীত অত্যন্ত মধুর বলে মনে হয়।

এদিকে, লেঙ্গুর বানরের দুটি দল দু'পাশের পাহাড়ের দুই বিপরীত শিখরের ঢালু জমিতে বসে ক্ষুদ্র উপত্যকার বাতাসে পাঠাচ্ছে সঙ্কেত—হুপ! হুপ! হুপ!

পুরুষদের পাঠানো চীৎকার ফিরে আসছে অন্য দল থেকে—হুপ! হুপ! হুপ! ওরা গাছের শাখা থেকে শাখান্তরে লাফালাফি করছে। মেয়েরা আর বাচ্চারা জবাব দিচ্ছে—ফিক! ফিক!

কিন্তু আনন্দঘন শব্দাবলী হঠাৎ পরিণত হলো আতঙ্ক ও বিপদের সঙ্কেতে, যখন দূর থেকে ভেসে এল বানর প্রহরীর সাবধান বাণী, বিদীর্ণ হলো নীরবতা হা! হার! হার!

বানর-প্রহরী সামান্য বিরতিতে বারবার শোনাতে লাগলো সাবধান বাণী।

আমার কাছে যে দলটি, সেটি উপত্যকার এ ধারে তারা এখন নিশ্চুপ। কিন্তু প্রহরীর ক্লান্তি নেই। সে তার সহকর্মীর দূরাগত ধ্বনির জবাব দিয়ে চলেছে—হা! হার! হার!

দুই বানর প্রহরীর মধ্যে উত্তর আর পাল্টা উত্তর দেবার পালা চলতেই থাকে। তালে তালে আমার স্নায়ু সম্ভাবনায় নেচে ওঠে।

যারা এই ধরনের শব্দের সঙ্গে পরিচিত তারা এই শব্দের অন্তর্নিহিত ধ্বনি বৈচিত্র্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। দূরগত প্রহরীর কণ্ঠস্বরে মিশেছে আতঙ্ক ও আশঙ্কা। তার মানে সে বিপদের উৎস সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। কিন্তু কাছের

প্রহরীটি কেবলমাত্র সকলকে সতর্ক থাকার জন্য বিপদ সঙ্কেত জানাচ্ছে। তার শব্দ সাদা মাঠা। তাছাড়া সে অন্য প্রহরীর পাঠানো সঙ্কেতের প্রতিধ্বনি করছে মাত্র।

দুই বানরের ডাক ক্রমশ মিলিয়ে আসে। সবাইকে ছাপিয়ে এক বুনো মোরগ ঝর্ণার পাশ থেকে ডেকে ওঠে—কক। কক কক। সঙ্গীনী তার সাথেই ছিল। সঙ্গীর আর্তনাদ শুনে সে অতি দ্রুত উড়ে যায়, চীৎকার করে—ককর। কক্। কক্।

নীরবতা ও নৈঃশব্দ এসে গ্রাস করে সমস্ত বনানী। তারপর এক টিয়ার আতঙ্কিত ডাক শোনা যায়—কোয়াক্। কোয়াক্। কোয়াক্। তার ধাতব শব্দ ভেঙ্গে দেয় নীরবতা। এক মুহূর্ত বাদেই শুনতে পাই তার ডানার প্রচণ্ড ঝাটপটানি, সে তার ভারী দেহটি নিয়ে উডছে বাতাসে। কেননা, এখুনি তাকে আরও এক নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।

আমি বুঝতে পারলাম ঘাতক এসে গেছে।

সে ওপাশের পাহাড় থেকে নেমে আসছে। আর সেই সময়ই সে লেঙ্গুর প্রহরীর চোখে পড়ে যায়। তারপর সে পেরিয়েছে ঝর্ণা, বিরক্ত করেছে বন মুরগী আর টিয়াকে। এবার সে সোজাসুজি হেঁটে আসছে পুকুরের দিকে, যেখানে আমি বসে আছি।

প্রতিটি মুহূর্ত পরিবেশকে আরো অন্ধকার করে দিচ্ছে। নিকটবর্তী বানর প্রহরীর তীক্ষ্ণ চোখ কি নরখাদকটিকে দেখতে পাবে? যদিও তার পক্ষে উঁচুতে বসে দেখার সুবিধে রয়েছে, কিন্তু দূরত্বটাও কম নয়। তাছাড়া কোন বাঘ, সে যতই অনভিজ্ঞ নরখাদক হোক না কেন, অকারণে তার উপস্থিতি জানতে দেয় না।

আমার সন্দেহ অমূলক নয় তা জানিয়ে দিয়ে বানর প্রহরী সভয়ে ডেকে উঠলো—হা! হার! হার! তার চীৎকার এখন স্পষ্ট, যে তার দূরের সহকর্মীর ডাক শুনছে না। অবশ্য দূরের বন্ধুটি এখনও দীর্ঘ অবকাশে ডেকে চলেছে। এবার শোনা গেলো বিপদ আর আকস্মিক মৃত্যুর আর্তনাদ। প্রহরী দেখেছে নরখাদককে অর্থাৎ বাঘ এখন আমার অনেক কাছাকাছি।

কিন্তু আমি বাঘটিকে দেখতে পাচ্ছি না। এমনকি কিছু শুনতেও পাচ্ছি না। অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হচ্ছে। সামনের জঙ্গলের ঝোপগুলো তাদের নিজস্ব সীমারেখা হারিয়ে ফেলেছে। ঘন চকলেট রঙের পরিবেশে সে হলো এখন যেন

ধূসর পদার্থ। সারা অরণ্যে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্কিত ফিসফিসানি। ক্রমশঃ তা ঘনীভূত হচ্ছে। দূরের বানর প্রহরী এখন আর মোটেই ডাকছে না। কাছেরটি ডাকছে মাঝে মধ্যে। সে এখন বাঘকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই সতর্ক করে দেয়ার কর্তব্য শেষ করে সে এখন ভাবছে কি করবে। অপেক্ষাকৃত কম ঘন পটভূমির ওপর পাহাড়ের শিখর চূড়া যেন ঘন কালিমায় আঁকাবাঁকা রেখা। মাথার ওপর অনন্ত নক্ষত্রের নিথর সমাবেশ, তারা জ্বলছে তাদের নিজস্ব গৌরবে। আমি একটি পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। পাহাড়টিকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ বদলাচ্ছে।

সামনের বিস্তৃত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাঝে মধ্যে আমি ক্রমান্বয়ে ডানে ও বাঁয়ে দেখছি। নিঃশ্বাসের গতিকে কমিয়ে আনছি। এমনকি নিঃশ্বাস বন্ধ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছি যাতে সামান্যতম শব্দও আমার কানকে এড়িয়ে না যায়। কিন্তু আমি কিছুই দেখতে বা শুনতে পাচ্ছি না।

ঠিক এই সময়ই হৃদয় কাঁপানো আকস্মিকতায় এক সম্বর পুকুরের অন্যপাড়ের ঘন ঝোপের আড়াল থেকে ডেকে ওঠে—উঙ্ক! উঙ্ক! উঙ্ক! তার দ্রুত চলার পথে কাঁটা-ঝোপ দুমড়ে মুচড়ে যায়। ছুটে চলার শব্দ মিলিয়ে যায় কয়েক মুহূর্তে। কিন্তু ঝর্ণা পেরিয়ে সামনের পাহাড়ের দিকে ছুটতে ছুটতে সে তখনও ধ্বনি বজায় রেখেছে—উঙ্ক! উঙ্ক! উঙ্ক! দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্কেত ধ্বনি ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়।

বুনো বন্ধুদের এইসব সঙ্কেত ধ্বনির জন্য আমি সত্যিই তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা নিশ্চিত করে বলে দিয়েছে যে আমি যেখানে বসে আছি তার কয়েক গজের মধ্যে বাঘটি এসে গেছে।

এখন প্রশ্ন একটাই—বাঘটা কি আমাকে দেখতে পেয়েছে? তার পক্ষে কি আমাকে দেখা সম্ভব? অরণ্যের মধ্যে অচঞ্চলতার কি দাম তা আমি জানি। তাই একেবারে নিশ্চল হয়ে বসে আছি। এমন কি নিঃশ্বাস নিতেও সাহস হচ্ছে না। এটাই হলো বাঘের তাৎক্ষণিক নজর থেকে নিজেকে বাঁচানোর একমাত্র আশা।

মুহূর্তগুলি বয়ে চলেছে। সেকেণ্ড যেন মিনিটকে অতিক্রম করে ঘণ্টার দিকে চলেছে। যদিও আমি জানি আসলে তারা সেকেণ্ড ছাড়া কিছু নয়। এবার আমি আমার ডানদিকে হঠাৎ মৃদু শব্দ শুনতে পেলাম। সামান্যতম শব্দ, যেন

.টা পাতা খসে পড়লো, তবে মনে হলো যেন শব্দটা এসেছে পুকুরের ধার থেকে। এখন এমন কোন বাতাস বইছে না যা মরা পাতাকে গতিশীল করতে পারে। আমি বুঝতে পারি শব্দের উৎস এখন আমার চোখের আড়ালে গোপনে ধীর পায়ে পুকুরের পাড় দিয়ে হেঁটে চলেছে। এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে আমাকে অতিক্রম করবে।

নিঃশ্বাস চেপে আমি শব্দ শোনার চেষ্টা করি। কিন্তু আর কিছুই শুনতে পেলাম না। প্রতিটি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, বাঘটি এই বুঝি কাছে এসে গেছে। যে বাবুল গাছে ঠেস দিয়ে আমি বসে আছি তার ওধারের ঝোপের কাছে সে নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে। মুখ ফিরিয়ে বিপদের মুখোমুখি হবার তাগিদ অনুভব করি। কিন্তু যদি ঘাড় ফেরাই তাহলে মৃদু শব্দের দ্যোতনা উঠবে। তা যতই অনুচ্চ হোক না কেন বাঘটি সেটা শুনতে পাবে এবং শব্দের উৎস অন্বেষণ করবে। তাই আমি মনের ইচ্ছেকে দমন করে মাথা ঘুরিয়ে চোখ মেলে দিলাম। যদি জন্তুটিকে দেখতে পাই। কিন্তু আমার চোখে বাবুল গাছের কাণ্ডটি ছাড়া আর কিছুই ধরা পড়লো না। তারপর নিঃসীম অন্ধকার।

আমি জানি না কতক্ষণ এই উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটিয়েছি। হঠাৎ পূজারী গ্রামের কোন এক গ্রাম্য কুকুরের ভয় চকিত আর্তনাদ খান খান করে দিল নৈশ নীরবতা। তখনকার মতো মানসিক চাপ কমে গেলো। আমি সাধারণভাবে নিঃশ্বাস নিলাম। দুটি বিষয় এখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো। প্রথমতঃ বাঘটা আমার উপস্থিতিকে ধরতে না পেরে এই পথ অতিক্রম করে গেছে। সে গেছে পর্ণ কুটিরের দিকে, নিশ্চয়ই কোন মানুষের সন্ধানে। দ্বিতীয়তঃ এখন আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে এ হলো নরখাদক। কেন না, কোন সাধারণ বাঘ ইচ্ছাকৃত ভাবে মানুষের আশে পাশে ঘোরাফেরা করে না।

সেই মুহূর্তে আমার মাথায় ঢুকলো এক ছেলেমানুষী চিন্তা। আমি ভাবলাম এখানে বসে থেকে আর কোন লাভ নেই। কেন না, নরখাদকটি যদিও মানুষের সন্ধানে বেরিয়েছে তবে সে সফল হবে বলে মনে হয় না। তাই তার ফিরে আসারও সম্ভাবনা কম। বরং সে অন্যদিকে পা বাড়াবে। তবে যদি সে ফিরে আসে তাহলে সে আসবে আমার সামনে থেকে। তখন সে আমার উপস্থিতির কথা জানতে ভুল করবে না।

অবশ্য আমি কেন যে সবচেয়ে সহজতম পন্থাটি অবলম্বন করলাম না তা আপনাদের বলতে পারবো না। অথচ সেই অবস্থায় আমার উচিত ছিল, মুখ ফিরিয়ে গ্রামের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা। কিন্তু আমি ঠিক করলাম যে গ্রামের দিকে হাঁটতে শুরু করবো তারপর বাঘটার কাছাকাছি পৌছলে টর্চের আলোতে তার চোখ ধাঁধিয়ে দেবো। তাহলে গুলি করার ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

এটা সম্পূর্ণই এক অবাস্তব কল্পনা। বরং আমি যদি এখানে বসে থাকতাম তাহলে সম্ভবতঃ ভালো করতাম। হয়তো বাঘটা পুকুরে জল খেতে আসতো। আর তখন বাবুল গাছের আড়ালে বসে তাকে গুলি করার সহজ সুবিধা পেতাম। কিন্তু আমি করলাম কি পা টিপে টিপে অনেকটা হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গীতে এগিয়ে চললাম গ্রামের দিকে, যাব দূরত্ব এখান থেকে দুশো গজের মতো।

কয়েক পা যাবার পর আমি আমার বোকামীর কথা বুঝতে পারি। যদিও গ্রাম্য কুটির থেকে পুকুর পর্যন্ত রচিত হয়েছে সুচিহ্নিত পায়ে চলার পথ, কিন্তু ঘন অন্ধকারের মধ্যে কিছুই আমার চোখে পড়ছে না। বরং ঝোপের মধ্যে দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে চলেছি, তার ফলে এত শব্দ হচ্ছে যে হয় বাঘটা পালিয়ে যাবে নয়তো আমাকে আক্রমণ করে বসবে। সেই মুহূর্তে একবার এও ভাবলুম যে, বাবুল গাছের নিরাপদ আশ্রয়েই ফিরে যাই। আবার ভাবি, না, আরেকটু দেখি। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হলো বাঘটা হয়তো পাঁচগজ দূরত্বে কোন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না।

এইসব ভাবার মুহূর্তে শুনতে পেলাম একটি নেড়ী কুকুরের বীভৎস আর্তনাদ। এর সঙ্গে তাল রেখে আরও পাঁচ-ছটি কুকুর এমন প্রচণ্ড জোরে ডাকতে শুরু করেছে, যাতে সবচেয়ে বেপরোয়া নরখাদকও বিচলিত হয়। এই হট্টগোলের মধ্যে বাঘটা এখন তার আসল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করবে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বরং হয় সে পালিয়ে যাবে নয়তো পিছন ফিরে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে যাত্রা করবে। তবে সে যদি সত্যিই পিছনে ফেরে তাহলে আমার মুখোমুখি হতে হবে তাকে। তখন যে কোন মুহূর্তে আমাকে সে আক্রমণ করে বসবে।

মাথায় এই চিন্তা নিয়ে আমি অভিযানের দ্বিতীয় ভুলটি করলাম। বেশ খানিকটা তাড়াহুড়ো করে হঠাৎ জ্বেলে দিলাম টর্চটা। অন্ধকার বিদীর্ণ করে ছুটে

গেলো আলোর রেখা। আর তাই দেখে বাঘটি হঠাৎ গর্জন তুলে দিল ছুট। আমি অবশ্য বাঘটিকে দেখতে পাইনি, তবে পেছনের ঘন ঝোপে শুনতে পেলাম তার পদধ্বনি।

রীতিমত হতাশ হলাম। সাবধান হওয়ার আর দরকার নেই। নরখাদকটি এখন আস্তানার দিকে চলেছে। আমিও টর্চের আলো ধরে সোজা গ্রামের দিকে এগুতে থাকি। নিজেকে নিজের কাজের জন্য বারে বারে ধিক্কার দিই।

গ্রামে পৌঁছে শান্ত স্বরে বায়রাকে ডাকলাম। একটা কুঁড়ে ঘর থেকে সে বেরিয়ে এলো। সে জাগাই ছিল। সন্ধ্যা থেকেই সে শুনেছে লেঙ্গুর বানরদের সংকেত ধ্বনি, শুনেছে অন্য শব্দও। বাঘের গর্জন না শোনা অবধি কুকুরের ডাক তাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছিল। বাঘের গর্জন শুনে সে বুঝতে পারে যে বাঘটি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আর ঠিক এই অবস্থায় আমাকে হাজির হতে দেখে তো বায়রা বিস্ময়ে হতবাক।

আমি দ্রুততার সঙ্গে তাকে বলতে চেষ্টা করি কি হয়েছে এতক্ষণ। এর উত্তরে বায়রা ব্যঙ্গভরা মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়—বন্ধু, তুমি কি ভেবেছো এক পার্বত্য খরগোসকে অনুসরণ করছো? কয়েক বছরে তোমার জ্ঞান দেখছি অনেক কমে গেছে!

এখন সময় আটটার কিছু বেশী। আর কিছু করার নেই এখন। কাঁঠাল গাছের নীচে তাবুর দিকে তাই হেঁটে চললাম। তাঁবুতে পৌঁছে হ্যারিকেনটা জ্বেলে দিয়ে এককাপ চা করলাম। এরপর তাঁবুর পর্দাগুলো আটকে দিলাম ভালো করে। এবার শোয়ার পালা। বোঝা বেড়ে যাবে মনে করে সঙ্গে ক্যাম্প খাটটি আনিনি। অগত্যা মাটিতেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চোখ বুজতেই গভীর ঘুমে ডুবে গেলাম।

আচমকা কিছু একটা আমার ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দিল। ধড়ফড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। এ তো আর শহর নয়। শহরের লোকেরা ঘুম ভাঙবার পর নরম বিছানায় শুয়ে হাই তোলে আরামের। তারপর নিত্য নৈমিত্তিক কাজের কথা চিন্তা করে আরও পাঁচ মিনিট বিছানায় কাটাতে পারে। কিন্তু জঙ্গলে তা চলে না। জঙ্গলের অধিবাসী সতর্ক হয়ে ঘুমোয়। ঘুম ভাঙলেই পড়ি কি মড়ি করে ইঞ্জিনের মতো কাজ শুরু করতে হয়। কেননা, একমুহূর্ত এদিক ওদিক হওয়ার অর্থ জীবনের চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসা।

আমি ধীরে ধীরে চোখ মেললাম। একটা অস্বস্তি অনুভব করলাম। বিপদের

যে অনুভূতিতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতেই যেন পাশে মাটির ওপর রাখা কার্তুজভর্তি রাইফেলটা নেবার জন্য হাত বাড়ালাম। কি কারণে মৃত্যুর একটি পীড়াদায়ক অনুভূতি ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দিল তা জানার জন্যে উঠে দাড়ালাম। রাইফেলের স্পর্শ মনে একটা বিশ্বাসের ভাব আনল।

কয়েক মুহূর্ত সব চুপচাপ। তারপর কানে ভেসে এলো আঁচড়ানো, খামচানোর শব্দ। শব্দটা পরমুহূর্তেই থেমে গেল। দু'এক সেকেণ্ড পরেই আবার খামচানোর শব্দ পেলাম। আবার আঁচড়ানোর। আবার সব নিস্তব্ধ। কয়েক মুহূর্ত বাদে আবার শব্দ পেলাম। হঠাৎ তাবুর তলাটা একটু নড়ে উঠলো। মনে হলো যেন কিছু একটা প্রবেশ করলো তাবুর মধ্যে। অন্ধকারে তাকিয়ে দেখি কি একটা জিনিস কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাপ নয়তো?

আমার ফুট খানেক দূরে বেডিং-এর ধারে বাধা পেলো সেটি। শুরু করলো টানাটানি। ক্যানভাসটা মাটিতে পাতা ছিল। সেটা ধরেই প্রাণপণ টানতে লাগলো থাবা দিয়ে। তাহলে তাঁবুর বাইরে নরখাদকটা এসে হাজির হয়েছে।

বাঘটা নিশ্চিতভাবেই তাঁবুর ভেতরে মানুষের অস্তিত্ব টের পেয়েছে। কিন্তু তাঁবুটার নড়বড়ে গড়ন সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় সে মাটির উপর দিয়ে ক্যানভাসের তলায় খুঁজতে শুরু করছে শিকারকে নাগালের মধ্যে পাবার আশায়। তার উদ্দেশ্য ছিল শিকার কি ঘটছে তা টের পাওয়ার আগেই সে শিকারকে হ্যাচকা টানে বাইরে নিয়ে আসবে।

বস্তুতঃপক্ষে মতলব হিসেবে এটা দারুণ। কিন্তু তার একমাত্র ত্রুটি হলো যে শিকার আমি নিজে। অবশ্য এটা আমার সৌভাগ্য বলতে হবে যে একটা মারাত্মক বিপদের মুখোমুখি হওয়ার আগেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল।

আমি মাটিতে শুয়ে থাকাকালীনই রাইফেলটা বুকের ওপর দিয়ে টেনে হাতের মধ্যে নিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি রাইফেলের নলটা বাঘটা যেদিকে আছে বলে আমার ধারণা সেই দিকে তাক করলাম। রাইফেলের ট্রিগারের কাছে ডান হাত নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

একটা জিনিস পাঠক খেয়াল রাখবেন যে, এই মারাত্মক ব্যাপারটা যখন ঘটছে তখন তাঁবুর ভেতর ঘন অন্ধকার। আমি তাই ঠিক জানতে পারিনি

তাঁবুর বাইরে বাঘটা কি অবস্থায় কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। নড়াচড়ার প্রতীক্ষায় রইলাম। দেখলাম বাঘটা তার থাবা দিয়ে বিছানাটা টানাটানি করছে। আর আমি দেরী না করে ট্রিগারে দিলাম চাপ। কানফাটানো একটা আওয়াজ হলো। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে ভীত হাতে পয়েন্ট ৪০৫ উইন চেস্টারের আণ্ডার লিভার ঘুরিয়ে নিয়ে অন্ধের মতো আরও দু'বার গুলি করলাম। তাঁবুর ক্যানভাসের মধ্য দিয়ে গুলি ভেদ করে চলে গেলো।

বাঘটার কোন আওয়াজ পেলাম না। তাহলে কি বাঘটা মরে গেলো? যদি মরেই থাকে তাহলে মৃত্যুর আগে ধরফর বা জোরে শ্বাস টানবার শব্দ ঠিকই শুনতে পেতাম। তাহলে কি ওটা আহত হয়েছে? কিন্তু আহত হলে তো রাগে যন্ত্রণায় হুঙ্কার দিয়ে উঠতো। শেষপর্যন্ত এটাই ভাবলাম যে, ওটা পালিয়েই গেছে। আমার গুলি তাকে বিঁধতে পারেনি। এই দুঃসাহসিক নীরবতার ওটাই একমাত্র কারণ হতে পারে।

অর্থাৎ বোকার মতো আমি আবার অমার্জনীয় একটি ভুল করলাম। রাইফেলের ওপরে টর্চটা চাপানো ছিল। অথচ আমি টর্চটা জ্বালালাম না। যদি সেকেন্ড দেড়েক ও টর্চটা জ্বালাতাম তাহলে সঠিকভাবে বুঝতে পারতাম কোনদিক থেকে লোভী থাবাটা শিকারের সন্ধানে নড়াচড়া করছে। এছাড়া বাঘটা তাঁবুর বাইরে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তাও ভালোমতো জানা হয়ে যেতো। আমি তা না করে অন্ধকারের মধ্যেই একবারের পরিবর্তে তিনবার গুলি ছুড়লাম। জানোয়ারটার সঠিক অবস্থান না জেনে ট্রিগার টেপাটা সত্যিই ভুল হয়েছে।

এবার আমি টর্চটা জ্বেলে তাড়াতাড়ি তাবুর মুখের পর্দাটা খুলে ফেললাম। খুব সন্তর্পণে বেরিয়ে এসে চারপাশ টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগলাম। আমার চিন্তাই তাহলে ঠিক, নরখাদকটা পালিয়েছে। জন্তুটা কোন দিকে গেছে তাও বোঝার কোন উপায় নেই। কারণ, যাবার সময় সে সামান্যতম শব্দও করেনি।

আমার তিন তিনটি গুলির আওয়াজে গোটা মাঝি গ্রাম জেগে গিয়েছে। সবাই হৈ—হৈ করে আমার তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসার জন্য তৈরী হচ্ছে। বায়রা এবং আরও কয়েকজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তারা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ওরা জানতে চাইছে সব ঠিক আছে কিনা। যখন টের পেলাম যে আমি যদি ঐ উদ্বিগ্ন মানুষগুলোর কাছে না এগিয়ে যাই তাহলে ওরাই অন্ধকারের মধ্যে

এদিকে আসবে, তখন আমিই বাধ্য হয়ে টর্চ জ্বালিয়ে ঐ অল্প দূরত্বের পথটা হেঁটে কুঁড়ে ঘরগুলোর কাছে এসে হাজির হলাম। পৌঁছে দেখি জংলী মানুষগুলো ভয়ে সব পরস্পরের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবিস্তারে সব বললাম ওদের কাছে। আমার কথা শুনেই তাদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো। এমনই মনোভাব প্রত্যেকের যে তারা নিজের চোখে তাঁবুর গায়ে বুলেটের তিনটে গর্ত আর বাঘের আঁচড়ে ছেঁড়া বিছানা দেখতে যাবে। আমাকে রক্ষার জন্য তারা ভগবানকে সহস্র ধন্যবাদ জানালো। এরপর তাদের নিয়ে গ্রামে গেলাম। বায়রা আমাকে বারবার তার কুঁড়েতে বাকী রাত কাটানোর জন্য অনুরোধ করলো এবং তাঁবুতে ফিরে গিয়ে বিপদের মুখোমুখি হতে বারণ করলো।

কিন্তু আমি বায়রার কথা রাখতে পারলাম না। ফিরে এলাম নিজের তাঁবুতে। শুয়ে পড়লাম মাটিতে পাতা বিছানায়। মুহূর্তেই বিশ্রী তন্দ্রাচ্ছন্নভাব ঘিরে ধরলো আমায়। এবার হ্যারিকেনটা নিভিয়ে রাখিনি। বেশ জ্বল জ্বল করে জ্বলতে লাগলো সেটি। হ্যারিকেনের আলো সারা তাঁবুতে ছড়িয়ে পড়েছে। রাতের এই সব ঝামেলায় পরের দিন ঘুম ভাঙ্গলো অনেক বেলায়। ঘুম থেকে উঠেই শুনতে পেলাম অজস্র কণ্ঠের অভ্যর্থনা। আমি তাড়াতাড়ি তাঁবুর ঢাকনাটা খুলে দেখি গ্রাম থেকে পূজারীরা সবাই এসে হাজির হয়েছে। তারা সকলে তাঁবুর চারদিকে গোল হয়ে বসে বসেছে। এত সকালে তাদের এই আগমন কেন তা বুঝতে আমার দেরী হলো না। আগের দিনের সন্ধ্যায় ও রাতে আমি বোকার মতো যা করেছি এবং আমার গুলি ছোঁড়ার ব্যর্থতা সম্পর্কে দু'টি শব্দে তারা যা ব্যাখ্যা করতে এসেছে তা হলো—'কালো ঘেল্।' অর্থাৎ আমার এবং আমার রাইফেলের ওপর কেউ যাদু করেছে। তাই আমি ও আমার অস্ত্র একযোগে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু কে ঐ কাজ করেছে এবং কেনই বা করেছে, কখন বা কিভাবে করল? তাহলে তো মানুষ-খেকোটাকে মারতে হলে প্রথমে আমাকে ঐ অশুভ শক্তির প্রভাবকে দূর করতে হবে।

ভারতীয় অরণ্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এই ধরনের কুসংস্কার বদ্ধমূল অনেক দিন ধরেই। শুধু অরণ্যের মানুষই নয়, অনেক শহরবাসীর মধ্যেও এই কুসংস্কারটি এখনো চেপে বসে রয়েছে। আমি নিশ্চিত জানতাম যে, কোন যুক্তি দেখিয়ে, অনুনয় বিনয় করে বা তর্ক আলোচনা করেও পূজারীদের মন থেকে এই সংস্কারকে মুছে ফেলা যাবে না। আমি যদি তাদের অবিশ্বাস করি



তাহলে ওরা আমাকে আর সাহায্য করবে না। এবং আমার ধারণা, আমার ও আমার অস্ত্রের ওপর যে মন্ত্রের প্রভাব রয়েছে বলে ওরা মনে করে সেটা আমার অসাফল্যের জন্য দায়ী বলেই প্রমাণ করবে ওরা। তার চেয়ে তাদের সঙ্গে একমত হয়ে যাওয়াই সবচেয়ে শ্রেয় এবং নির্ঝঞ্ঝাটও বটে।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমিও নিঃসন্দেহ যে কোন অশুভ শক্তি যাদুমন্ত্র বর্ষণ করেছে। তোমরা যদি কেউ পারো, তাহলে কি এই মন্ত্রের প্রভাব দূর করে দেবে?'

একজন বয়োজ্যেষ্ঠ উত্তর দিলো। বললো, 'হ্যাঁ, এজন্য পাঁচ টাকা লাগবে। পূজার জন্য প্রয়োজন একটি মুরগী ছানা উৎসর্গ করা। সেটার দাম এই টাকাতে হয়ে যাবে। এছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্রের দাম এবং পূজারীর পারিশ্রমিকও ঐ টাকাতেই হয়ে যাবে।'

এবারেও আমি আপত্তি করলাম না। পাঁচটা টাকা দিয়ে দিলাম। এরপরে একঘণ্টা ঘুমানোর লোভে তাঁবুতে ঢুকলাম। কিন্তু কি একটা অস্বস্তিতে ঘুম হলো না। মনের মধ্যে কেবল নরখাদকটার চিন্তাই এসে ভিড় করলো। কানে ভেসে এলো হতভাগ্য মুরগী ছানার মৃত্যুকালীন করুণ আর্তনাদ। নাকে ধূপের উৎকট গন্ধ পেলাম। বুঝলাম পূজা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে বাইরে থেকে গায়বার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—'সাহেব! সাহেব! এবার বাইরে আসুন! জাদুর প্রভাব দূর করা হয়েছে। আসুন, আমরা এখন বাঘটা খুঁজি। আমরা নিশ্চিত যে, বাঘটাকে খুঁজে বার করবোই এবং আপনার এক গুলিতেই শেষ হয়ে যাবে সেটা। কারণ, এখন আপনি যা বলবেন অস্ত্রটা তাই মেনে চলবে।'

তখনও পূজা শেষ হয়নি। গালময় সাদা চুলের বোঝা, ঐ লোকটিই গ্রামের জাদুকর। সে আমার রাইফেলটা চাইলো। রাইফেলটাকে মাটিতে রেখে কুঁদোটার উভয়দিকে সিঁদুর আর চকখড়ি দিয়ে নানা রকমের কতকগুলো দাগ কাটলো। এবার মুরগীর পেট থেকে সব নাড়িভুড়ি বের করলো জাদুকরটি। সেগুলো গোল করে পাকিয়ে নিয়ে দুটি ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলো। আর কিছুটা ধূপ ধুনো দিয়ে চারিদিক ধোঁয়ায় ভরিয়ে তুললো। তারপর সেই নাড়িভুড়িগুলো রাইফেলের ব্যারেলের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত বার ছয়েক আনা নেওয়া করলো। শেষে বাঘটাকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানালো এবং আগুনের টুকরোগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে দিলো।

সূর্য যখন আকাশের মাঝখানে তখন এইসব কাজকর্ম শেষ হলো। সঙ্গে সঙ্গে বায়রা ও একটি বাচ্চা পূজারী বালক আমাকে বনের মধ্যে বাঘটা খুঁজতে যাবার জন্য অনুরোধ করলো। ছেলেটি নাকি ঐ লোকটির নাতি, যে পূজো করছিল। পাঠক, এটা আপনারা সকলেই জানেন যে, গভীর জঙ্গলে এই প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষখেকো বাঘের সন্ধান করা যেমন দুরাশা, তেমনি বোকামিও। সময়ের অপচয়ও বটে। আমার বায়রার জঙ্গল শিকারের ওপর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু তার মতো অভিজ্ঞ শিকারীর এরকম বোকা বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে অবাক হলাম।

আমি যে রাজী নই তা আমার চোখের চাহনিতেই ধরা পড়েছিল। কিন্তু বায়রা ও ঐ পূজারী বালকটা নাছোড়বান্দা। তারা আমাকে সময় নষ্ট করতে বারণ করলো। আমার বুঝতে দেরী হলো না, যাদুকরের ওপর তাদের গভীর আস্থা। অগত্যা আমরা তিনজনে যাত্রা শুরু করলাম। প্রথমে বায়রা, মাঝখানে আমি এবং পেছনে ছেলেটা। কিছুটা যেতেই গ্রামের সীমারেখা পার হয়ে চলে এলাম। তখন আমি চলার পথে নিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্তনের জন্য চাপাচাপি করলাম। এবং ঐ বালকটির সঙ্গে অর্থাৎ মুণুর সঙ্গে জায়গা বদলে নিলাম। নরখাদকটা এতক্ষণ ধরে সম্ভবতঃ আমাদের নজরে আনতে পারেনি। যদি দেখতে পেতো তাহলে ঐসব ছাইপাশ মন্ত্র আওড়ানো সত্ত্বেও সে নিশ্চিতভাবেই শেষের জনকে আক্রমণ করতো। আমাদের সবার পেছনে ছিল মুণু, তার পক্ষে তখন কিছু করার থাকতো না। তাছাড়া তার হাতে কোন অস্ত্রও নেই। আমরা ঢালু পাহাড় বেয়ে নদীবক্ষে নেমে গেলাম, সেখানে শুধনো শিথিল বালির সমারোহ। বাঘের পদচিহ্ন খুঁজতে লাগলাম সতর্ক ভাবে। এই রকম বিশাল বনপ্রান্তরে বন্য পশুর পুরানো ও নতুন অর্থাৎ টাটকা পায়ের ছাপ খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। তবুও আমি পুকুরটার কাছে থাকাকালীন বাঘটা যে পথ ধরে পুকুরটার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল সেই পথটা খুঁজে বের করতে এই দু'জন পূজারীর খুব বেগ পেতে হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রায় এক ফার্লং দূরে তারা আরেক জায়গায় বাঘটার পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলো। এই চিহ্নটা দেখে বোঝা গেলো যে, সে গ্রাম থেকে বেরিয়ে বাইরের দিকে গিয়েছে।

বালির ওপরে বাঘটার পায়ের যে ছাপ তাতে দেখলাম বাঘটার পায়ের গোড়ালি থেকে এমনভাবে বালি সরেছে যে, আমরা বুঝতে পারলাম বাঘটি দ্রুত পালিয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে তখন লুকোবার বা সজাগ হবার কোন

ইচ্ছা ছিল না। এখন বাঘটা কখন পালিয়েছিল সেই সূত্র খুঁজে বের করতে হবে। যখন আমি টর্চ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছি তখন, না আমার পর পর তিনটি গুলি ছোঁড়ার আওয়াজে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুট লাগিয়েছিল। অনুমান করে নিলাম যে, ভয় পেয়ে সে যখন এরকম লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড়েছে তখন নিশ্চয়ই গুলি করার পরেই পালিয়েছে। এবার আমরা তার পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। কোন জায়গায় রক্ত দেখতে পেলাম না। বুঝলাম বাঘটা অক্ষত আছে।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই লক্ষ্য করলাম বাঘের পদচিহ্নের পরিবর্তন। হঠাৎ পায়ের ছাপ ডানাদিকে মোড় নিয়ে সোজা নদীটার পূবদিকের পাহাড় বেয়ে উঠে গেছে। আমার মনে পড়লো, আগের দিন সন্ধ্যায় বাঘটা যখন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামছিল তখন প্রথম বানর প্রহরীর চোখে পড়েছিল। সে শুনিয়েছিল সাবধান বাণী। বাঘটা আবার সেই পথেই ফিরে গেছে। আমি মনে মনে ছক কেটে নিলাম, খুব সম্ভব পাহাড়ের আরও কিছুটা দূরত্বে গুথেরেয়ান পর্বতমালার কোন এক গুহায় বাঘটার আস্তানা।

আর এটা ভাবতেই সমস্যা দেখা দিলো। নিম্নভূমিতে বাঁশ বনের পথ ধরে এগুতে লাগলাম। ওটা পার হতেই আমরা রুক্ষ কঠিন ও পাথুরে জমিতে এসে পৌঁছলাম। পাথর আর তার ফাঁকে পড়ে থাকা নুড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে লম্বা লম্বা ঘাসের ঝোপ গজিয়ে উঠেছে। সুতরাং বাঘের পায়ের চিহ্ন আর দেখা গেলো না।

সঙ্গী দুই পূজারী জঙ্গল সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লো। বাঘের হারিয়ে যাওয়া পায়ের চিহ্ন উদ্ধারের আশায় গোল হয়ে ঘুরতে লাগলো। একবার বায়রা এবং অন্যবার পূজারী বালকটি নুয়ে পড়ে ঘাস ও পাথরের ওপর বাঘের পদচিহ্ন খুঁজতে লাগলো। কয়েক জায়গায় ঘাসের লম্বা মাথাগুলোর নুয়ে পড়া অবস্থা এবং একটি পাথরের উল্টে যাওয়া দেখে তারা বুঝতে পারলো বাঘটি এ পথেই গিয়েছে। বুঝলাম বাঘটা উঁচুতে উঠে গেছে, কিন্তু বাঘের অবস্থিতি সম্পর্কে কোন হদিশই আমরা পেলাম না।

ফিসফিস্ করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করলাম এখুনি পাহাড়ে উঠে যাবো। নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, নিশ্চয়ই পাহাড়ে একটা গুহা দেখতে পাবো যার মধ্যে শয়তানটা লুকিয়ে আছে। তিনজনে একসঙ্গে ঘুরলে কাজ এগুবে না। তাই ঠিক করা হলো, বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অনুসন্ধান

চালানোর জন্য তিনজনে তিনদিকে ছড়িয়ে পড়বো। পরিকল্পনা মতো বায়রা একশত গজ দূরে আমার ডান দিকে চলে গেলো, কিন্তু আমার দৃষ্টির মধ্যেই রইলো। আর মুথু চলে গেল বাঁয়ে, ঠিক একই দূরত্বে। তারপর আমরা তিনজনে ধীরে ধীরে সাবধানী পদক্ষেপে এগিয়ে চললাম।

ক্রমশঃ পায়ের তলা পাথুরে হয়ে উঠলো। সেইসঙ্গে পাথরের টুকরোর আয়তন ও সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। কিন্তু কোন গুহাতেই বাঘটার হদিশ পাওয়া গেল না। আমরা যে পাহাড়টায় উঠছি সেটা সম্ভবতঃ পাঁচ শ' ফুট উঁচু। নির্দিষ্ট সময়ে পাহাড়ের চূড়ায় এসে উপস্থিত হলাম। সেখান থেকে পাহাড়ের অন্যদিকে তাকালাম। দেখলাম এখান থেকে জমিটা সোজাভাবে একটা উর্বর ও জঙ্গলে ভর্তি উপত্যকার মধ্যে নেমে গেছে। জমিটা পাশের পাহাড়টায় উঠে যাবার আগে পর্যন্ত গোটা উপত্যকটা বাঁশ গাছের ঝাড়ে ভরা। আর ঐ পাহাড়ের ওপরই হচ্ছে গুথেরেয়ান পাহাড়ের চূড়াটা।

সঙ্গীদের ইশারা করে এবং পরস্পর দূরত্ব বজায় রেখে ঢাল পাহাড় ধরে নামতে শুরু করলাম। পাহাড়ের এদিকটা বেশী উর্বর আর পাথর ও নুড়ির সংখ্যাও কম। ঘাসের ঝোপগুলো যেমন ঘন তেমনি ঝাঁকড়া এবং লম্বাও বটে। যতই আমরা এগুতে লাগলাম ততই ঝোপ আর ছোট ছোট গাছের সংখ্যা বেড়ে চলল। আমরা যখন বাঁশ ঝাড় পূর্ণ এলাকাতে এসে পৌঁছলাম তখন ঝোপঝাড় একটু হালকা হল। অবশেষে আমরা সবুজ উপত্যকায় এসে হাজির হলাম। বাঁশ গাছের পাতা আর কঞ্চিতে উপত্যকাটা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে যে মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা নেমেছে। তাই আমরা কেউ কাউকে দেখতে পেলাম না। এবং খুব শীঘ্রই আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার সঙ্গীরা সম্পূর্ণ ভাবেই নিরস্ত্র। তাই তারা একটা মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে চলেছে! বাঘটা যদি তাদের ওপর আক্রমণ করে বসে তাহলে আমার কিছু করার থাকবে না। তাছাড়া বাঁশগাছ ও জঙ্গলের বিশাল ঝোপ এমন অন্ধকার সৃষ্টি করেছে যে, সঙ্গী দু'জন আদিবাসীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও সম্ভবত আমাদের মধ্যেকার ঘন সবুজ দেওয়াল ভেদ করতে পারছে না।

এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে যেন তা কাজে পরিণত হলো। হঠাৎ পুজারী ছেলেটির তীক্ষ্ণ আর্তনাদ কানে এলো। ছেলেটি ছিল আমার বাদিকে একশ গজ দূরে। এর পরই বাঘটার 'হুপ! হুপ!' শব্দ করে ছেলেটিকে আক্রমণ করার শব্দ শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ডান দিক থেকে বায়রা চিৎকার করে

উঠলো। বাঘটার গর্জনও হঠাৎ থেমে গেলো। আমি বুঝলাম যে বায়রা বাঘটাকে নিরস্ত করবার জন্য চেঁচাচ্ছে। আমিও অনুরূপভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম। আক্রমণকারীকে সতর্ক করে দিয়ে যেদিক থেকে আর্তনাদ ও গর্জন শোনা যাচ্ছিল সেইদিকে ছুটে গেলাম।

আমাদের মধ্যে দূরত্ব এত কম ছিল যে বাঘটাকে দেখতে পাওয়ার আগেই আমি ও বায়রা দু'জনে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম বাঘটা এমন ভাবে আক্রমণ করেছে যে, ছেলেটার মাথার খুলির পেছন দিকটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে। মৃতদেহটা পাথর ও লম্বা ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। তার কাঁধ ও ঘাড়ের মাঝখানে গভীরভাবে দাঁত বসানোর চিহ্ন। বুঝলাম থাবার ঘায়ে খুলিটা গুঁড়িয়ে দেবার আগে বাঘটা ঐ ঘাড়েই কামড় বসিয়েছিলো। মনে হয় আমাদের চীৎকার শুনে বাঘটা রেগে গিয়ে এবং ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছেলেটিকে খতম করে দেয়। আমরা পৌঁছুনোর আগেই বাঘটা ছেলেটিকে একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

বাঘটা যেখানে লুকিয়ে ছিল সেখানটায় ঘাসগুলো মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। বুঝলাম, ওখানে লুকিয়ে থেকে শিকারের অপেক্ষা করছিল বাঘটি। যে মুহূর্তে ছেলেটি ঐ জায়গা পার হয়, অমনি বাঘটা পেছন থেকে তার ওপর লাফিয়ে পড়ে। পূজারী ছেলেটিকে আমরা চিৎ করে শোয়ালাম। তাকে সোজা করেই আমরা চমকে উঠলাম তার বীভৎস রূপ দেখে। রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। মাথার পেছনে এমনভাবে বাঘটা থাবা চালিয়েছে যে সামনের দিকে চোখের মণিদুটো ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। আর ছেলেটার নিজের দাঁত জীভের মধ্যে বসে গেছে এমনভাবে যে জিভ এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে। ফলে জিভটা মুখ থেকে আলতোভাবে ঝুলে পড়েছে। একটু চিলতে মাংসের সঙ্গে তা কোনরকমে আটকে আছে। মুখ থেকে ঝরে পড়ছে রক্ত।

আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। শরীর কেমন করতে লাগলো। বায়রার দিকে ফিরে তাকালাম। তার কালো মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দারুণ উত্তেজনায় তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। আমরা দুজনেই চুপ। কেউ একটা কথা বলতে পারলাম না। আর বলবই বা কি? সবই তো শেষ। নিরস্ত্র অবস্থায় পূজারী বালকটির বীভৎস মৃত্যুর জন্য আমার নিজেকে দোষী মনে হলো।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। দেখলাম বেলা তখন ঠিক এগারোটা। সূর্যের কিরণধারা বর্ষিত হচ্ছে মৃতদেহের ওপর।

হঠাৎ এই দুর্ঘটনায় যে মানসিক আঘাত পেয়েছি তা সামলে নিলাম কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

বায়রাকে আমি বললাম, 'তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঐ সামান্য পূজার দ্বারাই তোমরা বাঘটাকে মেরে ফেলতে পারবে। অথচ তা না হয়ে হলো তার উল্টো। বাঘটাই আমাদের একজনকে মেরে ফেললো।'

বায়রা সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিল না। তবে কিছুক্ষণ পরেই সে ক্ষোভের সঙ্গে বললো, 'জাদুকরের উচিত ছিল একটা মোরগ উৎসর্গ করা। তা না করে করলো মুরগী বলি, কারণ একটাকা কম লাগলো তাতে। কিন্তু তার পরিণতিতে কি হলো! জাদুকরকে মূল্য দিতো হলো তার নাতির অমূল্য জীবনটি।'

বায়রার কথা শুনছিলাম ঠিকই, তবে সেদিকে তেমন মনোযোগ ছিল না। হঠাৎ আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা এলো। সঙ্গে সঙ্গে লম্বা ঘাসগুলো পেরিয়ে পাথরের চাঁইগুলোর কাছে এগিয়ে গেলাম এবং একটা চাঁইয়ের ওপর উঠে দাঁড়ালাম। পেছনে মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে দূরত্বটা অনুমান করার চেষ্টা করলাম। বড়জোর দশ গজ হবে। মাত্র চার পাঁচটা পাথরের চাঁই ইতস্তত: পড়ে রয়েছে। এর মধ্যে আমি যেটার ওপর দাঁড়িয়ে সেটিই সবচেয়ে বড। উচ্চতায় প্রায় তিন ফুট। বাকীগুলো ছোট।

ভাবলাম, এই পাথরগুলোর সঙ্গে আরও কয়েকটা পাথর জড়ো করে একটা গুপ্তস্থান তৈরী করা যায় না! মনে হয় না, বাঘের এতে কোনরকম সন্দেহ হতে পারে।

বায়রার দিকে তাকিয়ে বললাম, আজকের রাতটা হবে অন্ধকার। আমরা যদি মৃতদেহটা এখানে ঠিক এইভাবে রেখে যাই তবে লোভের বশবর্তী হয়ে শয়তানটা এখানে ফিরে আসবে। কেননা, মনে রাখা দরকার যে, সে খুব ক্ষুধার্ত। গতরাতেও সে ক্ষুধার্ত ছিল। এইজন্যই সে সোজাসুজি মাঝির কুঁড়েঘরগুলোর কাছে গিয়েছিলো। তখন থেকে সে না খেয়ে রয়েছে। তাই আজ রাতে তার পেটে থাকবে প্রচণ্ড খিদে।

তাই বায়রাকে বললাম, এই পাথরগুলোর সঙ্গে আরও কয়েকটা পাথর জড়ো করে তার মধ্যে আমি লুকিয়ে থাকবো। আর এত কাছাকাছি থেকে ওর চোখের ওপর টর্চের আলো ছড়িয়ে দেবো। তখন রাইফেলের গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

বৃদ্ধ শিকারী সঙ্গে সঙ্গে আমার কথায় আপত্তি জানালো। বললো, 'সাহেব

আপনি একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছেন।' বায়রা বললো, লুকোবার জায়গাটা নজরে পড়লেই তো শয়তানটা আর এগুবে না। সম্ভবতঃ ফিরে যাবে। আবার নাও যেতে পারে। বরং সে যদি পাথরগুলো ওপর লাফিয়ে পড়ে তখন তো সে সোজা গিয়ে পড়বে আপনার ঘাড়ের ওপরে। আপনি কিছু জানতেও পারবেন না, বুঝতেও পারবেন না।

'তাছাড়া' সে বললো, 'মাঞ্চিতে ফিরে গিয়ে হতভাগ্য বালকটার কি পরিণতি হয়েছে তা ওর অপদার্থ ঠাকুরদার কাছে বলাটা আমাদের কর্তব্য। গ্রামের লোকেরা এসে তখন মৃতদেহটা নিয়ে যেতে পারবে এবং আজ রাতেই সৎকার করা যাবে। তা না হলে ছেলেটির আত্মা শান্তি পাবে না। আর তা না করে যদি আমরা বাঘের ভোজনের জন্য মৃতদেহটা এখানে রেখে দিই তা হলে তার অতৃপ্ত আত্মা এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে এবং কর্তব্য না করার জন্য তখন আমাদের তাড়া করে ফিরবে।' আমি সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বললাম, মৃতদেহটিকে বাঘটি খেতে পারবে না। তাকে বাধা দেবার জন্য তো আমিই লুকিয়ে থাকবো ঐ পাথরগুলোর মাঝে। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, ছেলেটির মৃতদেহ বাঘটাকে খেতে দেবো না। তুমিই বলো, মানুষখেকো শয়তানটার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার এটাই কি স্বর্ণ সুযোগ নয়? আমি যদি আজ রাতে বাঘটাকে মারতে পারি তাহলে তুমি শুদ্ধ তোমার গ্রামের লোকের প্রাণ রক্ষা পাবে না? তুমি তো একজন শিকারী, তুমিই বলো এই সুযোগটা হাতছাড়া করার অর্থ বোকামি করা নয় কি?

বায়রা কোন উত্তর দিল না। আমি বুঝতে পারলাম সে নরম হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে আমার মুখের দিকে তাকালো! তার মুখে দেখলাম, শিশুর সরলতা।

'সাহেব, চলুন আমরা ফিরে যাই। সকলকে বলবো, আমরা ছেলেটির মৃতদেহটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি কিন্তু কোথাও সেটি দেখতে পাইনি। কাল সকালে আবার খুঁজবো। আর সাহেব আজ রাতে আপনি বাঘটির আসার অপেক্ষায় জঙ্গলের ধারে অপেক্ষা করবেন। আমি অপেক্ষা করবো খানিকদূরে একটা গাছের ওপরে। আপনাকে দেখতে না পেলেও যাতে আপনার সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতে পারি সেজন্য কাছে পিঠেই থাকবো, যাতে আপনার গলার আওয়াজ শুনতে পারি।

বায়রা তার উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে সমস্যার সমাধান করলো। এবার আমরা স্থির প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজে হাত দিলাম।

বাঘটার মনে যাতে কোনরকম সন্দেহ দেখা না দেয় সেজন্য দু'শ গজ দূরে ছোটবড় পাথরের চাঁই ভর্তি একটা জায়গায় সরে গেলাম। সঙ্গে নিয়ে গেলাম আমরা আধ ডজনের মতো বড়ো পাথরের চাঁই। এখানেও পড়ে রয়েছে গোটা কয়েক চাঁই। সেগুলোর সঙ্গে নতুন গুলো সাজিয়ে একটা মোটামুটি বৃত্ত তৈরি করলাম। ছোট ছোট পাথরগুলো পরপর সাজিয়ে তিন ফুট উঁচু একটা দেওয়াল তৈরী করলাম। বেশী উঁচু করলাম না এই ভেবে যে বাঘটার তাহলে সন্দেহ হতে পারে কেননা, বাঘটি যখন এসেছিল তখন সে এই রকম কোন দৃশ্য দেখেনি তাই উঁচু আকারে কিছু দেখলে স্বভাবতই তার মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। আর তাহলে আমাদের পরিশ্রমটাই নষ্ট হয়ে যাবে। কাজের কাজ কিছুই হবে না।

এরপর পাথরের ফাঁকগুলো বন্ধ করার জন্য কিছু ঝোপঝাড় ও লম্বা ঘাস এনে ফাঁক জায়গাগুলোতে গুঁজে দিলাম। এইসব করতে একদিকে যেমন সময় লাগছিল অন্যদিকে তেমনি পরিশ্রমও হচ্ছিল। কেননা, সূর্য তখন মধ্য গগন থেকে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করছিল। এছাড়া বাঘ ধরার এই ফাঁদ পাতার জন্য দূর থেকে পাথর ও ঘাস সংগ্রহ করতে হয়েছে।

বাঘটাকে মারতে পারবো— যাদুকরের এই আশ্বাসবাণীতে নির্ভর করে সকালে যখন জঙ্গলে আসি তখন আমি সঙ্গে করে শুধুমাত্র রাইফেল এনেছিলাম। টর্চ কিংবা জলের বোতল কোনটাই সে সময়ে আনার কথা ভাবিনি। অথচ এই জিনিসগুলো দরকার। বায়রাকে একা এগুলো আনতে পাঠাবো সেই ভরসাও পাচ্ছি না। ভাবলাম দু'জন একসঙ্গেই ফিরে যাই জিনিসগুলো নিয়ে আসতে। আর যাবার আগে ছেলেটির মৃতদেহটাকে একটা গাছে ঝুলিয়ে রেখে যাই না হলে হয়তো আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে বাঘটা মৃতদেহটাকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে, আর তখন সেটা খুঁজে বার করাই কঠিন হয়ে পড়বে।

কি করা যায়—সেই নিয়ে দু'জনে নীচু স্বরে আলোচনা করলাম। শেষে ঠিক হলো, গ্রামে ফিরে যাবার যে পরিকল্পনা মনে মনে ছকেছি সেটা আর কার্যকর করবো না। বরং ঠিক করলাম, এখনই যে যার অবস্থান নেবো। আমি তিন ফুট উঁচু পাথরের আড়ালে থাকবো আর বায়রা কোন একটা গাছের ওপর থাকবে। সে এমন একটা জায়গায় থাকবে যাতে আমার ডাক শুনতে পায়। এত সব করার উদ্দেশ্য হলো একটাই শয়তানটাকে হত্যা করা।

নরখাদকটা মাংসের লোভে এখানে আসবে—এই আশা নিয়েই আমরা পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। আমাদের ধারণা, বাঘটা খুব কাছাকাছি কোথাও নেই। আর আমরা গত তিনঘণ্টা ধরে যেভাবে এখানটায় হাঁটাচলা করেছি তাতে সে হয়তো সাবধান হয়ে গিয়েছে এবং এখানে সহজে আসবে না।

আমাদের সাফল্যলাভের সম্ভাবনার একমাত্র আশা হলো, বাঘটি হয়তো জলের সন্ধানে পাহাড়ের ওপরে গেছে, তাই সে আমাদের কথা শোনেনি। বছরের এই সময়টা নদী থাকে শুকনো, তাই বাঘটির পক্ষে উপত্যকার মধ্যে নদীতে জল খেতে আসা সম্ভব নয়।

বায়রার সাময়িক আস্তানা হিসাবে একটা গাছ খোঁজার জন্য চারিদিকে তাকাতে লাগলাম। কেননা, যেমন তেমন গাছ হলে চলবে না, উপযুক্ত গাছ হওয়া চাই। খুঁজতে খুঁজতে আধফার্লং দূরে খানিকটা নেমে এলাম। এখানে গাছ রয়েছে অনেক। তারই একটি ঠিক করলাম বায়রার রাত কাটানোর জন্য। বিরাট তেঁতুল গাছ। ভালভাবে গাছটিকে দেখে বায়রাকে বললাম, এবার নিশ্চিন্ত। এর ওপরে বেশ নিরাপদ আশ্রয়ে অপেক্ষা করো আগামীকাল সকালে আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত।

বেলা তখন সওয়া দুটো। দিনের সবচেয়ে গরম সময় এটি। বায়রা গাছে উঠলো। তবে ওঠার আগে আমাকে উপদেশ দিল যে, আমি যেন কোন মুহূর্তেই অসতর্ক না হই কিংবা ঘুমিয়ে না পড়ি। বায়রাকে রেখে আমি ফিরে এলাম মৃতদেহটির কাছে তৈরী করা সেই গোপন আস্তানার কাছে। ছোট সেই দুর্গে বহু কষ্টে প্রবেশ করলাম ঠিকই। কিন্তু দেখা দিলো সমস্যা। একেই ছোট্ট জায়গা, তার উপর মাটি রোদে রীতিমতো তেতে রয়েছে। তাই নিরুপায় হয়ে পশ্চাৎদেশ উঁচু করে উবু হয়ে বসতে হলো। এইভাবে কতক্ষণ বসে থাকা যায়। এছাড়া দেওয়ালটাও যথেষ্ট উঁচু ছিল না। মাথাটা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। অগত্যা আরও নীচু হয়ে বসতে হলো।

কিন্তু এইভাবে বসে থাকা যেমন কষ্টকর, তেমনি বিপজ্জনকও বটে। কেননা বাঘ আক্রমণ করতে এলে আমার পক্ষে তাকে দেখার কোন সুযোগ নেই। অথচ সে আমায় দেখতে পাবে।

ভেবেচিন্তে আমি গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এলাম! কিছুটা দূরে গিয়ে শেকড় সমেত কিছু ঘাস ছিঁড়ে তুললাম। এবং সেগুলোকে আমার গুর্খা টুপি'টার খাজে ঘনকরে গুঁজে দিলাম। এতে খানিকটা সময় লাগলো ঠিকই,

কিন্তু কাজটা আমার মনের মতো হলো। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক গোছা ঘাস দাঁড়িয়ে রয়েছে, বোঝাই যাচ্ছিল না যে ওটা একটা টুপি।

এইভাবে টুপিটা সাজিয়ে ফিরে এলাম আমার সেই পাথরের দুর্গে এবং আগের মতো উবু হয়ে বসলাম। ঠিক করলাম, যতটা সম্ভব স্থির থাকবো। আমার সামনে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ছড়িয়ে থাকা পাথররাশি কেবলমাত্র নজরে আসছে। সামনে ছাড়াও ডাইনে বায়ে খুব সন্তর্পনে মাথা ঘুরিয়ে আমি বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, এমনকি পেছনটা খানিকটা দেখতে পাচ্ছি। আমার ধারণা হলো, এইভাবে সন্তর্পনে মাথা এদিক ওদিক করার ব্যাপার বাঘের বিশেষ নর্জরে পড়ার কথা নয়। কেননা আমার মাথা নড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাস দিয়ে সাজানো টুপিটাও নড়ছিল। বাঘের পক্ষে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বনপথে ছুটে আসা বাতাসের ছন্দে শুকনো ঘাসগুলো সময় সময় আন্দোলিত হচ্ছে।

কিন্তু বেশীক্ষণ এইভাবে বসে থাকতে পারলাম না। পায়ের ভাজে তীব্র ব্যাথা অনুভব করলাম। শিরাগুলোতে টান ধরেছে। তাই নিরুপায় হয়েই আমাকে অল্পস্বল্প নড়াচড়া করতে হচ্ছিল। অস্থির ভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো এদিক ওদিক সঞ্চালিত করছিলাম। শেষে বেলা পড়ে গেলো, বিকেলের দিকে সূর্যের তেজ কমে গেলো, গরম কমে যাওয়ায় খানিকটা সুস্থির হলাম।

এই দীর্ঘসময়ে কোন সাড়া শব্দই পাইনি। কোন জন্তুর সন্তর্পণে এগিয়ে চলা কিংবা কোন পাখীর কাকলীও কানে আসেনি। সর্বত্র একটা নীরবতা। অবশ্য এই গরম থেকে রক্ষা পাবার জন্য সবাই, এমনকি ঐ মানুষখেকোটা পর্যন্ত কোন ঠাণ্ডা জায়গায় সম্ভবতঃ আশ্রয় নিয়েছে। এতক্ষণে আমি মাত্র দু'টো নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছি। একবার দেখলাম, একটা গো সাপ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পূজারী বালকটির মৃতদেহে বাধা পেয়ে মোড় ঘুরে অন্যপথে দ্রুত পালিয়ে গেলো। অন্যটি হলো একটি অজগর সাপের। সাপটি একটি গাছের ডাল থেকে ঝুলছিল, আমি তাকে নজরেই আনতে পারিনি। হঠাৎ দেখলাম রাস্তা পেরুতে যাওয়া একটা গিরগিটির ওপর সাপটা ঝাঁপিয়ে পরেছে। এবং মুহূর্তে তাকে খতম করেছে। প্রথম নজরে আমি ছোট্ট গিরগিটিটাকে দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু অজগরটাকে দেখিনি। পরে দেখলাম, ঘাসের ওপর সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। মুখের ফাঁকে গিরগিটিটা। প্রাণপণে

চেচাচ্ছে সেটি। লক্ষ্য করলাম, সাপের কঠোর চোয়ালের ফাঁকে ক্রমশঃ ছোট্ট প্রাণীটার প্রাণ শেষ হয়ে আসছে।

পাঁচটা বাজতে সূর্যের তাপ অনেকটা কমে গেলো। মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগলো। ঠিক তখনই মনে পড়লো যে, সকাল থেকে কোন খাবার খাওয়া হয়নি। এমনকি জল পর্যন্ত নয়। কিন্তু এখানে কাছেপিঠে কোন জলও নেই, জোগাড় করার কোন উপায়ও নেই। অর্থাৎ সকালে মাঞ্চিতে ফিরে গেলে তবে তৃষ্ণা মেটাতে পারবো। নতুবা নয়। সত্যই, ভীষণ চিন্তার ব্যাপার।

চারিদিকে একটা অদ্ভুত নৈঃশব্দ বিরাজ করছে। কিন্তু হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে খান খান করে দিল একটি বন্য মোরগের কোঁ-কোঁক-কোঁক আওয়াজ। ডাকটা আমার বা পাশের পাহাড় থেকে আসছে। মনে হয় সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে রণে আহ্বান জানাচ্ছে। তাই বুনো মোরগটির আওয়াজের পাল্টা আওয়াজ শোনা গেলো একটু দূর থেকে ডেকে ওঠা আরেকটি মোরগের কণ্ঠে।

দু'জনের মধ্যে চললো পাল্লা দিয়ে ডাক। তীব্র আওয়াজ করতে করতে তারা পরস্পরের মুখোমুখি হতে চেষ্টা করছে। আওয়াজের তীব্রতা থেকে বুঝলাম ঝগড়া তখন প্রলয় রূপ ধারণ করেছে। শেষ পর্যন্ত তারা সম্মুখসমরে হাজির হলো। শুরু হলো যুদ্ধ।

আমার দুর্ভাগ্য যে, রণে ব্যস্ত মোরগদুটিকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাদের মধ্যে যুদ্ধ চলেছিল প্রায় দশমিনিট। সরাসরি মোরগদুটিকে দেখতে না পেলেও তাদের যুদ্ধের দৃশ্যটি আমার পক্ষে কল্পনা করে নিতে অসুবিধা হলো না। এক সময় যুদ্ধ শেষ হলো। একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হার স্বীকার করে যুদ্ধে নিরস্ত হলো। পরাজিত মোরগটি দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলো। মুহূর্তের জন্য আমি সেই মোরগটিকে দেখলাম। বাদামী রঙের পাখনা উড়িয়ে সে নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটে গেলো পাহাড়ের দিকে। অন্য মোরগটি সেখানেই থেকে গেলো এবং সদর্পে বিজয় ঘোষণায় ডেকে উঠলো কোঁ-কোঁক-কোঁক।

মোরগ দুটির লড়াই-এর সুযোগে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেলো। খানিক পরেই উপত্যকার ঝরণা এলাকা থেকে বুনো মোরগের ডাক শুনতে পেলাম। বুঝলাম সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। মোরগগুলো কোঁক-কোঁক-কোঁক শব্দে একসঙ্গে ডেকে উঠছে। একদিকের মোরগদের ডাকের সঙ্গে তাল

মিলিয়ে পাহাড়ের অন্যদিক থেকেও মোরগেরা ডেকে উঠছে। একটা ময়ুর ছানাও থেকে থেকে ডেকে উঠছে। শুরু হয়ে গেলো রীতিমতো জলসা। বুলবুল পাখীরাও যোগ দিল এই জলসায়। যাঁরাই এই ধরনের সুন্দর বনভূমিতে গিয়েছেন তারা কখনোই ভুলবেন না পাখীদের একাত্মতার কথা।

আমি একমনে অনেকক্ষণ ধরে পাখীদের কলকাকলী শুনছিলাম। কিন্তু ওদিকে মনকে আটকে রাখলে বাকী কাজ চলবে কি করে! এখন থেকে আমাকে ভীষণভাবে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা, সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছে। অন্ধকার চুপি চুপি করে বনরাজ্যকে গ্রাস করে ফেলেছে। রাতের অন্ধকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানটার মনে পড়বে শিকারটার কথা। তাই সে যে কোনমুহূর্তে হাজির হতে পারে এইখানে—শিকারের কাছে।

এদিকে দুইদল বানর এমন ভাবে কিচিরমিচির জুড়ে দিয়েছে যে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। বানরদের চিৎকারে গোটা বন মুখরিত। এটা তাদের প্রতিদিনকার ব্যাপার। সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা এরকম ভাবে চীৎকার জুড়ে দেয়। বানরদের একটা দল রয়েছে আমারই পাশের পাহাড়টায় আর অন্য দলটি নদীর ঠিক ওপারে পাহারটার ওপরে কোন এক জায়গায়। দুই পাহাড়ের মাঝখানে সুবিস্তৃত উপত্যকা। পাহাড়ের এদিক থেকে একদল বানর ডাক পাঠিয়ে অন্য দিকের আরেক দলকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। ঠিক এমনি ভাবে চলছে অভ্যর্থনা আর পাল্টা অভ্যর্থনা। উল্লাসে তারা নাচানাচি জুড়েছে। হুপ হুপ শব্দ তুলে এক ডাল থেকে অন্য ডালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি অবশ্য এদের কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে শুধু মাত্র বানরদের লাফিয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

এই সময়ে বানরদের উপস্থিতিতে আমি মনে মনে তাদের ধন্যবাদ জানালাম। কেননা, আমি জানি যে এই বানরদের রয়েছে একজন করে প্রহরী। তারা সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি চারিদিকে ছড়িয়ে রেখেছে। চুপ করে বসে আছে গাছের আড়ালে কোন রকম নড়াচড়া কিংবা বিপদের পূর্বাভাষকে ধরার জন্য।

আমার পেছনের পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন আমার চারদিকে ঘন অন্ধকার। কিছুক্ষণ আগেও যে ঘাস, ঝোপ ও পাথরের চাঁই-গুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, সেগুলো এখন আবছা দেখাচ্ছে, দূরের দৃশ্যগুলো ক্রমশঃ যেন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কয়েক মিনিট বাদে আমার চোখে ধরা

পড়লো শুধুমাত্র কাছের ঝোপটা, তার ওপাশে দৃষ্টি গেলো না। অন্ধকারে অন্য সব কিছু যেন মিশে মিশে একাকার হয়ে গেছে। প্রথমে পাঁশুটে, তারপর বাদামী এবং শেষ পর্যন্ত ঘন কালো রঙে যেন গোটা বন ঢেকে গেলো। মাটিও ক্রমশঃ কালো হয়ে গেলো। মাত্র দশগজ দূরে মুথুর মৃতদেহটাকে একটা আকৃতিবিহীন ভয়ানক কালো স্তূপের মতো মনে হলো।

মাথার পিছনে হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দ শুনে আমি খানিকটা হকচকিয়ে গেলাম। দেখলাম একটা লম্বা কানওয়ালা বাদুড় এসে হাজির। বাদুড়টি ভেবেছিল আমার টুপির ঘাসের মধ্যে হয়তো পোকামাকড় রয়েছে। আর তারই খোঁজে সে এসেছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি নাইট্‌জার ডানা ঝট্‌পটাতে ঝট্‌পটাতে আমার দুর্গের একটা পাথরের ওপর এসে বসলো। আমার একদম হাতের কাছে সেটি, ইচ্ছে করলেই যেন ধরতে পারি। আমি এত স্থির হয়ে বসেছিলাম যে, পাখীটা বুঝতেই পারেনি কাছেই রয়েছে একজন মানুষ। অসীম ধৈর্যের কথা ভেবে আমি নিজেই নিজের প্রশংসা করলাম। নাইট্‌জারটা নিশ্চিন্ত মনে পাথরের ওপর বসে ডেকে উঠলো। তারপরই মৃতদেহটা তার নজরে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ে পাখা মেলে দূরে কোথাও চলে গেলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার ডাক শুনতে পেলাম। সম্ভবতঃ এখন সে যেখানে আছে সেটিকে তার অনেক বেশী নিরাপদ মনে হয়েছে। আর তাই সে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গলার স্বর তুলে ডেকে উঠছে।

এখন অন্ধকার এত প্রবল যে আমি সামনের ঝোপ, জঙ্গল, ঘাস কিংবা পাথর, এমনকি মুথুর মৃতদেহটাও আর দেখতে পাচ্ছি না। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যেন আমার সামনে ঘন একটা কালো আবরণ টেনে দেওয়া হয়েছে। সাধারণতঃ অন্ধকার রাতেও তারার আলোতে একটু আলো হয়। কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তারা আজ খুবই কম দেখা যাচ্ছে। ভেড়ার গায়ের পশমের মতো মেঘপুঞ্জ ইতস্ততঃভাবে সারা আকাশে ছড়িয়ে রয়েছে। রাতের আকাশের নীলচে কালো ইস্পাতের মতো রঙ মেঘরাশির ছিন্ন আবরণে ঢাকা পড়ে রয়েছে। আর সেই মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে রয়েছে তারাগুলোও।

নরখাদকটার পক্ষে আজকের রাতটা আমার উপস্থিতি ধরে ফেলে আমায় না জানিয়ে তার খাদ্যতালিকায় আমাকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। কেননা, এই অন্ধকারে আমার পক্ষে তাকে দেখা সম্ভব নয়। অগত্যা আমাকে

তার দয়ার ওপর নির্ভর করে বসে থাকতে হয়েছিল। হঠাৎ ভয়ে আমি থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। আমার মনে পরে গেলো বৃদ্ধ পূজারী বায়রার অভিজ্ঞতালব্ধ উপদেশগুলো। কেন আমি বায়রার উপদেশ অগ্রাহ্য করে এই বিপদের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিলাম? আবার পরক্ষণেই মনে হলো, এক দৌড়ে এই ভয়ঙ্কর জায়গাটি ছেড়ে পালিয়ে ঐ তেঁতুল গাছটার কাছে চলে গেলে কেমন হয়, যেখানে আমার বন্ধু ঐ জংলী আদিবাসীটি আশ্রয় নিয়েছে। কেল্লার মধ্যে চাপা পড়ার আশঙ্কায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসতে লাগলো, বন্দী হবার ভয় আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসলো যে, সারা শরীর মুহূর্তে ঘেমে নেয়ে উঠলো। ভয়জনিত স্নায়বিক দুর্বলতা আমাকে চেপে ধরলো। শুনতে পেলাম দূরের একটা ঝুটিওয়ালা প্যাচার কর্কশ ডাক—উঃ! উহুঃ! উঃ! উহুঃ!

ঠিক সেই মুহূর্তে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে ডেকে উঠলো একটি পুরুষ সম্বর। আওয়াজটি এলো উপত্যকা থেকে। আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে সে করুণ স্বরে ডেকে উঠলো আর-র-আর-র-আর-র-র। তার কণ্ঠে আতঙ্ক। এবার সে শেষবারের মতো ডেকে উঠলো। আর তারপরই সব চুপচাপ।

আমার বুঝতে দেরী হলো না এই মুহূর্তে যে জন্তুটিকে হত্যা করা হলো সেটি একটি পুরুষ সম্বর। কেননা, মেয়ে সম্বরের ডাক এর থেকে অনেক বেশী তীক্ষ্ণ, আর চিত্রল হরিণের গলার আওয়াজ সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। হরিণটির হত্যাকারী হিসেবে আমার সম্ভাব্য তিনটি শত্রুর কথা মনে হলো—হয় বুনো কুকুরের দল, নয়তো কোনো বাঘ বা চিতাবাঘ। কিন্তু বুনো কুকুর যে হরিণটিকে হত্যা করেনি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কেননা, তাহলে শিকারের আগে শব্দ পেতাম। বিশেষ করে কুকুরের গলার আওয়াজ। আর কুকুররা অন্ধকার রাতে সাধারণতঃ শিকার করে না। তাহলে সম্ভবতঃ কোন বাঘ বা চিতাবাঘ হলো আসল হত্যাকারী। এরা ছাড়া সম্বরের মতো শক্তিশালী পশুকে অন্য কেউ মারতে পারে না। এমনকি চিতাবাঘকেও অনেকসময় সম্বরকে হত্যা করতে বেগ পেতে হয়।

সব ভেবে শেষপর্যন্ত স্থির সিদ্ধান্তে এলাম যে, সম্বর হত্যার কাজটি করেছে কোন বাঘই। কিন্তু এটা কি সেই নরখাদকটি, যেটি ইতিমধ্যেই নরমাংস ভক্ষণ করে বেশ হাঁকডাক অর্জন করেছে? নাকি হত্যাকারী একটি সাধারণ বাঘ, যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এই এলাকায় চলে এসেছে? আমার ধারণা ছিল, নরখাদকরা শুধু মানুষের মাংসই খায়। তবে মানুষ শিকার করা খুবই শক্ত

এবং পাওয়াও যায় কম। তাই অন্য প্রাণী হত্যা করেও খেতে হয়। আমার হঠাৎই মনে পরে গেলো যে, এখানকার নরখাদকটি এখন রীতিমতো ক্ষুধার্ত। কেননা, কয়েকদিন ধরে শিকার ধরে মনের মতো করে ভোজন করতে পারেনি। খুব সম্ভবতঃ নরখাদকটি মুণ্ডুর মৃতদেহটির সন্ধানে এদিকে আসছিল। পথের মধ্যে হঠাৎ সম্বরটি পড়ে যাওয়ায় সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটির উপর।

সম্বরটি এতক্ষণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। তাই সব চুপচাপ। কোনো শব্দ নেই। বাঘটি সম্ভবতঃ নতুন শিকারটি নিয়েই রাত কাটিয়ে দেবে সেটির মাংস ভক্ষণ করে ক্ষুধা মেটাবে সে। অর্থাৎ আজ রাতের মধ্যে সে আর পূজারী বালকটির মৃতদেহের ধারে কাছে আসছে না। সুতরাং আমার জেগে থাকাটাই বৃথা। বাস্তবিকই আমি খুব হতাশ হলাম।

অথচ কিছুক্ষণ আগেই চারিদিকে ঘন অন্ধকার দেখে এবং বাঘটা আমার খুব কাছাকাছি ভেবে আমি কেমন ভয়ে শঙ্কিত ছিলাম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। আবার নিজের ভীরুতার জন্য মনে মনে নিজের ওপর বিরক্তও হলাম।

বৃদ্ধ পূজারী স্বয়ংও যে সম্বরের মৃত্যুকালীন আর্তনাদ শুনতে পেয়েছে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। আমার মতো সেও হয়তো ভাবছে হরিণটার হত্যাকারী কে—সেই নরখাদকটি নাকি অন্য কোনো জানোয়ার। আমি ভাবতে লাগলাম, বায়রা শেষপর্যন্ত কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো সম্ভাব্য হত্যাকারী সম্পর্কে। সম্বরের মৃত্যুর ফলে আমি যে স্নায়বিক উত্তেজনার সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে লড়াই করে চলছিলাম তার অবসান ঘটলো। এখন সম্পূর্ণভাবে উত্তেজনা মুক্ত। কেবল একটাই চিন্তা, নরখাদকটি ফিরে আসবে কি আসবে না!

আধঘণ্টা বা তার বেশী সময় ধরে গোটা জঙ্গলে কোন শব্দ পাওয়া গেলো না। একটা আশ্চর্যরকমের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে চারিদিকে। সম্ভবতঃ অরণ্যের বাসিন্দারা টের পেয়েছে যে তাদের জন্য মৃত্যু ওৎ পেতে রয়েছে এবং উপত্যকার নীচু এলাকার কাছাকাছি যে তার উপস্থিতি প্রকাশ করবে তাকেই পড়তে হবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। আমি হাতঘড়িটার দিকে তাকালাম। তখনও দশটা বাজেনি। তার মানে আরও কয়েকঘণ্টা কষ্ট করে এখানে পাহারার কাজে থাকতে হবে।

আস্তে আস্তে জঙ্গল যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো। আমার ডানদিকে

কয়েকগজ দূরে একটি হরিণের ঘাস খুঁটে খাওয়ার শব্দ পেলাম। ঠিক তারই নীচে উপত্যকায় একটি হাতির বাঁশ গাছ ভাঙবার শব্দ পেলাম।

উপত্যকা থেকে গরম বাতাস দ্রুত উপর দিকে উঠতে শুরু করেছে। আর সেই জায়গা ভরিয়ে দিতে ছুটে এলো পাহাড়ের উপরের ঠাণ্ডা বাতাস। এর ফলে একটা মৃদুমন্দ বাতাস বইতে শুরু করেছে। এই বাতাসের সঙ্গে বয়ে এসেছে মুথুর মৃতদেহের পচা দুর্গন্ধ। সম্ভবতঃ এই দুর্গন্ধ নাকে যেতেই হরিণটি শব্দ করে দু'চার গজ দূরে ছুটে গেলো। আর তারপরই সে থেমে গিয়ে ডাকতে শুরু করলো—খার! খার! খার! খার!

কয়েক মিনিটের বিরতিতে হরিণটি বারবার ডেকে চলেছে। এতটুকু ছোট প্রাণী যে এমন বিকট শব্দ করে ডাকতে পারে সেটা আমার ধারণার বাইরে ছিল। তবে এটা জানতাম যে, এই ধরণের নিস্তব্ধ রাতে এইসব হরিণের আওয়াজ এক মাইলের বেশী দূর পর্যন্ত শোনা যায়।

একটু পরেই লক্ষ্য করলাম, হাতিটা অন্য বাঁশ গাছ ভাঙার উদ্দেশ্যে নদীর উজানের দিকে চলেছে। যাবার পথে সে হাজির হলো মৃত হরিণটার কাছে। সেইসময় সম্ভবতঃ হত্যাকারী মরাটাকে মনের সুখে খাচ্ছিল। আর হাতিটা সেটা দেখেই উত্তেজিত হয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বিকট আওয়াজে ডেকে উঠলো। হাতিটার বিকট আওয়াজ থেমে থেমে চললো। ভেঙে গেলো আরণ্যক নিস্তব্ধতা।

আর ঠিক তারপর হিংস্র বাঘের গর! গর! হুঙ্কার আমার কানে ভেসে এলো সেই একই দিক থেকে। হাতিটার গর্জন তখনও চলছে। আর এই গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে বাঘটাও প্রবল আক্রোশে হুঙ্কার দিয়ে চলেছে। আমি বাঘ ও হাতির মুখোমুখি উপস্থিতির চিত্রটা মনে মনে কল্পনা করে নিলাম। বাঘটা হয়তো হরিণের মৃতদেহটা খাচ্ছিল নয়তো সেটিকে আগলে রেখে ঘুমুচ্ছিল। হাতিটা হঠাৎ এসে পড়াতেই শুরু হলো গর্জন আর গর্জন। এই গর্জন আর পাল্টা গর্জন কি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরিণত হবে নাকি দুটোর মধ্যে কোনো একটি ভয়ে পালাবে?

হাতির গলার স্বর পাল্টাতে লাগলো। আগে ভয়ে যেমন বিকট ভাবে হাতিটা চিৎকার করছিল এখন আর সেভাবে গর্জন করছে না। বরং বেশ সময়ের বিরতিতে এবং অপেক্ষাকৃত নীচু স্বরে সে রাগ প্রকাশ করছে। আমার বুঝতে কষ্ট হলো না যে, ওটি একটি পুরুষ হাতি। এই বাঁশঝাড়কে সে তার নিজস্ব

এলাকা মনে করে। আর তাই এই বনে বাঘের উপস্থিতিতে সে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়েছে। তারই ফলে প্রথমে বিকটভাবে গর্জন করে উঠেছিল।

বাঘটা এখন কি করবে? অবশ্য আমাকে আর কষ্ট করে ভাবতে হলো না। ওরাই সমস্ত ভাবনা দূর করে দিলো। হঠাৎ বাঘটা তার দুর্জয় সাহস হারিয়ে ফেললো। শিকার ছেড়ে সে বিরক্ত হাতিটিকে পথ করে দেবার জন্য সরে দাঁড়ালো। ফলে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলো। হাতিটি তার বিক্রমে শত্রু পিছু হটেছে যখন বুঝলো তখন চেঁচামেচি বন্ধ করে শান্ত হলো।

বনভূমিতে ফিরে এলো আবার শান্তি। আকাশে এখন আর আগের মতো মেঘের তেমন আনাগোনা নেই। তারাগুলো যেন ছোট ছোট ফুলের মতো আকাশের বুকে ফুটে রয়েছে। তারার আলোয় আমি মুথুর মৃতদেহ এবং আশেপাশের ঝোপঝাড় বেশ স্পষ্ট করেই দেখতে পাচ্ছি। এখন যদি নরখাদকটি মুথুর মৃতদেহের সন্ধানে এদিকে আসে তাহলে নিশ্চিত আমি তাকে দেখতে পাবো। তবে এই প্রসঙ্গে আমার মাথায় চিন্তা দেখা দিলো, এই মাত্র হাতির সঙ্গে যে বাঘটার মুখোমুখি ঝগড়া হয়েছে সেটি কি নরখাদকটি নাকি অন্য বাঘ। তবে যেভাবে বাঘটি ভীরুতার পরিচয় দিয়েছে তাতে মনে হয় এটি সেই নরখাদকটিই।

হঠাৎ সেই মুহূর্তে একটি ক্রুদ্ধ গর্জন আমার ভাবনা চিন্তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। শব্দটা একবারের বেশী শুনতে পেলাম না। আর তাই আমি ঠিক অনুমান করতে পারলাম না আওয়াজটা কোন্ দিক থেকে এসেছে এবং ঠিক কোন্ জানোয়ারের। তবে এ ব্যাপারে আমি স্থির নিশ্চিত যে ওটা গর্জনেরই আওয়াজ। সম্ভবতঃ আওয়াজটা আমার পিছনের দিকের পাহাড়ের নীচু থেকে এসেছে। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত নই।

যতটা সম্ভব সতর্কতার সঙ্গে দেহটা বাঁ দিকে একটু হেলিয়ে পেছন ঘুরে তাকালাম কোন কিছু আসছে কিনা তা দেখার জন্য। কিন্তু ডানদিকে মুথুর নির্জীব দেহটা ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না।

ঠিক এই সময়েই আরেকবার ক্রুদ্ধ গর্জন ধ্বনি শুনতে পেলাম। এবার আরও উচ্চস্বরে এবং অনেক কাছাকাছি থেকে। এবার আর আমার কোন দ্বিধা রইলো না। নিঃসন্দেহ হলাম যে, বাঘটা পাহাড় থেকে নেমে আসছে এবং আসছে সোজা আমার দিকেই।

বাঘটাকে তার শিকার থেকে তাড়িয়ে দিয়ে হাতিটা আমার যে উপকার

করেছে তার জন্য আমি নিজের মনেই হেসে উঠলাম। ওদিকে হাতির তাড়া খেয়েই বাঘটার মনে পড়ে গেল যে, আগের দিন বিকেলেই পাহাড়ের উপরে সে তার মুখরোচক হিসেবে সুস্বাদু মানুষ হত্যা করে রেখে এসেছে। আর তাই সে এখন সেই মানুষের মাংস খেতেই ফিরে আসছে। আসার পথে গর্জন করছে সে। হাতিটা যেভাবে তাকে বিরক্ত করেছে তারই রাগ হিসেবে বাঘটি গর্জন করছে।

সত্যিই আমার ভাগ্য খুব ভালো। কেননা, এই অন্ধকার রাতে বাঘটা যে শুধু তার উপস্থিতি জানিয়েই আমার উপকার করেছে তাই নয়, হাতিটার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছে এমনভাবে যে, মুথুর মৃতদেহটার কাছে পৌঁছুবার সময় সে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে পারবে না। সোজাকথায়, এই অবস্থায় আমার উপস্থিতি সে ধরতে পারবে না। এটা ভেবে মনে মনে আমি বেশ খুশীই হলাম।

বাঘটা পরপর দুবার গর্জন করে উঠলো। আমি আমার বাঁদিকে খানিকটা নীচে তাকিয়ে দেখলাম অন্ধকারে লম্বা আকৃতির একটি ছায়ামূর্তি। মনে হলো, সেটি হাঁটছে এবং শেষে মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে। আবার পরক্ষণেই তাকে দেখতে পেলাম। এবার দূরে নয় একেবারে আমার সামনে। ছায়ামূর্তিটা নিশ্চয়ই তাহলে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

বাঘটা আবার গর্জন করে উঠলো। বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, তখনো সে হাতিটার কথা ভেবে মনে মনে রাগে ফুঁসছে। হাতিটা যেভাবে তাকে বিরক্ত করেছে সে কথা সে যেন মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। বাঘটির এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে যে গরগর শব্দ বের হচ্ছে আমি সেটা শুনতে পাচ্ছি।

হঠাৎ ছায়ামূর্তিটা সামনের ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে দেখলাম লম্বা আকৃতির সেই ছায়ামূর্তিটা বা দিক থেকে ডান দিকে সরে গেলো। একেবারে সোজা মুথুর মৃতদেহটার কাছে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। আমি ও বায়রা বেশ পরিশ্রম করে যে ছোট্ট দুর্গটি বানিয়েছি সেটির দিকে সেই ছায়ামূর্তিটা ফিরেও তাকালো না।

বাঘটার মেজাজ এতই খিঁচরে রয়েছে যে, পূজারী বালকটির মৃতদেহটি নিয়ে টানাটানি করার সময়ও সে গর্জন করে চলেছে। একটু আগেই হাতিটার কাছে বাধা পেয়ে যেভাবে তাকে সম্বর মাংসের আশা ত্যাগ করে

হটে আসতে হয়েছে সেজন্য সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। তার সেই রাগ অন্যকিছুর ওপর প্রয়োগ করার কথা ভেবেই সে এখনো গজরাচ্ছে।

আমি এই মুহূর্তে অনুভব করতে পারলাম, আমাকে যে কাজটা সম্পন্ন করতে হবে সেটা কত দুরূহ। প্রথম গুলিতেই বাঘটাকে হত্যা করতে হবে নতুবা বাঘটার পায়ে এমন ভাবে গুলি ছুঁড়তে হবে সে যাতে অচল হয়ে পড়ে, তাহলেই সে আমার ওপর প্রতিআক্রমণ চালাতে পারবে না। বাঘটা ও আমার মধ্যে দূরত্ব মাত্র দশ গজ। কিন্তু তবুও আমি তাকে স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে যেন কালো একটা কিছু দাঁড়িয়ে রয়েছে। সঙ্গে টর্চ নেই, নেই অন্য কোন আলোর ব্যবস্থা। এমনকি রাতের বেলায় রাইফেল থেকে সহজে গুলি ছোঁড়ার জন্য নির্দেশক হিসেবে যে সাদা কার্ড ব্যবহার করা হয় সেটিও সঙ্গে নেই। এমন কি আমার এই পুরোনো পয়েন্ট ৪০৫ রাইফেলে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যা অন্ধকারে দেখতে সাহায্য করে।

আমি ঠিক করলাম এটাই সবচেয়ে ভালো সুযোগ। এখুনি যা করার করতে হবে। কেননা বাঘটা এখন তার সমস্ত ক্রোধ বর্ষণ করছে মুথুর মৃতদেহটার উপর। বেশী দেরী করা ঠিক হবে না। একবার যদি বাঘটা শান্ত হয়ে বসে মুথুর দেহটাকে খেতে শুরু করে তাহলে সে আমার রাইফেলের নড়াচড়ার শব্দ সহজেই শুনে ফেলবে। তখন উল্টে আমাকেই আক্রমণ করে বসবে। আর দুরের মৃত সম্বরের মাংস যদি সে প্রয়োজনমতো খেয়ে থাকে তাহলে সে ওর দেহটা নিয়ে আর টানাহ্যাচড়া করবে না। বরং চলে যাবে। রাতে আবার ক্ষুধার্ত হলে ফিরে আসতে পারে আবার নাও আসতে পারে।

এতসব ভাবনা চিন্তার পর আমি রাইফেলটিকে সতর্কতার সঙ্গে বাঘটির দিকে তাক করাই ঠিক করলাম। খুব সতর্কতার সঙ্গে রাইফেলটি কাঁধের সঙ্গে ঠেকালাম, যাতে রাইফেলের আঘাতে ছোট্ট দুর্গটার কোন পাথর পড়ে না যায়। পেছনের বাঁটটা কাঁধের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাইফেলটিকে শক্ত করে ধরে লক্ষ্য ঠিক করলাম সামনের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা বাঘটির দিকে।

আমি জানতাম যে এই অন্ধকারে একগুলিতে বাঘটির দেহের কোন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গুলি করা সহজ নয়। তবুও চেষ্টা করতে দোষ কি! তবে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে ঝুঁকির। কেননা, একগুলিতে বাঘটা নিহত নাও হতে পারে, হয়তো সামান্য আহত হলো সে। কিন্তু সেটা হলেই ঘটবে বিপদ। বাঘটি আহত হয়ে রীতিমতো ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে আমাকেই

আক্রমণ করবে। তবে একটা কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, একগুলিতে বাঘটি নিহত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, এক শতাংশ মাত্র।

তবুও শেষ পর্যন্ত শক্ত করে রাইফেলটি ধরলাম। পরক্ষণেই ট্রিগারে চাপ দিলাম। চারিদিক কাঁপিয়ে গুলি ছুটে গেলো। সেই গুলির শব্দ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চারিদিকে গোলমাল সৃষ্টি করলো। বাঘটাও ক্রুদ্ধ গর্জন করে চারিদিক কাঁপিয়ে দিল। আমার ভাগ্য ভালো, যখন গুলি ছুঁড়েছিলাম তখন বাঘটা আমার দিকে পেছন ফিরে ছিল। তাই সে গুলির আওয়াজটা কোনদিক থেকে এসেছে তা বুঝতে পারেনি। তার ধারণা হলো, তার শত্রু সামনের ঝোপে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। এবং মুহূর্তের মধ্যে সে ঐ ঝোপের ওপর লাফিয়ে পড়লো। তার হিংস্র থাবার আঘাতে আঘাতে ঝোপের পাতা ঘাস ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো। আমার অনুমানই ঠিক হলো, বাঘটা গুলিতে আহতই হয়েছে শুধুমাত্র। আগে থেকেই সে রাগে ফুঁসছিল, এখন রীতিমতো মারাত্মক হয়ে উঠলো।

সেই মুহূর্তে আমি আরেকটি ভুল করে বসলাম। আরেকটা গুলি ছুঁড়লাম বাঘের ছায়ামূর্তিটার দিকে। ব্যস্, আর যায় কোথায়! আমি যদি গুলিটা না ছুঁড়তাম তাহলে হয়তো বাঘটা ঝোপটাকে হাতড়ে কিছু না পেয়ে ফিরে যেত। আমি যে এখানে আছি সেটা খেয়ালও করতো না।

কিন্তু দ্বিতীয় গুলি খেয়ে বাঘটা রূপ পরিবর্তন করলো। এবার সে হুঙ্কার দিয়ে ওপরের দিকে দেহটা ছুঁড়ে দিয়ে ধপাস করে নিচে ফেললো নিজেকে। আর তারপর দিশেহারা হয়ে পাগলের মত মাটিতেই ঘুরতে লাগলো। সঙ্গে বিশাল গর্জন। বুঝলাম, বাঘটার মেরুদণ্ডটা ভেঙ্গে গেছে। তাই সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। এতক্ষণ পরে বাঘটা ধরতে পারলো যে, তার আক্রমণকারী কোথায় লুকিয়ে রয়েছে। সে অতিকষ্টে নিজের দেহটাকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে কিছুটা টেনে এনে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আমি সতর্কই ছিলাম। তাই তিড়িং করে লাফিয়ে কয়েক গজ দূরে সরে গেলাম। এবং তাড়াতাড়ি রাইফেলটা ঠিক করে ধরে তৃতীয়বারের মতো গুলি করলাম। নিশানা অব্যর্থ হলো। গুলি গিয়ে লাগলো বাঘটার মাথায়। আমি ছোট পাথরের দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলাম। একটানা এগারো ঘণ্টা ঐ ছোট্ট জায়গার মধ্যে বসে থাকায় পায়ের শিরায় টান ধরে গিয়েছিল। পাটা তাই চিন্ চিন্ করে উঠলো, মনে হলো যেন পায়ের কোন শক্তি নেই।

এদিকে, বাঘটা তৃতীয় গুলি খেয়ে নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। তবে যন্ত্রণায় সে তখন রীতিমতো কাতর, হাঁফাচ্ছিলও বেশ। বোঝা গেল যে, সে এখনো মরেনি। পাথরগুলোর ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, বাঘটা সমান ভাবে হাঁপাচ্ছে ও কাতরাচ্ছে। বাঘটাকে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতে ছুঁড়লাম আরেকটা গুলি। এবং সেটাই ছিল আমার শেষ গুলি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চারিদিক শান্ত হয়ে গেলো। আমি বায়রার গলা শুনতে পেলাম। সে জানতে চাইলো সব ঠিক আছে কিনা। আমি বললাম, না কোন ক্ষতি হয়নি। বায়রাকে কাছে আসতে বললাম।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই বায়রা অন্ধকারের মধ্য থেকে উঠে এলো। আমি তাকে সবিস্তারে ঘটনাটা বললাম। সেই সময় উপত্যকা থেকে ভেসে এলো হাতিটার গর্জনের আওয়াজ।

আমাদের কাজ শেষ। অন্ধকারের মধ্য দিয়েই সরু জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে চললাম মাঞ্চি গ্রামের দিকে। পথ চিনে নিতে কোন ভুল হলো না। অবশ্য বায়রা সঙ্গে ছিল বলেই সহজে পথ ধরে চলে আসতে পেরেছি গ্রামের মধ্যে। গ্রামে পৌঁছে আমি আমার ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। গ্রামের ছেলে বুড়ো, এমনকি মেয়েরা কোলের বাচ্চা নিয়ে এসে হাজির হয়েছিল ঘটনা শুনতে। তারা বাঘ আর মুথুর দেহটা নিয়ে আসতে চাইলো। ফলে আমরা আবার জঙ্গলের দিকে এগুলাম। তবে সঙ্গে এবার আলো নিয়েছিলাম।

গিয়ে দেখলাম, বাঘটা চিতপাত হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রথম গুলিটা লেগেছে তার পাকস্থলীতে। দ্বিতীয়টা ঘাড়ের একটু উপরে গিয়ে এমন ভাবে বিঁধেছে যে শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেছে। এই দ্বিতীয় গুলিটাই বাঘটাকে চলাফেরায় অক্ষম করে দেয়। ফলে সে আর পালাতে পারেনি। আমাদের ধারণা ঠিকই অল্প বয়সের একটা বাঘ। এবং সেটাই হচ্ছে তার ভুল ও অনভিজ্ঞ কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের অন্যতম কারণ। গ্রামের লোক জানতে চাইলো, কেন মুথুর মৃতদেহটা টোপ হিসেবে ব্যবহার করলাম। ওদের প্রশ্নের পাল্টা হিসেবে আমরা জানতে চাইলাম, কেন তারা একজন বুজরুক যাদুকরকে তাদের মধ্যে জায়গা দিয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁদের এটাও মনে করিয়ে দিলাম যে, নরখাদকটির হাত থেকে আমরাই তাঁদের বাঁচিয়েছি। বাঘটাকে মারতে মৃতদেহটা টোপ হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না সেটাও বললাম। এরপর আর গ্রামের লোকেরা কিছুই জানতে চায় নি।

পেঙ্গাচেরুভুর খোঁড়া বাঘ

২

গুণ্টাকল থেকে মিটারগেজ লাইনের ছোট ট্রেনে চড়ে যদি আপনি পূর্বদিকে বেজওয়াড়া (বর্তমানে যার নাম বিজয়ওয়াড়া) শহরের দিকে যান তাহলে দ্রোনাচেলম জংশন পার হতেই আপনাকে অন্ধ্রপ্রদেশের বহুল পরিচিত ও ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সোজা নান্দিয়াল হয়ে বাসবপুরম্, চেলিমা, বোগোড়া ও দিগুভামেট্টা স্টেশন পার হতে হতে দেখবেন দু'পাশে ঘন সবুজ অরণ্যের বিস্তার।

দক্ষিণ ভারতে একমাত্র এই রেলপথের দু'ধারের গভীর অরণ্যেতেই এখনো বৃহদাকৃতির নীল গাই-র দেখা মেলে। চিন্নামন্ত্রলামান্নায় বনবিভাগের যে বাংলো রয়েছে তারই ধারে কাছের জঙ্গলগুলোতে এদের বিশেষ করে দেখা যায়। এক সময় এই বৃহদাকার প্রাণীটিকে সর্বত্র দেখা গেলেও আজ আর দক্ষিণ ভারতের অন্য কোন জঙ্গলে এদের দেখা মেলে না।

নীলগাই ছাড়াও ভারতীয় উপমহাদেশে যতরকমের হরিণ আছে সে সবই রয়েছে এখানকার জঙ্গলে। এছাড়া রয়েছে প্রচুর পরিমাণে বুনোশূয়র। স্বাভাবিকভাবেই এই সব প্রাণীরা আকৃষ্ট করে বাঘ ও চিতাবাঘকে। কেননা, যেখানেই প্রচুর খাদ্য মেলে সেখানেই এদের বেশী করে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন কোনকারণে প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাব ঘটে তখনই বাঘ ও চিতাবাঘের দল গ্রামের বাইরে মাঠে রাখালেরা যে গরু ছাগল ও ভেড়া চরায় সেখানে গিয়ে হানা দেয় শিকারের সন্ধানে। আর তখনই রাখালদের সঙ্গে বাঁধে সংঘর্ষ। রাখালেরা বর্শা ছুড়ে কিংবা গুলি করে কিংবা অন্য কোন ভাবে তখন বাঘ বা চিতাবাঘকে তাড়াতে বাধ্য হয়। ফলে বাঘ বা চিতাবাঘ আহত হয়। অবশ্য অন্যভাবেও তারা আহত হতে পারে। ফলে তখন তাদের দেহের কোন না অংশ পঙ্গু হয়ে হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই শিকার করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় ক্ষুধা মেটানোর জন্য তখন মানুষ হত্যার সহজ পথটি তাদের বেছে নিতে হয়।

এই এলাকায় মানুষখেকো বাঘের উৎপাত অনেকদিন ধরেই। আমরা

ইতিমধ্যেই একটা মানুষখেকো শিকার করার গল্প বলেছি। উপরে যে সব স্টেশনের নাম বলেছি সেগুলোর কোনটির লাইনের ধারে সেই বাঘটি উৎপাত করে বেড়াত। এখন আমরা যে মানুষখেকোটার গল্প বলবো সেটি ঐ অঞ্চল থেকে আরও কয়েকমাইল উত্তরে তার ডেরা পেতেছে।

সেই জায়গায় যেতে হলে ট্রেনে চড়ে দিগুভামেট্টা স্টেশনে না নেমে আরও চল্লিশ মাইল এগিয়ে যেতে হবে। নামতে হবে মারকাপুর স্টেশনে। এবং সেখান থেকে সড়ক ধরে উত্তরদিকে আরও চল্লিশমাইল যেতে হবে। রাস্তাটি এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে ছবির মতো সুন্দর একটি ঘাটের কাছে। সেটা দিয়ে নেমে গেলেই কৃষ্ণা নদী। রাস্তাটি কৃষ্ণা নদীকে একরকম উপেক্ষা করে সোজা গিয়েছে শ্রীশৈলম নামে এক অখ্যাত জায়গায়। কৃষ্ণানদীর আঁকাবাঁকা পথরেখা দক্ষিণে মাদ্রাজ প্রদেশ এবং উত্তরে হায়দ্রাবাদ নিজামের রাজ্যকে আগে পৃথক করে রেখেছিল। ইংরাজরা চলে যাবার পর নিজামের রাজত্ব শেষ হয়ে যায়। তাই এই সমস্ত এলাকাগুলো বিশালায়তন অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শ্রীশৈলম এতদিন কেবল ধর্মীয় কারণেই পরিচিত ছিল। কেননা, সেখানে একটা বিরাট মন্দির রয়েছে। কিন্তু আজ শ্রীশৈলম সেচ ও বিদ্যুৎ-এর যুগ্ম প্রকল্পের কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

কয়েক বছর আগে যখন এই অঞ্চলে পরিবর্তনের কোন ছোঁয়া লাগেনি তখন মারকাপুর রোড স্টেশন থেকে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত কুড়ি মাইল এই রাস্তাটি ছিল বনে ঢাকা। বাঘের পক্ষে বনটি ছিল খুবই আকর্ষণীয়। বনটি তেমন ঘন ছিল না, আবার বিশাল ঝোপঝাড়ও ছিল না। তবে বাঘের লুকোবার মতো লম্বা লম্বা ঘাস ছিল, ছিল ছোটো ছোটো গাছও। বুনো শূয়র আর হরিণের চরবার সুন্দর জায়গা ছিল এটি, লুকোবারও উপযুক্ত পরিবেশ ছিল সেখানে। তাছাড়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে ছোট ছোট ঝর্ণা। গরমের দিনেও খাবার জন্য তারা জল পেতো এখানে উপযুক্ত পরিমাণে। আবার দক্ষিণের জঙ্গলগুলোতে যে বুনো আঁঠালুর প্রাদুর্ভাব এখানে তা নেই বললেই চলে, নেই পশ্চিমঘাট পর্বতমালার রক্তপায়ী জোঁক। অবশ্য বর্ষার পরে মাঝে মাঝে কিছু আঁঠালুর দেখা পাওয়া গেলেও জোঁক এখানে একেবারেই নেই। বাঘেরা এই ধরণের কীটগুলোকে ভীষণ ভয় করে, তাই এদের এড়িয়ে চলে।

স্বাভাবিকভাবেই তাই বাঘ ও চিতাবাঘ, বিশেষ করে বাঘ, এ এলাকায়

ছিল প্রচুর পরিমাণে। এরা নীল গাই আর হরিণ শিকার করে খেতো। শিকারীরাও এখানে খুব একটা আসতো না। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই জঙ্গলগুলোতে হাতি এবং বাইসন কোনসময়ই ছিল না। একমাত্র দুর্লভ নীলগাই-ই হলো শিকারের অন্যতম প্রাণী। কিন্তু সেক্ষেত্রে রয়েছে বাধানিষেধ। একে তো এই অঞ্চল সংরক্ষিত, তার উপর নীলগাই শিকার করা নিষিদ্ধ, ফলে এই অঞ্চলটা কখনোই পর্যটক ও শিকারীদের তেমন ভাবে প্রিয় হয়ে ওঠেনি। আর এখানকার জলবায়ুও ভীষণ রকমের অস্বস্তিকর। শীতকালে যেমন প্রচণ্ড শীত, গ্রীষ্মকালে তেমনি আবার প্রচণ্ড গরম।

বন্যপ্রাণীদের শিকারীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে আরেকটা কারণও যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হলো এখানকার বনে মোটর যাবার জন্য উপযুক্ত কোন পথ নেই। বড় রাস্তা পেরিয়ে বনে যেতে হলে হয় যেতে হবে পায়ে হেঁটে নয়তো গরুর গাড়ী চেপে। কিন্তু এই সবকিছু মিলিয়ে শ্রীশৈলমের জঙ্গল আমাকে বেশ আকৃষ্ট করে নিয়েছে। জনঅরণ্য থেকে দূরে এই অরণ্যের গভীরতায় নিজেকে একসময়ে হারিয়ে খুব আনন্দ উপলব্ধি করেছি।

মারকাপুর-শ্রীশৈলম রোডের ধারে পশ্চিমদিকে রয়েছে একটি ছোট্ট গ্রাম। তার নাম পেড্ডাচেরুভু। এই গ্রামে যেতে হলে গরুর গাড়ীতে করে আঠারো মাইল রাস্তা বনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আমার ধারণা, এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার সময় দ্বিতীয় কোন মানুষের দেখা মেলা সম্ভব নয়। আগেই বলেছি পেড্ডাচেরুভু একটি ছোট গ্রাম। এর দক্ষিণে রয়েছে সুন্দর একটা হ্রদ। গরুর গাড়ী চলার রাস্তাটি সেই হ্রদের ধার দিয়ে দক্ষিণে আরও কয়েক মাইল ভেতরে গিয়ে একটা পাহাড়ের কোলে মিশেছে। তবে পাহাড়ের ঢাল থেকে অস্বাভাবিকভাবে বেকে গিয়ে পথটা চলে গিয়েছে রোল্লাপেন্টা নামক একটা গ্রামের দিকে। সেখানে এই পথটি ডোরানালা গ্রাম থেকে আত্মাকুর শহরে যাবার বড় সড়কের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এর আরও দক্ষিণে চিন্নামন্তলামান্না রেস্ট হাউস। সেখানেই দেখা মেলে বেশী করে দুর্লভ নীলগাই-এর।

এইমাত্র যে হ্রদটার কথা বললাম সেটি চারিদিক থেকে ঘিরে রয়েছে জঙ্গলে। আর এই জঙ্গলে রয়েছে অনেক বাঘ। এই জঙ্গলে বাঘের সংখ্যা এত বেশী যে, এক সময় এরা চিতাবাঘগুলোকেই মেরে খেয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। প্রতিবছর নভেম্বর থেকে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত সময়টা হলো বাঘের

মিলন ঋতু। এই সময় বাঘিনীর প্রয়োজন হয় সঙ্গীর। তখন সন্ধ্যা হলেই, কখনো বা দিনের আলো থাকতেই শোনা যায় বাঘিনীর আমন্ত্রণ ধ্বনি। পুরুষ সঙ্গীকে আহ্বান জানিয়ে সে সময় বাঘিনীর দল অদ্ভুতভাবে ডেকে ওঠে। আর বাঘিনীর সঙ্গে মিলিত হবাব জন্য সে সময় বাঘেদের মধ্যে রীতিমতো মারামারি লাগে। ফলে সে সময় কানপাতলেই শোনা যায় বাঘের ভীষণ হুঙ্কার। আমি আগেই বলেছি যে, বাঘ ও চিতাবাঘের স্বাভাবিক খাদ্যই হলে বন্যপ্রাণী। তবে যখন সেগুলোর প্রাদুর্ভাব ঘটে তখন তারা জঙ্গলে চরতে আসা গৃহপালিত গরু ও ছাগলের ওপর থাবা ফেলে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, মানুষের হানা আঘাতে বাঘ বা চিতাবাঘ পঙ্গু হয়ে পড়লে তাদের পক্ষে স্বাভাবিক খাদ্য শিকার সম্ভব হয় না। আর তখনই তারা মানুষ হত্যা করে খেতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পরিচিত হয় মানুষখেকো হিসেবে। তবে এখন আমি যে কাহিনী বলবো একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই দেখেছি এর ব্যতিক্রম। সাধারণতঃ দেখা গেছে বাঘেরা আহত হয় গুলিতে কিংবা বর্শার ঘায়ে। অনেক সময় ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে গিয়েও বাঘকে আহত হতে হয়।

কিন্তু এ সমস্ত কিছুই ঘটেনি পেড্ডাচেরুভুর মানুষখেকোটার। গুলি করে তাকে মারবার পর আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে, যৌবনকাল তার কেটেছে বেশ ভালোভাবেই। তবে অন্য একটি বাঘের সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে তাকে প্রতিপক্ষের থাবার আঘাতে ডানদিকের চোখ ও কানটা হারাতে হয়। তাছাড়া প্রতিপক্ষ বাঘটা এই বাঘটার সামনের ডান পায়ের ভাজে বারে বারে কামড় দেওয়ার ফলে সেটি তারপক্ষে সোজা করা আর সম্ভব হয়নি। ফলে হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলতে হয় তাকে। তাই তার চলার চিহ্ন সহজে বোঝা যেতো। বাঘটা আহত হওয়া ছাড়াও সে বুড়ো হয়েও পড়েছিল। ফলে সে স্বাভাবিক খাদ্য শিকার করতে পারতো না। যে কোন বাঘের সামনের থাবা বিশেষ করে ডান পায়ের থাবাটা শিকার করার পক্ষে অপরিহার্য। কেননা, ঐ ডান পা দিয়েই সে শিকার ধরে এবং কামড়ে খায়। তাই এই বাঘটির ডান পাটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় সে ছোট হরিণ ছাড়া আর কিছুই শিকার করতে পারতো না। ফলে বাঘটিকে মাসের পর মাস একরকম অভুক্ত থাকতো হতো। অগত্যা তখন সে মানুষ পেলেই হত্যা করতে শুরু করে। বাঘটি বুঝেছিল যে, মানুষের গতি তার থেকে অনেক ধীর। পঙ্গু বাঘের আক্রমণকেও সামলানো কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

পরে পেড্ডাচেরুভুর লোকেরা আমাকে জানিয়েছিলো যে, এই বাঘটার মানুষ হত্যা করার ঘটনাগুলো ঘটার আগে তারা বেশ কদিন ধরে একটা বাঘিনীকে সঙ্গীর খোঁজে ডাকাডাকি করতে শুনেছে।

এই ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে দু'টো বাঘের মধ্যে বাধে ঝগড়া। সময়টা ছিল বড়দিন উৎসবের আগে। অর্থাৎ বাঘের মিলন ঋতুতে। বাঘ দু'টোর মধ্যে মারামারি শুরু হয়েছিল ঠিক সন্ধ্যার সময়। চলেছিল মাঝ রাত পর্যন্ত। উভয়েই দারুণ ভাবে আহত হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীদের একজন হ্রদে জল খেতে গিয়েছিল। তার সেই যাবার পথটি রক্তে ভেসে গিয়েছিল।

অন্য বাঘটি পেড্ডাচেরুভু থেকে ডোরানালা-আত্মাকুর সড়কের ওপর অবস্থিত রোল্লাপেন্টা পর্যন্ত বালির যে রাস্তাটি চলে গিয়েছে সেটি অতিক্রম করে চলে যায় অন্যদিকে। চলে যাবার পথে নরম মাটিতে সে রেখে যায় পরিস্কার রক্তের দাগ। তাছাড়া থাবার তিনটি দাগ স্পষ্ট দেখা গেছে। কিন্তু একটি থাবার দাগ অস্পষ্ট। বালির ওপর এই অস্পষ্ট দাগটি দেখেই বোঝা গেল বাঘটা অন্য পাটা টানতে টানতে চলছিল। এবং ঐ পায়ের ওপর সে শরীরের ওজন রাখতে পারছিল না এটাও বোঝা গেল দাগের অস্পষ্টতা থেকে।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তারপরই একের পর এক এখান থেকে ভেড়া ছাগল ওখান থেকে গ্রাম্যকুকুর নিখোঁজ হতে লাগলো। কিছুদিন পরপর খুঁড়িয়ে চলা বাঘটার বিশেষ ধরণের পায়ের দাগ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, ঐ ভয়ঙ্কর লড়াই-এর পরও বাঘটি বেঁচে রয়েছে। তবে আস্তে আস্তে বাঘটি এই অঞ্চলে পরিচিত হয়ে পড়েছিল 'খোঁড়া বাঘ' হিসেবে।

এই খোঁড়া বাঘকে নিয়ে গ্রামের বয়স্কদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল গুঞ্জন। ফিসফিস করে একজন আর একজনকে শোনাচ্ছে বিভিন্ন ঘটনা। কেউ কেউ নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা আগেই শুনেছে, কেউ কেউ নিজের চোখে দেখেছে। সকলেরই এক ধারণা হলো, যে বাঘ ছাগল, ভেড়া এমনকি গ্রাম্য কুকুর হত্যা করে পেট ভরায় সে একসময় মানুষখেকো বাঘে পরিণত হবে। কেননা, বাঘেরা সাধারণতঃ এই ধরণের খাবার পছন্দ করে না। একমাত্র স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব ঘটলে কিংবা বড় শিকার ধরার ক্ষমতা যদি কোন বাঘ হারিয়ে ফেলে তবেই তারা ছাগল ভেড়া শিকার করতে বাধ্য হয়।

এইসব ঘটনার কিছুদিন পরেই প্রথম একজন মানুষ মারা পড়লো বাঘের হাতে। গ্রামের বয়স্করা তখন আরও ঘন ঘন আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

মাথা নড়তে লাগলো বেশী বেশী। যে লোকটা বাঘের খাবায় প্রাণ খুইয়েছে সে হচ্ছে একজন গাড়োয়ান। পাঁচমাইল দূরের উপত্যকা থেকে বাঁশ কেটে গাড়ীতে বোঝাই করে ফিরে আসছিল বনের পথ ধরে। কিছুক্ষণ আগে যে হ্রদটার কথা উল্লেখ করেছি সেটার পাশ দিয়েই আসবার রাস্তাটা। হ্রদটার কাছে এসে সে গরু দুটোকে জল খাওয়াবে বলে গাড়ী থামালো। কিন্তু গাড়ীটা এতো বোঝাই ছিল যে সে পরে সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলে গরুগুলোকে আর গাড়ী থেকে খোলেনি।

তবে এই সময় সে সম্ভবতঃ হ্রদের কাছে গিয়েছিল জল খেতে। ঠিক তখনই খোঁড়া বাঘটি তাকে আক্রমণ করে।

গরুগুলো বাঘ দেখে ভীষণ পেয়ে যায়। ভারী বাঁশ বোঝাই গাড়ীটাকে টেনে নিয়ে পাগলের মতো ছুটতে থাকে। কিন্তু গাড়ীটা রাস্তার পাশে ঢালে পড়ে গড়িয়ে যায়। আর গাড়ীটা এত বোঝাই ছিল যে গরুদুটোও গাড়ীর সঙ্গে গড়াতে থাকে। ফলে একটা গরুর উরুর হাড় ভেঙ্গে চামড়া ভেদ করে তা ঢুকে যায় সোজা পেটে। আর গাড়ীটা তার ঘাড়ের উপর পড়ায় সে নিশ্চুপ ভাবে পড়ে আছে। দ্বিতীয় গরুটার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। সে কোনভাবে গাড়ীর জোয়াল থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আর তারপর সোজা দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে হাজির হয় গ্রামে। গরুটা গ্রামে পৌছতেই একটা আতঙ্ক দেখা দিল সকলের মনে। গ্রামে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ে রয়েছে। বউটি তখন গ্রামের সকলকে অনুরোধ করলো যে তার স্বামীকে খুঁজতে একটা অনুসন্ধানী দল যাক জঙ্গলে। কেননা, তার সংসারে স্বামীটি যে একমাত্র উপার্জন করে। কিন্তু রাত ক্রমশঃ বাড়তে দেখে কেউই আর তক্ষুনি যেতে রাজী হলো না।

পরদিন সকালে একটু বেলা হবার পর গ্রামের জোয়ান লোকেরা দল বেঁধে গাড়োয়ানের খোঁজে বেরুলো। তাদের প্রত্যেকের হাতেই ছিল অস্ত্র। দু'জনের সঙ্গে গাদা বন্দুক, বাকী সকলের হাতে লাঠি ও বল্লম। অল্পসময়ের মধ্যে তারা অকুস্থলে এসে পৌছায়। দেখতে পেল গাড়ীটা উল্টে পড়ে রয়েছে, তার নীচে চাপা পড়ে রয়েছে গরুটা। কিন্তু গাড়ীর মালিক কোথায়?

মাটিতে গাড়ীর চাকার দাগ অনুসরণ করে তারা গিয়ে হাজির হলো হ্রদটার কাছে। সেখানে গিয়ে তারা খোঁড়া বাঘটার পায়ের ছাপ লক্ষ্য

করলো। দলের কেউ কেউ এদিক ওদিক খুঁজে দেখতে চাইলো। কিন্তু গাদা বন্দুক যাদের হাতে তারা একরকম মনোবল হারিয়ে ফেলল। একজনতো বলেই বসলো যে, তার বন্দুক দিয়ে গুলি বেরুবে না। অন্যজন কোন যুক্তি না দেখিয়ে সোজাসুজি স্বীকারই করে বসলো যে সে ভীষণ ভয় পেয়েছে ফলে দলটি আর এগুলো না। ফিরে গেলো গ্রামে। গাড়োয়ানটির মৃতদেহকে আর তাই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মানুষখেকোটার দ্বিতীয় শিকার হলো একটা স্ত্রীলোক। এই ঘটনাটিও ঘটলো সন্ধ্যেবেলায়। তবে জায়গাটা আলাদা। গ্রামের একশ' গজ দূরে কূয়ো থেকে জল আনতে গিয়েছিল স্ত্রীলোকটি। সেখানে কোন জঙ্গল না থাকলেও পাশে ছিল একটা পিপুল গাছের বাগান। সেটা গিয়ে আবার মিশেছে একটা নারকেল বাগানের সঙ্গে। তবে নারকেল বাগানটা বেড়া দিয়ে চারপাশ থেকে ঘেরা ছিল। তার পাশে ছিল পতিত জমি, সেখানে ঘাসের সামান্য ঝোপ। কিন্তু জঙ্গল আসলে শুরু হয়েছে আরও আধমাইল দূর থেকে। গ্রামের একশ' গজ দূরে যে কূয়ো তার কাছাকাছি কোনদিন বাঘ এসেছে বলে আগে কেউ শোনেনি। এমনকি গ্রামের প্রবীনতম ব্যক্তি যিনি, যার বয়স একশ'রও বেশী, তিনিও কোনদিন শোনেননি এমন কথা।

কিন্তু সেই খোঁড়া বাঘটা সেদিন সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়েছিল কূয়োটার কাছে। সেই হতভাগ্যা স্ত্রী লোকটির সঙ্গে আরও দু'জন ছিলেন। হঠাৎ শোনা গেলো করুণ আর্তনাদ। স্ত্রীলোকটির সঙ্গীরা দেখলো বাঘটা ঘাড় কামড়ে ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেই স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে বনের দিকে চলে গেলো। ঘটনার আকস্মিকতায় ও ভয়ে সঙ্গী দু'জন নির্বাক হয়ে গেলো। হুঁশ হতেই তারা পরি কি মরি করে চীৎকার করতে করতে গ্রামে পালিয়ে এলো।

এরপর আরও কয়েকজন মানুষ মারা পড়লো। একদিন আমি হঠাৎ একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটা লিখেছে আমার বন্ধু বায়ান্না। বায়ান্না জাতিতে তেলেগু। সে থাকে মারকাপুর রোড স্টেশনের ধারে কাছে। চিঠিতে আমাকে গ্রামে কি কি ঘটেছে তা লিখেছে পরিষ্কার ভাবে। সেইসঙ্গে সেখানে গিয়ে বাঘটাকে হত্যা করার অনুরোধ জানিয়েছে। অবশ্য প্রতিশ্রুতি ছিল চিঠিতে। যেমন সে সবসময় সাহায্য করার জন্য আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। সে এও জানিয়েছিলো যে, আমি যেন ট্রেনে করে মারকাপুর

স্টেশনে এসে নামি। সেখান থেকে সে তার ল্যাণ্ড-রোভারে করে আমাকে গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাবে।

এরকম প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে পারা যায় না। তাই আমি টেলিগ্রাম করে বায়ান্নাকে জানিয়ে দিলাম যে, আজ রাতেই এক্সপ্রেস ট্রেনে করে রওনা হচ্ছি। পরদিন সকালেই মারকাপুর রোড স্টেশনে বায়ান্নার সঙ্গে মিলিত হলাম।

বায়ান্না রীতিমতো অতিথি বৎসল। অতিথি আপ্যায়ন করতেও জানে সে। অতিথিদের যত্ন করাকে সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। কিন্তু অনেক সময় অতি-আতিথেয়তা অস্বস্তিকর মনে হয়। বায়ান্না আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলো। আমার স্নানের জন্য দু'ঘণ্টা আগে থেকে জল গরম করে রাখা হয়েছিল। স্নান সেরে খাবার টেবিলে বসে দেখি এক রাজসিক আয়োজন। বিরাট এক থালা মুরগীর মাংসের সঙ্গে একগাদা পোলাও। বায়ান্না প্রায় আদরের সুরে সেগুলো খেয়ে নিতে বললো। বায়ান্না দারুণ অভিমানী। আমি যদি এগুলো না খাই তাহলে সে ভীষণ দুঃখ পাবে। এই ভেবে খেয়ে নিলাম।

ভোজনপর্ব শেষ হওয়ার পর সে আমাকে বাড়ীর পেছনের দিকে গ্যারেজে নিয়ে গেলো। গ্যারেজে দাঁড়িয়ে ল্যাণ্ড রোভারটা। সেটার পেছনটা মালে বোঝাই। আমার সুবিধের জন্য তাতে স্প্রিংএর খাটিয়া থেকে শুরু করে ক্যাম্পচেয়ার, ক্যাম্প বেসিন, কেরোসিন তেল চালিত ছোট একটা রেফ্রিজারেটর, পাখা সবই নেওয়া হয়েছে। কি যে নেওয়া হয়নি সেটাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। সঙ্গে রয়েছে খাবারও। কতকগুলো বস্তায় খাবার ঠেসে ভর্তি করে সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে, গাড়ীতে যে পরিমাণ খাবার নেওয়া হয়েছে তাতে একমাস বেশ ভালোভাবেই চলে যাবে। চারটি প্রাইমাস স্টোভও নেওয়া হয়েছে। এর দু'টিতে আবার একসঙ্গে দু'রকম রান্না চাপানো যায়। বালতি, গামলা ও জল রাখার ড্রামগুলো জায়গার অভাবে আবোল তাবোল ভাবে গাড়ীর সঙ্গে বাঁধা হয়েছে। গাড়ীতে মাল বোঝাই। অবস্থা দেখে মনের কোণে প্রশ্ন জাগলো, গাড়ীতে দু'জনের বসার জায়গা আছে তো?

বায়ান্না বললো, আজ রাতে যাত্রা শুরু না করে বরং রাতটা এখানে ঘুমিয়ে নিয়ে কাল সকালে যাত্রা শুরু করলে কেমন হয়। বললাম গরম জলের

বাথে স্নান করে এবং মুরগীর মাংসের পোলাও খেয়ে আমি এখন চেরী ফুলের মতো সতেজ ও টাট্কা। সুতরাং আমরা এখুনি রওনা হতে পারি। বায়াম্মা আমার কথায় আপত্তি করলো না। একঘণ্টা পর আমাদের ল্যাণ্ড রোভার বড় রাস্তা ধরে উত্তর দিকে শ্রীশৈলমের দিকে যাত্রা শুরু করলো। মালবোঝাই গাড়ীটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলের কোন ঢাকা গাড়ী চলেছে। আমরা ডোরানালা গ্রামটা পেরোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় রাস্তা ছেড়ে এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় এসে পড়লাম। এই পথ ধরে সোজা আঠারো মাইল পথ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়ে হাজির হলাম পেড্ডাচেরুভূ গ্রামে। যাবার পথে আমাদের তুম্মালাবায়ালু বলে একটা জায়গা পার হতে হল। এইখানেই অনেক দিন আগে আমাকে একটা বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তখন আমি ছিলাম তরুণ এবং শিকারেও এত অভ্যস্ত ছিলাম না। ল্যাণ্ডরোভা পেড্ডচরুভূতে পৌছে একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর দাওয়ায় বসে পড়লাম। আমাদের দেখে গ্রামের লোকেরা এসে ভিড় করলো চারপাশে। বায়াম্মা তাদের সঙ্গে তেলেগু ভাষায় কথা বলতে লাগলো।

জানতে পারলাম, সে আমাদের থাকার জন্য একটা ঘরের সন্ধান পাবার চেষ্টা করছে। বেশী সময় লাগলো না। আমাদের চারপাশের লোকজনের মধ্যে স্থানীয় স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষকও ছিলেন। তিনি নিজে থেকেই আমাদের থাকার জন্য তাঁর ছোট্ট স্কুলের প্রধান ঘরটা ছেড়ে দিতে রাজী হলেন।

গাড়ী চালিয়ে গেলাম স্কুল বাড়িটার কাছে এবং জিনিসপত্র সব গাড়ী থেকে নামালাম। সেগুলো এক এক করে ঘরে তোলা হল। মালগুলো রাখার পর দেখা গেল, ঘরে আর ছুঁচ-ফোটাও জায়গা নেই। অবশ্য ঘরের মধ্যে যে সব জিনিসপত্র রাখা হয়েছিল সেগুলোর অধিকাংশই হল অপ্রয়োজনীয়।

কয়েকজন গ্রামবাসী উৎসাহ ভরে আমাদের জন্য জল এনে দিল। তারপর আবার স্নানের জন্য আলাদা একটা বাড়ীতে গেলাম। সেখানে স্নান পর্ব সেরে অন্য আর একটা বাড়ীতে এসে হাজির হলাম। সেখানে আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম সারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সব করার পর আমরা যখন আবার স্কুল বাড়ীতে এসে খেতে বসলাম তখন সময় অনেকটা পেরিয়ে

গিয়েছে। বায়ান্না তাঁর বাড়ী থেকে যে খাবার এনেছিলো তাই দিয়ে দু'জনে দিনের খাওয়া সারলাম।

কিছুক্ষণ পরেই বিকেল শেষ হয়ে গেলো। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও অবশ্য ঘনিয়ে আসেনি। কিন্তু লোকজনের আসা যাওয়া বন্ধ হলো না। গ্রামবাসীদের সকলের চোখেই বিস্ময় ভরা দৃষ্টি। আমাদের কাছে তাদের হাজারো প্রশ্ন। কৌতূহলের যেন শেষ নেই। বায়ান্না তেলেগুতে তাদের প্রশ্নের যথা সাধ্য উত্তর দিতে লাগলো। আমি আমার কাজ সুরু করলাম। গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বেছে নিলাম, যারা মানুষখেকোটা সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। তারপর রাইফেলটা হাতে নিয়ে তাদের সঙ্গে করে ঘরের বাইরে এলাম।

ন আলোয় চারিদিক ফুটফুট করছে। গ্রামের প্রধান রাস্তাটা হ্রদের কাছাকাছি গিয়ে গরুর গাড়ী যাবার রাস্তায় মিশেছে, শেষের রাস্তাটা আবার গিয়ে যুক্ত হয়েছে ভোরানালা-আতমাকুর রস্তার সঙ্গে। রাস্তা ও হ্রদের মাঝখানে আধ ফার্লং দূরত্ব। দূর থেকে লক্ষ্য করলাম, চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় হ্রদের ঢেউগুলো ঝলমল করছে।

আমি সঙ্গী গ্রামবাসীদের নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। কিছুটা যেতেই তারা জানালো, এরপরে যাওয়া বিপজ্জনক। মানুষখেকোটা গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে যে জঙ্গলটা তাতেই নাকি থাকে। আমি তখন বললাম যে, কোন একটা নির্জন শান্ত পরিবেশে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। কেননা, স্কুল বাড়িতে এত হৈ-চৈ-এর মধ্যে কাজের কথা বলা যায় না। আমি আশ্বাস দিলাম যে, বাঘ এলে তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। অবশেষে আমরা হ্রদের ধারে গিয়ে হাজির হলাম। এবং ধার ঘেঁষে একটা জায়গায় বসলাম সকলে মিলে। চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে স্বস্তি অনুভব করলাম। চাঁদের আলোয় হ্রদের ওপারের জঙ্গলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আমার সঙ্গীরা কিন্তু অস্বস্তিতে রয়েছে। উৎকণ্ঠিত হয়ে তারা এদিক ওদিক চোখ ঘোরাচ্ছে। পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করছে চারিদিকে। কিন্তু আমরা এমন একটা খোলা জায়গায় বসেছিলাম যে ধারে কাছে বাঘের পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। তাই তাঁদের ভয় পাবার কোন কারণই নেই। যাই হোক, আমি সকলের মুখ থেকে বাঘের কাণ্ড কারখানা শুনলাম। তাঁরা

আমাকে যে কোন ভাবে বাঘটাকে মারার অনুরোধ জানিয়ে তাদের বক্তব্য শেষ করলো।

আমার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ায় বায়াম্মা সম্ভবতঃ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। আর তাই সে জনাকুড়ি লোক নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে হাজির হয়েছে সেখানে। বায়াম্মা আসার পর আমাদের পরের দিনের কাজের কি রুটিন হবে তা নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলাম।

ঠিক এই সময়ই একটি বাঘ গর্জন করে উঠলো। আমাদের ঠিক উল্টো দিকে হ্রদের ওপারে যে জঙ্গল সেখান থেকেই বাঘটি কিছুক্ষণের বিরতিতে বারবার গর্জন করতে লাগলো। আমরা ঠিক ওপারে হ্রদের জলের সঙ্গে প্রায় মিশে যাওয়া জঙ্গলের অন্ধকার ঝোপগুলোও দেখতে পাচ্ছিলাম। বাঘের এই ডাকটা আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল। মনে মনে খুব খুশী হয়েছিলাম। আবার উত্তেজনাও অনুভব করছিলাম। সব মিলিয়ে গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে চ্যালেঞ্জের মতো লাগছিল। বাঘটা সম্পর্কে এত কথা শুনেছি যে, আমি যদি বাঘটাকে কোনরকমে দেখতে পাই তাহলে তার পঙ্গু পাটা দেখে তাকে চিনতে পারবো। বাঘটি সম্পর্কে যা জানার তা আমার সবই জানা হয়ে গিয়েছে আর খাওয়াও হযেছে যথেষ্ট, তাই বাঘের ডাকে আমি যেন এক নিমন্ত্রণ পেলাম। রাত্রিটাও বেশ অনুকূল। জ্যোৎস্নার আলোয় চারিদিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

আনন্দের আতিশয্যে আমি লাফিয়ে উঠলাম। সঙ্গীদের বললাম, আমি বাঘটার সন্ধানে যাচ্ছি। তারা আমায় এইভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠা দেখে অবাক হলো। সকলে মিলে বাধা দিতে এলো। কিন্তু তার আগেই আমি একছুটে হ্রদের পাশের রাস্তায় এসে হাজির হয়েছি। তারপরই হাঁটতে থাকলাম। আমি জানতাম যে, রাস্তাটা হ্রদের ধার ঘেঁষে চলে গিযেছে ওপারে এবং সেখানে গিয়ে সেটা মিলিয়ে গিয়েছে জঙ্গলে। অনুমান করে নিলাম যে, বাঘটা সম্ভবতঃ এক মাইল দূর থেকে ডাকছে, হয়তো বা তারও বেশী দূরে রয়েছে। ঠিক করলাম, তার গর্জন থামার আগেই সেখানে গিয়ে পৌছুবো। বুঝতে অসুবিধে হলো না যে, বাঘটা হ্রদে জল খেতে আসছে।

প্রায় পনেরো মিনিটের মধ্যে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। বাঘটা তখনও ডেকে চলেছে। তবে আগের মতো অত ঘন ঘন নয়। বেশ থেমে থেমে ডাকছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সে খুব শীঘ্রই গর্জন থামিয়ে দেবে।

সে আমার এতটা কাছে এসে গিয়েছিল যে, তার প্রতিটি হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে মাটি কেঁপে উঠছে সেটা আমি অনুভব করতে পারছি। যে রাস্তাটা ধরে এতক্ষণ এগুচ্ছিলাম সেই রাস্তাটা এখন ছেড়ে দিলাম। কেননা, শব্দকে অনুসরণ করে জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে যাওয়াই আমার আসল উদ্দেশ্য।

আমি জানতাম যে, ঝোপের মধ্য দিয়ে যেতে গেলেই বাঘটা আমার পায়ের শব্দ শুনতে পাবে। তখন হয় সে পালিয়ে যাবে নয়তো ওৎ পেতে থাকবে শিকারের অপেক্ষায়। সুযোগ বুঝে পাশ থেকে অথবা পেছন থেকে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

তাই মনে মনে ঠিক করলাম, যদি পায়ে চলার কোন রাস্তা পেয়ে যাই তাহলে সেই পথ ধরেই নিঃশব্দে এগিয়ে যাবো। বাঘটা আমাকে দেখার আগেই যদি আমি বাঘটাকে দেখতে পাই তাহলেই কৃতকার্য হবো এই অভিযানে। কিন্তু তা সম্ভবতঃ হবার নয়।

শেষ পর্যন্ত আমি একটা পায়ে হাঁটার রাস্তা খুঁজে পেয়ে গেলাম। মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানালাম। অবশ্য এটাকে ঠিক পায়ে হাঁটার রাস্তা বলা চলে না, বন্য জন্তুদেব চলাচলের একটা সরু রাস্তা এটি। জলের ধার পর্যন্ত রাস্তাটা চলে গিয়েছে। এটাই আমাকে রক্ষা পাওয়ার নিশানা দিল। কেননা, এই রাস্তাটা যেদিক থেকে বাঘেব গর্জনটা আসছে মোটামুটি সেই দিকেই চলে গিয়েছে। বাঘের গর্জন এখনও শোনা যাচ্ছে, তবে অনেক সময়ের বিরতিতে।

পায়ে পায়ে রাস্তাটা ধরে এগুতে লাগলাম। মাটির দিকে সতর্ক নজর। কেননা, যদি কোন কিছুতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই তাহলেই বাঘটা আমার উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে। বাঘের গর্জন এখন বন্ধ। অনুমান করে নিলাম যে, সে আমার দু'শ গজের মধ্যে এসে পড়েছে। দাঁড়িয়ে পড়লাম চুপচাপ। চারদিকে বিরাজ করছে গভীর নিস্তব্ধতা। আমি তখন যত সাবধানেই পা ফেলার চেষ্টা করি না কেন, বাঘটা ঠিক শব্দ শুনতে পাবে। আর সেটা হলে আমি বাঘটার সঠিক অবস্থান কোথায় তা কিছুতেই ঠিক করতে পারবো না। হঠাৎই এই সময় আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। রাস্তার ধারে একটা বাবলা গাছ রয়েছে, যদিও সেই গাছের গুড়িটা আমাকে আড়াল করার মতো তেমন মোটা নয়, তবুও সেটার আড়ালে লুকোবো ঠিক করলাম। আর সেই অবস্থায় আমি যদি নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকি তবে বাঘটার পক্ষে সহজে আমাকে দেখা সম্ভব হবে না।

এত সব ভাবনার পর ছুটে গিয়ে বাবলা গাছটার আড়ালে দাঁড়ালাম এবং বুক ভরে শ্বাস নিলাম। এবার ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে খুব অল্প সময়ের বিরতিতে দুবার বাঘের ডাক ডেকে উঠলাম। তারপর চুপ করে ফলাফলের অপেক্ষা। সত্যিই আশান্বিত ফল পাওয়া গেলো। বাঘটা আমার সামনে এসে হাজির হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা গেল তার এত কাছে একজন অনধিকারীর প্রবেশ ঘটায় এবং দু'দুবার ডেকে ওঠার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় রীতিমতো বিরক্ত হযেছে সে। যদিও আমার ডাক দু'টি খুবই দুর্বল ছিল তবুও বাঘটা ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছে। সে হাঁকপাঁক করতে করতে রাস্তা ধরে ছুটে গেলো কিছুদূর। আমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে। রাস্তাটা বাবলা গাছটা পেরিয়ে বেশ কিছুটা সোজা চলে গিয়েছে। বাঘটা তার সমগোত্রীয় জীবটিকে দেখবার জন্য এতই আগ্রহী হয়ে পড়েছে যে, সে আমাকে না দেখে বড় বড় থাবা ফেলে রাস্তা দিয়ে সোজা এগিয়ে চলেছে। আমি বাঘটার প্রতিক্রিয়া কি হয় তা জানার জন্য একটু কেশে উঠলাম।

হঠাৎ এই নতুন ধরনেব শব্দটা কানে যেতেই বাঘটা ঘুরে দাঁড়ালো। এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো যে, এটা মানুষের গলার আওযাজ। এবারে তার প্রতিক্রিয়া থেকেই বোঝা যাবে যে বাঘটা মানুষখেকো কিনা।

বাঘটা পলকহীন চোখে বাবলা গাছটার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমিও একদম নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাঘটার কোন ঘ্রানশক্তি না থাকায় আমি ঠিক কোথায সেটা বুঝতে পারলো না। তবে বাবলা গাছটাব পেছনে যে একটা কিছু লুকিয়ে রয়েছে সেটা সে বুঝতে পেরেছে। আমি এও নিশ্চিত যে, বাঘটা আমার শরীরের কোন অংশ দেখতেও পাচ্ছে। প্রথমে সে কিছুটা ইতস্তত: করলো। কিন্তু তারপরই বাঁদিকে তিনচার পা সরে এলো। উদ্দেশ্য আমাকে ভালো করে দেখা।

মুহূর্তের মধ্যে উভয়ে উভয়কে চিনতে পারলাম। সে বুঝতে পারলো আমি কোন্ ধরনের জীব এবং আমি ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে। আমিও বাঘটাকে দেখে বুঝলাম যে, এটা সেই মানুষখেকো শয়তানটা নয়। কেননা এই বাঘটা বেশ ভালো ভাবেই হাঁটছে। এর কোন পা-ই খোঁড়া নয়। আমরা উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আর তিনচার মিনিটের মধ্যেই আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। মনে মনে ঠিক করলাম যদি বাঘটা আমাকে ছেড়ে দেয় তাহলে আমিও

নিরপরাধ বাঘটাকে গুলি করবো না। কিন্তু সে কি তা করবে? কেননা বাঘের আওয়াজ নকল করে নিজের গলায় ডেকে আমি তাকে রীতিমতো উত্তেজিত ও বিরক্ত করেছি। তার উপর আবার কেশেছি। আর বাঘ যদি একবার রেগে যায় তবে সে সহজে নিজেকে সামলাতে পারে না।

বাঘটাকে এবার দেখলাম সামনের পা দু'টি ভাজ করে নীচু হয়েছে। বুঝলাম, সে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরী। আমিও রাইফেলের লক্ষ্য ঠিক করে ট্রিগার টিপতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই এমন ঘটনা ঘটলো যার কোন কারণই খুঁজে পেলাম না। বাঘটার মতিগতিও ঠিক বুঝতে পারলাম না। শুধু দেখলাম, বাঘটা এক লাফে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

এই ধরণের ঘটনার আকস্মিকতায় আমি অবাক হলাম। ধীরে ধীরে আমার স্নায়বিক উত্তেজনা কমে এলো। সেই সরু পথ ধরে ফিরে এলাম বড় রাস্তায়। সেখান থেকে সোজা গ্রামে। বায়ান্না ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা আমার অপেক্ষায় সময় গুনছিল। আমাকে দেখে তাঁদের দুশ্চিন্তা যেন দূর হলো। আমি সবিস্তারে ঘটনাটা বললাম। গ্রামবাসীরা বললো যে, আমার জীবনের আশা তাঁরা একরকম ছেড়েই দিয়েছিল।

বাঘটা অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে যাওয়ায় আমি হতাশ হয়েছি একথা বললে বিষয়টিকে হাল্কা করা হয়। বরং বাঘটাকে গুলিবদ্ধ করে যে কোন শোচনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করিনি সেটা ভেবেই রীতিমতো আনন্দ হচ্ছে।

পরবর্তী তিনদিন আমরা হ্রদটার মাইল খানেকের মধ্যে চারটে টোপ রাখলাম। সরু সরু নর্দমা এবং হাঁটা পথগুলো যেখানে যেখানে পরস্পরকে ছুঁয়ে গেছে তারই বাছা বাছা জায়গায় টোপগুলো বেঁধে রাখা হলো। আর প্রতিটি টোপের ওপর তৈরী করা হলো নিখুঁত মাচান।

এই কাজ করতে গিয়ে আমি এমন একজন লোকের দেখা পেলাম যার মতো সাহসী মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। লোকটা যে কী পরিমাণ সাহসী তার পরিচয় পেয়েছিলাম কতকগুলো ঘটনার মধ্য দিয়ে। জাতে সে চেনচু। এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা ঐ নামেই পরিচিত। চেনচু উপজাতির অন্যান্যদের মতো সেও সবসময় তীরধনুক নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। দেহের লজ্জা নিবারণের জন্য একটা ময়লা কাপড়ের টুকরোই তার কাছে যথেষ্ট। আর একটা জিনিস তার ছিল। আমার মতে সেটাই তার প্রধান সম্বল। আপ্পু, ওটাই ওর আসল নাম, সবসময় হাসিখুশি থাকে। তার মুখে

হাসিটা সংক্রামক ব্যাধির মতো লেগেই রয়েছে। তাছাড়া সুন্দর রসজ্ঞানেরও অধিকারী সে। সর্বোপরি সে সবসময়েই খুশীতে ভরপুর।

আমি কোথায় টোপ বাঁধবো, মাচান করবো সে কাজে সহায়তা করতে আপ্পু নিজে থেকেই এগিয়ে এসেছিল। আমিও তার প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিয়ে তার সহায়তা গ্রহণ করেছিলাম। তার সুন্দর হাসিই আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কি সুন্দরই না সে মাচানগুলো তৈরী করেছিল। মাচানগুলোকে বুদ্ধি করে সে এমনভাবে আড়াল করে দিয়েছিল যে, সেগুলোর নির্দিষ্ট অবস্থান জানা সত্ত্বেও আমার পক্ষে নীচু থেকে সেগুলো ধরা কঠিন হল। প্রকৃতপক্ষে আপ্পু মাচান বাঁধার ক্রিয়াকৌশল সম্পর্কে আমার জ্ঞানকে বাড়িয়ে দিল। বাস্তবিকই সে এটাকে মনে প্রাণে শিল্প হিসেবেই গ্রহণ করেছিল।

প্রথম রাতে কিছু ঘটলো না, দ্বিতীয় রাতেও নয়। আমার সঙ্গে বাঘটার যেখানে দেখা হয়েছিল সেখানে টোপ হিসেব বাঁধা হয়েছে একটা মোষ। তৃতীয় দিনে সেই মোষটা মারা পড়লো। মোষটার অর্ধেক মাংসই বাঘটা খেয়ে ফেলেছে। তাই চতুর্থ রাতে আমি মরা মোষটার ওপরে মাচানটায় বাঘটার ফিরে আসার অপেক্ষায় বসলাম।

মনে প্রশ্ন জাগলো, মোষটার হত্যাকারী কোন্ বাঘটা ? সেই মানুষখেকো বাঘটা না গর্জনকারী বাঘটা, যেটার সঙ্গে কয়েকদিন আগেই আমার মোলাকাত হয়েছে ? মোষটাকে যে বাঘটাই খেয়ে থাকুক না কেন তার পায়ের কোন চিহ্নই সামনের মাটিতে খুঁজে পাইনি। মাটিটা শক্ত ছিল বলে কোন দাগই পড়েনি। অগত্যা বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। প্রায় অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে যাবার আগেই বাঘটার দেখা পেলাম। অথচ বাঘেরা সাধারণতঃ সন্ধ্যার আগে বেরোয় না। একমাত্র চিতাবাঘ সূর্য অস্ত গেলেই শিকারের কাছে আসে। এক্ষেত্রে বাঘটা আপ্পুর তৈরী মাচানটার দিকে একবার তাকালও না। সোজা হেঁটে উপস্থিত হলো মরা মোষটার কাছে এবং একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

বাঘটা নিখুঁতভাবে হাঁটছিল। আমাকে যে খোঁড়া বাঘটা হত্যা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এটা সেটা নয়।

আমার মাথায় এলো যে এই সুন্দর মাচানটার ওপরে বসে একটা ছোট্ট পরীক্ষা করলে কেমন হয় ! আর তাই চিতাবাঘের কর্কশ স্বরে ডেকে উঠলাম। এর প্রতিক্রিয়া হলো দারুণ। বাঘটা রেগে আগুন হয়ে উঠলো। তারই

শিকার করা খাদ্যের কাছে এসেছে এমন দুঃসাহস যার সেই চিতাবাঘটা কোথায় ? সেটারই খোঁজে বাঘটা চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগলো।

আমি আবার ডেকে উঠলাম। বাঘটা এবার গজরাতে গজরাতে ধেয়ে এলো। আমি যে গাছটার ওপর লুকিয়ে ছিলাম সেটার ওপর সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমার নকল বাঘের ডাক শুনে সে মনে করেছে নিশ্চয়ই কোন ডোরাকাটা জানোয়ার গাছের উপর লুকিয়ে রযেছে। তাকে এই মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। সে পাগলের মতো কি যে করবে তা ঠিক করতে পারলো না। অথচ গাছটাতে ওঠা খুব একটা কঠিন ছিল না। আমিও মাটি থেকে মাত্র পনেরো ফুট ওপরে বসেছিলাম।

বাঘটা মাচানটার ঠিক তলায় গিয়ে দাঁড়ানোতে আমার দৃষ্টিতে সে আর ধরা পড়লো না। বাঘটা নীচু ডালটা ধরে ওপরে উঠতে লাগলো। তার থাবার আঁচড় পড়তে থাকলো গাছটার গায়ে। গাছটা তেমন বড় ছিল না। তাই সেটি দুলে উঠলো। বাঘটাও আরও প্রবল আক্রোশে গর্জন করতে লাগলো। বাঘের দেহের ভার ও জোরে জোরে আঁচড়ানোর ফলে গাছটা অস্বাভাবিকভাবে দুলতে লাগলো। মাচানটাও তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে দুলে উঠলো।

ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। আর এক মুহূর্ত বাদেই বাঘের থাবা এসে পৌঁছুবে মাচানটার ওপর। এবং আমি যে মাচানটার ওপর বসে আছি সেটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। আর সেটা হলে আমি ছিটকে পড়বো মাটিতে। বাঘটাও আমি যে চিতাবাঘ নয় সেটা বোঝার আগেই প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর।

তাই বাঘটার উপরে উঠে আসা দেখে আমার তখন রীতিমতো কঠিন অবস্থা। মাচানটার ওপর দাঁড়িয়ে হট্ হট্ করে বাঘটাকে তাড়াবার চেষ্টা করলাম। এবং রাইফেলের নলটা নীচের দিকে বাগিয়ে ধরে বাঘটার মাথা বা থাবা মাচানের পাশ দিয়ে উপরে উঠে আসার অপেক্ষায় রইলাম। বেচারী বাঘটা এই প্রথম বোকা বনলো। সে মানুষের গলার স্বর চিনতে পারলো এবং আমাকে দেখে রীতিমতো অবাক হলো এই ভেবে যে এ কোনরকমের প্যান্থার যে নিজেকে মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে! বাঘটার যে তেমন সাহস নেই সেটা আমি তাকে যখন বাবলা গাছের আড়াল থেকে প্রথম দেখেছিলাম তখনই বুঝেছিলাম।

বাঘটার গজরানি থেমে গেল। সে তার ভারী দেহটা নিয়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়তেই গাছটা অস্বাভাবিকভাবে দুলে উঠলো। আর মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা না করেই বাঘটা ঝোপের দিকে দিল ছুট। বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমার কানে ভেসে এলো বাঘটার ঝোপঝাড় ভেঙে দ্রুত পালিয়ে যাবার শব্দ।

এই ঘটনার পর বসে থাকার কোন অর্থই হয় না। তাই গ্রামে ফিরে গেলাম। আপ্পু, বায়ান্না এবং অন্যান্য সকলকে আজকের মজার ঘটনাটা খুলে বললাম। ঘটনাটা আমাদের আনন্দের খোরাক জোটালো। আর আপ্পু কেবল উরু চাপড়াতে চাপড়াতে একনাগাড়ে হেসেই চললো।

এক সময় হাসি থামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললো, "বাঘটা কালকেই ওর সমগোত্রিয় বাঘের গলার আওয়াজ শুনেছিল, কিন্তু সেটা পরমুহূর্তেই মানুষে রূপ নিতে দেখেছিল। এদিকে আবার আজও বাঘটা একটা চিতাবাঘের ডাক শুনলো এবং সেটাকেও মানুষে পরিণত হতে দেখলো। সুতরাং বাঘটা নিশ্চয়ই ভাবছে যে, সে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে।'

গতকাল যে মোষের বাচ্চাটা মারা পড়েছিল সেখানে টোপ হিসাবে আর একটা মোষের বাচ্চা বেঁধে রাখলাম। কিন্তু সেইরাতে সেই টোপটাও মারা পড়লো। অথচ আমরা টোপের জায়গাও পরিবর্তন করিনি, এমনকি গতকাল যে মাচানটা থেকে বাঘটাকে ক্ষেপিয়ে ছিলাম সেটিও সরিয়ে নিইনি। এই মাচানটা ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে সুবিধেজনক। বিশেষ করে আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য যখন খোঁড়া বাঘটাকে হত্যা করা। এইখান থেকেই আমরা গর্জনকারী বাঘটাকে (এই নামে আমি তাকে চিহ্নিত করেছি) ক্ষেপিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি। তাই এই মাচানটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, ঐ গর্জনকারী বাঘটা আর এখানে আসবে না। আপ্পু ও অন্যান্য সঙ্গীরা সমস্ত টোপগুলো ঠিক আছে কিনা তা দেখার জন্য লাঠি, কুড়াল, বর্শা নিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু তারা সকাল ন'টায় ফিরে যখন জানালো যে সেই জায়গাতেই আমাদের দ্বিতীয় টোপটাও মারা পড়েছে তখন আমার উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমি রীতিমতো আশান্বিত হয়ে উঠলাম এই ভেবে যে, শেষপর্যন্ত মানুষখেকোটার সঙ্গে আমার মোলাকাত হবে। সে-ই যে আমাদের দ্বিতীয় হত্যাকারী সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সে আমার ফাঁদে পা দিয়েছে নিজে থেকেই তাই আমি রীতিমতো খুশী হলাম।

আমার উৎসাহ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, বিকেল না হতেই আমি সেই

মাচানে গিয়ে উঠে বসলাম। কিছুক্ষণ পরেই নজরে পড়লো একটা বেজী। সম্ভবতঃ তার খুব খিদে পেয়েছিল তাই সে মরা মোষের বাচ্চাটাকে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। মাংস খেয়ে সে এমনই ফুলে উঠেছিল যে আর নড়তে পারছিল না। বহুকষ্টে এলোমেলো পা ফেলে সে ঢুকে পড়লো জঙ্গলের মধ্যে।

ভারতের এই অঞ্চলে 'গার্জার' নামে এক ধরনের তিতির জাতীয় পাখী আছে। কয়েকমিনিট পরেই সেই গার্জার পাখীর একটি দল এসে খোলা জায়গাটাতে উদয় হলো। এমন ভাবে এসে তারা বসলো যে, বেজীটার চলে যাওয়ার অপেক্ষাতেই যেন তারা দূরে দাঁড়িয়েছিল। তারা কিন্তু মৃত মোষটাকে স্পর্শও করলো না। তবে মরা মোষটার পচা গন্ধ পেয়ে যেসব গুবরে পোকা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ সেখানে এসে হাজির হয়েছিল পাখীগুলো ঠুকরে ঠুকরে সেগুলোকে খেতে লাগলো। বড় বড় নীল মাছির দল এসে ভিড় জমালো মৃতদেহের ওপর। এরা সেখানে ডিম পাড়ছে এবং মূহূর্তের মধ্যেই সেই ডিমগুলো ফেটে বেরুবে সাদা সাদা বাচ্চা। সেগুলোই মাংস খাবে মনের সুখে। আর শিকারী পাখির দল ও পোকাতে মিলে আবার খাবে সেগুলোকে। চব্বিশ ঘণ্টাও লাগবে না। কেবল পোকাগুলিই মোষটার মাংস খেয়ে সেটিকে চামড়াতে পরিণত করে দেবে। আর যারা এইসব পচা মাংস খেতে অভ্যস্ত সেই লম্বা ঠোঁটওয়ালা শকুন, যারা ইতিমধ্যেই সেখানে এসে ভিড় করেছিল এবং শিয়াল, হায়না ইত্যাদি যে সব প্রাণীরা রাতের অন্ধকারে বাকী মাংসের লোভে এসে জুটবে তাদের কথা তো আমি আমার তালিকাতে রাখিই নি।

অবশ্য মৃতদেহটার আসল মালিক রাত আটটার মধ্যেই এখানে এসে যাবে। আর সেটি সম্ভবতঃ খোঁড়া বাঘটাই হবে।

হঠাৎ একটা বুনো মোরগের কর্কশ অথচ গগনভেদী আওয়াজে আমার ভাবনায় ছেদ পড়লো। বুঝলাম সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। আমার ধারণা হলো এই মানুষখেকো বাঘটা গজনকারী বাঘটার মতো ভদ্র হবে এবং সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার চারিদিক ছেয়ে যাবার আগেই এসে হাজির হবে।

আমার পেছনের দিকে নীচুতে একটা হ্রদ। তারই কাছ থেকে ময়ূরের ছুটো পরিবার 'মি-আও' ডাকে পরস্পরকে অভ্যর্থনা জানালো। ঠিক সেই মুহূর্তে দূর থেকে 'গোলামোথি' নামে পরিচিত পাখীদের একটা স্ত্রী পাখী গোল-আ-মোথি! গোল-আ-মোথি! শব্দে মিলনের জন্য আহ্বান জানালো

তার সঙ্গীকে। সাধারণতঃ এই শব্দ যতদূর পর্যন্ত শোনা যায় সেই দূরত্বের মধ্যে যতগুলো এই জাতের পুরুষ পাখী থাকবে তারা এই ডাকে এসে ভীড় করবে সেখানে। আর সূর্য ডোবার আগেই স্ত্রী পাখীটা তার মনের মতো সঙ্গী বাছাই করে নেবে তাদের মধ্যে থেকে একজনকে।

সমস্ত আকাশটা অন্ধকারে ছেয়ে গেল। এই গোধূলী লগ্নে এমন একটা অস্পষ্টতা দেখা দেয় যে দৃষ্টি গুলিয়ে যায়। ফলে যে সব ঝোপঝাড় থেকে ভয়ের কোন আশঙ্কা নেই, সেখানেও মনে হয় হঠাৎ ওৎ পেতে চুপ করে বসে রয়েছে কোন মারাত্মক প্রাণী। আর এরই পারণতিতে ভয় এসে গ্রাস করে মনকে।

আমার পেছনে কোন গাছ থেকে কতকগুলো পাখী ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গেলো। তাদের গলায় শোনা গেল ভয়ার্ত আওয়াজ। ঠিক এই সময়ই একদল লাল ঝুটিওয়ালা সবুজ টিয়া বিশ্রামের জন্য এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গার সন্ধানে উড়ে গেলো। কিন্তু টিয়াদের এই জায়গা পরিবর্তনের কারণ কি? সম্ভবতঃ কোন বন বেড়াল শিকারে বেরিয়েছে এবং টিয়াগুলো তাকে দেখেছে। কিন্তু পরক্ষণই আমার মনে হলো, টিয়াগুলো বাঘটাকেও তো দেখে থাকতে পারে?

এইভাবে সময় বয়ে যেতে লাগলো। ছোট ছোট বাদুড়গুলো একের পর এক অদৃশ্য শিকারের ওপর ছোঁ মারছিল। এবং সেগুলোকে ধরার আনন্দে কীচ্! কীচ্! শব্দে ডেকে উঠছিল। আমি জানতাম যে, এই শ্রেণীর প্রাণীদের গলার-স্বর এত নীচু যে মানুষের কানে তা ধরা পড়ে না। কিন্তু তারা এখন এত জোরে ডাকছিল যে সেই স্বর শুনে আনন্দ অনুভব করলাম।

একটা নাইটজার পাখী পত্‌পত্ শব্দ করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেলো এবং আমার পেছনে কোথাও গিয়ে বসলো। সে কুক! কুক! কু-উ-হু। স্বরে ডেকে উঠলো। আর খানিকক্ষনের মধ্যেই হয়তো এই জাতের সমস্ত পাখিরা মিলে একসঙ্গে ডেকে উঠবে।

কিন্তু পাখীরা হঠাৎ ডাক বন্ধ করে দিল। এবং উড়ে চলে গেল সেখান থেকে। দেখলাম, পাখীটা আমার ডানদিকে উড়ে গেলো। পরমুহূর্তেই মাচানের নীচে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ পেলাম। তারপর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। আমার বুঝতে বাকী রইলো না যে, বাঘটা এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু বাঘটাকে কিছুতেই দেখতে পারছিলাম না।

বাঘটা ঠিক আমার নীচেই দাঁড়িয়েছিল। বুঝলাম, কোন শত্রু লুকিয়ে আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য মরা মোষটার চারধার ভালো করে নজর করছে সে। তখুনি মনে চিন্তা হলো যে, বাঘটা উপরের দিকে তাকিয়ে মাচানটা দেখে ফেলবে না তো? দারুণ উত্তেজনায় সময় কাটতে লাগলো। একসময় আমি হাল্কা অথচ টানা একটা শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা কিসের তা আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না। বাঘটা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়েছে বুঝলাম।

আমি আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। কেননা, বাঘটা যে একদম ভয় পায়নি সেটা বোঝা গেলো নিশ্চিতে প্রাকৃতিক ক্রিয়া সমাপনের মধ্যে। সেইসঙ্গে এটাও বোঝা গেল যে সে কোনরকম সন্দেহও করেনি।

বাঘটা এবার মাচানটার তলা থেকে সরে এসে এমন জায়গায় দাঁড়ালো যে আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ঘন অন্ধকারেও আমার বুঝতে কষ্ট হলো না যে, বাঘটা অতিসাবধানে অথচ কাজ হাসিলের উদ্দেশ্য নিয়ে মরা মোষটার দিকে চলেছে। তার চলার মধ্যে কোনরকম অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখলাম না। বুঝলাম, এই বাঘটি খোঁড়া নয়। তার মানে এটা সেই মানুষ খেকোটা নয়।

আমি চাপা স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করলাম। বাঘটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। মনে হয় সে শব্দটা শুনতে পেরেছে। না, সে আবার হাঁটতে শুরু করেছে। এবং মরা মোষটার কাছে পৌঁছে সে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

ভালো করে নজর করে দেখলাম এটা সেই গর্জনকারী বাঘটা। মুহূর্তের জন্য তাকে হত্যা করতে মনে স্পৃহা জাগলো। কারণ, বাঘটা আমার কাছে একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই সে আমার দুটো মোষকে হত্যা করেছে। আরও টোপ নিয়ে হয়তো সে পালাবে। আর এক একটা টোপের দামও প্রচুর। তবে রাইফেল না বাগিয়ে ভাবতে লাগলাম যে, এই বাঘটাই মানুষখেকোটা নয়তো! লোকমুখে মানুষখেকো বাঘটার পা খোঁড়ার কথা শুনেছি, কিন্তু কোন প্রমাণ পেয়েছি কি? এও তো হতে পারে আমি লোকের মুখে যে সব গল্পগুলি শুনেছি সেগুলি তাদের মনগড়া। হয়তো এটাই আসলে মানুষখেকো, গুলি খেয়ে মরবার জন্য অপেক্ষা করছে!

হঠাৎ আমার তার আগের কাণ্ডকারখানাগুলোর কথা মনে পরে গেলো। সে তখন আমাকে দেখেছিল এবং আমি যে মানুষ সেও সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত

হয়েছিল। কিন্তু তার ব্যবহার মানুষখেকোর মতো তো নয়ই বরং তার চলাফেরা ছিল ভীত খরগোসের মতো। তবু এটাকে আমায় সরিয়ে দিতে হবে। কেননা, এটা সবকিছু বানচাল করে দিচ্ছে। তাই আর দেরী না করে তার তলপেটের নীচে মাটি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম। গুলি মাটিতে লেগে যে ধুলো ছড়ালো তাও দেখতে পেলাম। বাঘটা ভয় পেয়ে বেড়ালের মতো পিঠ বেঁকিয়ে এক লাফ দিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল।

রীতিমতো বিরক্তি নিয়ে মাচান থেকে নেমে এলাম। এখানে আবার সাপের উৎপাত খুব। তাই টর্চটা জ্বেলে নিলাম। ফিরে এলাম গ্রামে।

পরের দিন সেই একই জায়গায় আরেকটা টোপ বেঁধে রাখলাম। এবার আমি নিশ্চিত যে, আর গর্জনকারী বাঘটা এটা হত্যা করতে আসবে না। আর যদি সে আসেও তাহলে দয়ামায়া না দেখিয়ে সোজা তাকে গুলি করবো।

কিন্তু এবারের টোপটার বেলায় ঘটলো অন্য ঘটনা। বাঘটা টোপটার সেই জায়গায় এসে হাজির হয়েছিল ঠিকই কিন্তু মোষটাকে এবার হত্যা করলো না। উল্টে সে রাত দশটা থেকে সকাল পর্যন্ত গর্জন করে চললো। আমি তো বটেই গ্রামের লোকও সেই গর্জন শুনেছিল। সে টোপটিকে দেখেছিল এবং সে প্রচণ্ড ক্ষুধার্তও ছিল। কিন্তু তার মাথায় রয়েছে সেই বাঘটার কথা যে বাঘটা মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাছাড়া গতকাল তার পায়ের ফাঁক দিয়ে এসে মাটিতে সজোরে যে জিনিসটা বিঁধেছিল সেটার কথা মনে করেও বাঘটা টোপটাকে মারতে সাহস করছিল না। সে তার হতাশা ও অখুশী হওয়াটা ক্রমাগত গর্জন করে প্রকাশ করেছিল।

পরের দিন খবর পাওয়া গেলো কোন টোপই মারা পড়েনি। কিন্তু আপ্পু একটা নতুন খবর দিল। দূরে একটা টোপের কাছে সে খোঁড়া বাঘটার পায়ের ছাপ দেখেছে। বাঘটা নাকি টোপটাকে দাঁড়িয়ে দেখেছে, কিন্তু হত্যা করেনি। আপ্পুর ধারণা, মানুষখেকোটা মোষের মাংস পছন্দ করে না। তাই আমরা যতই অপেক্ষা করি না কেন তাতে কাজ হবে না। সে প্রস্তাব করলো মোষের বদলে গরু টোপ হিসেবে দিয়ে চেষ্টা করা হোক।

আপ্পু আমাকে জানালো তার মনের মধ্যে একটা পরিকল্পনা রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি সেই পরিকল্পনা? আপ্পু রীতিমতো খুশী হয়ে বললো, আমরা যতদিন পর্যন্ত মানুষখেকোটাকে মারতে না পারবো ততদিন পর্যন্ত প্রতিরাতে আমি আর সে বাঘটার সন্ধানে বেরুবো।

আমি তার প্রস্তাবে হেসে উঠলাম। বললাম, এ যে খড়ের গাদার মধ্যে ছুঁচ খোঁজার ব্যাপার। আপ্পু খড়ের সঙ্গে পরিচিত হলেও ছুঁচ কি সে জানে না। তখন আমি তার বোঝার জন্য পিনের সঙ্গে তুলনা করলাম। কিন্তু এতেও সে কিছু বুঝলো না। আমি তখন একটা ছোট্ট শুকনো ডাল নিয়ে সেটা দেখিয়ে বললাম, এটা যদি একটা খড়ের গাদার মধ্যে ফেলে দিয়ে খোঁজা হয় তাহলে কত সময় লাগবে? বিরাট এই বনে বাঘ খোঁজাটাও হবে তেমনি ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত আপ্পু আমার কথাটা বুঝতে পেরে আরও জোরে হেসে উঠলো।

আমাদের এই কথাবার্তা বলতে গিয়ে প্রাতঃরাশ খেতে দেরী হয়ে গেলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাবার খেয়ে রওনা হলাম বনের দিকে। আপ্পুর নেতৃত্বে এগিয়ে চললাম। হ্রদটা অতিক্রম করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটা নীচু পাহাড়ের কোল ঘেষে হেঁটে গিয়ে পড়লাম অন্যদিকের উপত্যকায়। এই উপত্যকাটার মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে একটা ছোট্ট নদী। তবে সেটা এখন শুকনো। বনের একদিকের সীমারেখা যেখানে এই নদীটাকে অতিক্রম করে গেছে সেখানে একটা টোপ বাঁধা হয়েছিল।

আমরা এইমাত্র যে রাস্তাটা ধরে এলাম সেটা হ্রদটা থেকে সোজা নদী অতিক্রম করে তিন-চার মাইল দূরে একটা চেনচু পল্লীর দিকে চলে গিয়েছে। চেনচুরা গ্রামে বাস করে না। গাছের সরু ডাল আর ঘাস দিয়ে তৈরী ছোট্ট গোলাকার কুঁড়ে ঘরে এরা বাস করে। জঙ্গলের চারধারে এদের এই ধরনের ঘরগুলো ইতস্ততঃ দেখতে পাওয়া যায়। দশজনের একটা গোটা পরিবারও এই ছোট্ট কুঁড়েতে বাস করে থাকে। একটি কুঁড়ের পাশে আর একটি দেখতেও পারো আবার নাও পারো। হয়তো আর একটি কুঁড়ে দেখতে হলে যেতে হবে আরও কয়েক মাইল।

আমরা ভেবেচিন্তে এমন জায়গায় টোপ বেঁধেছিলাম যেখানটায় বাঘটা উপর থেকে কিংবা নীচে থেকে অথবা জঙ্গলের যে কোন দিক থেকে কিংবা রাস্তার যে কোন দিক থেকে অর্থাৎ ছ'টা দিকের যে কোন দিক থেকে আসুক না কেন আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখতে পাবো। রাস্তার ধূলোতে আমি এখুনি একটা বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। বাঘটা এসেছিল আমরা যে দিক থেকে এসেছি তার বিপরীত দিক থেকে।

আমি পায়ের ছাপগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম! দেখলাম

তিনটে পায়ের ছাপ রয়েছে, আর একটা পায়ের ছাপ নেই। অথচ সাধারণ ভাবে বাঘের চারটে পায়ের ছাপ পরে। অবশ্য অনেক সময় বাঘ যদি সতর্কভাবে হাঁটে এবং সামনের পায়ের ছাপের ওপর পেছনের পা পড়ে তাহলে দু'টো দাগ পড়তে পারে। কিন্তু তিনটে দাগ কখনোই হয় না। তাই আমি একরকম নিশ্চিত হলাম যে, এই প্রাণীটা তিন টি পা ব্যবহার করেছে এবং তার চতুর্থ পা'টিতে নিশ্চয়ই কোন গণ্ডগোল রয়েছে। গর্জনকারী বাঘটার মতো চারপায়ে চলা তার পক্ষে তাই সম্ভব হচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত আমি তাহলে মানুষখেকোটার পায়ের ছাপ দেখলাম। পায়ের ছাপগুলোর মধ্যে দূরত্ব কোথাও বেশী, কোথাও কম। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বাঘটা ভীষণভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। এক জায়গায় দেখলাম লম্বা দাগ, বুঝলাম বাঘটা তার সামনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে চলার চেষ্টা করেও পারেনি, ফলে পেছনের সেই আহত পাটা হেঁচড়ে হেঁচড়ে যেতে হয়েছে। অর্থাৎ এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, বাঘটার পায়ের আঘাতটা খুবই মারাত্মক ধরনের এবং সেটা এখনো পুরোপুরি সারেনি। আমার আরও ধারণা হলো যে, পায়ের আঘাতটা খুব বেশী দিনের নয়।

পায়ের ছাপ অনুসরণ করে প্রায় দু'শ গজ পেছনে গিয়ে আমরা এমন একটা জায়গায় পৌছুলাম যেখানে বাঘটা রাস্তা অতিক্রম করার কিংবা রাস্তা ধরে চলার বাসনায় বন থেকে বেরিয়েছিল। এখান থেকেই সে আমাদের টোপটাকে দেখতে পেয়েছিল এবং রাস্তা ধরে এগিয়ে এসেছিল। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, বাঘটা দশ ফুট দূরে টোপটাকে নীরিক্ষণ করার জন্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল এবং তারপর আবার হাঁটতে শুরু করে।

বাঘটার এই আচরণে আমি রীতিমতো অবাক হলাম। বাঘটা যেহেতু মারাত্মক রকমের আহত তাই তারপক্ষে সবসময়ে অভুক্ত না থাকলেও ক্ষুধার্ত থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বাঘটা টোপটাকে পেয়েও তা নিতে চায়নি কেন? এর একটাই কারণ হতে পারে সেটা হলো বাঘটা তেমন ক্ষুধার্ত ছিল না। মানুষই হোক আর জন্তুই হোক খাবার সামনে রেখে উপোস করে ক্ষুধার তাড়না অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয় কিছুতেই।

আমরা বাঘের পায়ের ছাপ দেখে দেখে এগুতে লাগলাম। রাস্তা ধরে পাঁচ-ছয় গজ চলার পরই বাঘটা বনে ঢুকেছে। উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবতঃ নদী পার হয়ে ওপাশের বনে যাওয়া। এখানে এসে আর পায়ের ছাপ দেখতে

পেলাম না। বুঝলাম, বাঘটা আমাদের টোপটাকে দেখার আগে যেদিকে যাবে ভেবেছিল পরে সে দিকেই গিয়েছে।

আপ্পু আর আমি ঠিক করলাম বাঘটাকে খুঁজে বের করবোই। বাঘটা যেদিকে যেতে পারে সেটা অনুমান করে অগ্রসর হলাম। শুকনো মাটিতে আমাদের পায়ের ছাপ পড়ছিল না। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পশুদের যাতায়াতের সরু রাস্তায় এসে পড়লাম। মাটি শক্ত থাকায় এখানেও বাঘের পায়ের ছাপের কোন হদিস পাইনি।

তবে দেখলাম মাটিতে সম্বর ও চিতল হরিণের পায়ের নখের নানা আঁচড়। আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা ভালুক খাবার জন্য শিকারের সন্ধানে মাটি খোঁড়ার উদ্দেশ্যে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা পাথরের চাঁইগুলো সরাচ্ছে।

এই রাস্তাটা দিয়ে সবসময় যে বন্যজন্তুরা যাতায়াত করে তা স্পষ্ট বোঝা গেল। আরও কিছুটা হেঁটে যাওয়ার পর বন্য শূয়রের পায়ের দাগ দেখতে পেলাম। আপ্পু বললো, খোঁড়া বাঘটা সম্ভবতঃ এই রাস্তার দিকেই এসেছে। হয়তো বা আগেই সে রাস্তাটা ধরে চলে গেছে। বাঘের কোন পায়ের ছাপ না দেখতে পাওয়ায় আমি আপ্পুর কথাই মেনে নিলাম।

আর কিছুটা এগিয়ে যেতেই বুঝলাম আপ্পুর কথাই ঠিক। একটা নালা রাস্তাটিকে সমকোণে স্পর্শ করেছে। সেই নালার আলগা মাটিতে বাঘের পায়ের ছাপ দেখলাম। বাঘটা যে নালাটা ধরে ওপারে চলে গিয়েছে সেটা বোঝা গেল। আমরা রীতিমতো কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। ঠিক করলাম, বাঘটার গন্তব্যস্থল কোথায় সেটা খুঁজে বের করবো।

আমরা পশুদের চলাচলের ছোট্ট সরু রাস্তাটা ধরে মাইলখানেক হেঁটে একটা ছোট্ট পাহাড়ের চূড়ায় এসে পৌছুলাম। এখান থেকে পাহাড়টার বিপরীত দিকের নীচের অংশটা দেখা যায়। দেখলাম একটা সরু পায়ে চলার রাস্তা চলে গিয়েছে পরিষ্কার জায়গাটা দিয়ে। বুঝলাম, এটাই চেনচু পল্লীতে যাওয়ার সেই এবড়ো খেবড়ো রাস্তাটা। আমরা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যে রাস্তাটা গিয়েছে সেটা ধরে এগিয়ে চলেছি। কেননা, বাঘটা চেনচু পল্লীর দিকেই গিয়েছে।

আরও আট মাইল এগিয়ে যাওয়ার পর দেখলাম রাস্তাটা চেনচুদের গরুরগাড়ী চলাচলের একটা রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। বাঘটা এখানে এসে এই

নতুন রাস্তাটা ধরেই গিয়েছে। আমরা রাস্তার ধুলোর মধ্যে তার পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছি। সেই পায়ের ছাপ দেখে আরও আধমাইল যাওয়ার পর কিছু লোকের গলার আওয়াজ পেলাম। দেখলাম, একদল চেনচু নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে। তারা আমাদের দেখে এগিয়ে এলো। আমরা অবশ্য আগেই শুনতে পেয়েছি তারা কি বলাবলি করছে এবং তাদের উত্তেজনার কারণটা কি সেটা টের পেয়েছি। আগের দিন সন্ধ্যাতেই তাদের একজনকে বাঘটা ধরে নিয়ে গিয়েছে।

তাদের কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে সব শুনলাম। মানুষখেকোটার আগমনবার্তা তারা আগেই পেযেছিল। তাই সবসময় অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই তারা বেরোয়। কাল্লা নামে তাদের মধ্যে একজন ছিল। সে খুব ভালো শিকারী। সবসময় শিকার করেই বেড়াতো। প্রচণ্ড সাহসী ছিল। কোন মানুষ-খেকোকেই সে ভয় করতো না। উল্টে বাঘই নাকি তাকে ভয় করতো। সে সেদিন সকালে তীরধনুক, বর্শা নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিল। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত ঘুরেও কোন শিকার পেলো না। ফিরে এসে বৌকে জানাল যে, সে গ্রামের কাছাকাছিই একটা গাছের কোটরের মধ্যে বড় একটা মৌচাক দেখেছে।

তীরধনুক বর্শা অতিরিক্ত মনে করে সে ঘর থেকে একটা কুড়ুল, একবাক্স দেশলাই, কিছু খড় আর মধু আনার জন্য একটা খালি টিনের বাক্স নিয়ে রওনা হলো। কিছুক্ষণ পরে কাল্লার কুড়ুলের শব্দ শুনতে পেল চেনচুরা। এবং তারা সেই চাকটা না দেখার জন্য আপসোষ করতে লাগলো।

কিন্তু পরমুহূর্তেই তারা কাল্লার গলার আওয়াজ শুনতে পেলো। সে চিৎকার করে উঠলো : বাঘ ! বাঘ ! বাঁচাও ! বাঁচাও ! পরক্ষণেই সব চুপ।

কেউ তাকে সাহায্য করার জন্য কিন্তু এগিয়ে গেলো না। বরং সবাই তার ফিরে আসার অপেক্ষায় রইলো। শেষ পর্যন্ত কাল্লা ফিরে না আসায় বয়স্করা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখলো সব জিনিসপত্র পড়ে রয়েছে কিন্তু কাল্লার কোন চিহ্ন নেই। সেইসঙ্গে তারা দেখলো, গাছের গুড়িতে একটা থাবার দাগ, সেখান থেকে কস্ গড়াচ্ছে। বোঝা গেল, বাঘটা তার অক্ষমতার জন্য দেহের ভর রাখার উদ্দেশ্যে গাছটার ওপর বাদিকের থাবাটা দিয়ে জোরালোভাবে আঁচড় কেটেছে। এবং তারপরই আক্রমণ করেছে কাল্লাকে। বাঘটা পঙ্গু থাকায় হেঁচড়ে হেঁচড়ে এসেছে, তাই সে কাল্লার

চোখে ধরা পড়ে যায়। আর তখনই কাল্লা চিৎকার করার সুযোগ পেয়েছিল। বাঘটা যদি কোন সুস্থ বাঘ হতো তাহলে কাল্লা চেঁচানোর সুযোগ পেত না। এবং বাঘটার আসার কোন শব্দও শুনতে পেতো না। আর কাল্লা যে গাছটায় মধু সংগ্রহ করতে উঠেছিল সেটা ছিল ছোট, যদি বড় হতো তাহলে মানুষ-খেকোটা কাল্লাকে নাগালের মধ্যে পেতো না।

বেশ খানিকটা খোঁজাখুঁজির পর চেনচুরা জঙ্গলের মধ্যে রক্ত দেখতে পেল। এবং কাল্লার পরনের কাপড়ের টুকরো দেখতে পেলো। এরপর আর একটু এগিয়ে গিয়েই তারা থেমে গেল। তারা জানতো কাল্লা আর বেঁচে নেই। তাই আর যাওয়ার দরকারই বা কি? তখুনি তাদের মনে পড়লো যে, তারা লোকমুখে শুনেছে দু'জন সাহেব নাকি পেড্ডাচেরুভু গ্রামে মানুষ-খেকো শয়তানটাকে মারার জন্য এসেছে। তারা তখুনি সেখানে যাবে বলে স্থির করেছিল। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় আর যাওয়া হয়নি তাদের।

তাই পরদিন কয়েকজন চেনচু আমাকে আর বায়ান্নাকে খবরটা দেবার জন্য রওনা হচ্ছিল। কিন্তু পথের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে যায়। আমি এবং আপ্পু দু'জনেই এখন বুঝতে পারছি যে, বাঘটা আমাদের টোপটাকে দেখে কোনদিকে গিয়েছিল এবং কেনই বা সে মোষটাকে হত্যা করেনি।

আসলে আগের দিন বাঘটা কাল্লাকে হত্যা করে এবং রাতে মানুষের মাংস খেয়ে সে পেট ভরিয়ে জলের জন্য ইতঃস্তত ঘুরে বেড়ায়। আমরা নিশ্চিত হলাম যে, খিদে না থাকায় বাঘটা মোষটাকে মারেনি এবং তার মাংস খাবার চেষ্টা করেনি। অবশ্য এও হতে পারে যে, মানুষের মাংস তার কাছে অনেক বেশী সুস্বাদু মনে হয়েছে। আর চেনচু যুবক কাল্লার মৃত দেহের অবশিষ্ট অংশের কথা মনে পরাতে সম্ভবতঃ সে মোষটাকে না মেরে ফিরে আসে পুরানো শিকারের কাছে।

আমরা আমাদের বক্তব্য চেনচুদের জানালাম। তারা আমাদের কথায় রাজী হয়ে গেলো। বাঘটার গন্তব্যস্থল খোঁজার ব্যাপারে তারাও আমাদের সঙ্গী হলো। আমরা জানতাম যে, এ ব্যাপারে আমরা যদি সফল হই তাহলে কাল্লার দেহের অবশিষ্ট অংশও খুঁজে বের করতে পারবো। কিন্তু চেনচুরা এটাকে তেমন গুরুত্ব দিতে রাজী হলো না। তাদের বক্তব্য আমি আগে যেন বাঘটাকে গুলি করে হত্যা করি। কেননা বাঘটা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন তাদের জন্যে একটা দুশ্চিন্তা থাকবে। এগারোজন চেনচুকে সঙ্গী

করে বাঘটা যেদিকে গেছে সেদিকে কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম যে আমরা বনের মধ্যে প্রবেশ করেছি। এবার আমরা একটা শুকিয়ে যাওয়া নালার কাছে এলাম। বুঝলাম, শয়তানটা নালাটার উজানে চলে গেছে। সকলের চোখেই ধরা পড়লো বাঘের পায়ের ছাপ। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা কাল্লার মৃতদেহটার গন্ধ পেলাম। এবং শুনতে পেলাম নীল মাছিদের ভনভন শব্দ। আরও কিছুটা এগিয়ে মৃতদেহটার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। কাল্লার মৃতদেহের সামান্য অংশই অবশিষ্ট আছে। কাল্লা নিজের শক্তির ওপর একটু বেশীরকম বিশ্বাসী ছিল এবং নিজের শক্তিকে সব সময় জাহির করতে চাইতো। এই ধরনের লোকেরা অসাবধানী হয়। ফলে তাদের এই পরিণতিই ঘটে।

আগেই বলেছি, কাল্লার মৃতদেহের অল্পই অবশিষ্ট ছিল। হাত আর পা—যেগুলো মানুষখেকোরা সাধারণতঃ খায় না এ বাঘটা সেগুলোও খেয়েছে। এমনকি হাঁটু আর গোঁড়ালির মধ্যেকার হাড় আর পাঁজরার কিছু কিছু হাড়ও চিবিয়ে একেবারে গুঁড়ো করে ফেলেছে। এখানে ওখানে মেরুদণ্ডের কিছু হাড় পড়ে রয়েছে, কিন্তু তাতে মাংসের কোন চিহ্ন নেই।

স্পষ্ট বোঝা গেলো, মানুষখেকোটা প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ছিল। তাই এমনভাবে মৃতদেহটাকে ভক্ষণ করেছে। আমার মনে আবার সেই চিন্তা এসে ভিড় করলো, কেন সে আমাদের টোপের মোষটাকে স্পর্শ করলো না। কাল্লার মৃতদেহের তুলনায় সেটার মাংসও অনেক বেশী হতো এবং ভোজনটাও খুব ভালো হতো।

কিছু দূরে চেনচুদের একজন একটা উরুর হাড় আবিষ্কার করলো। কিন্তু আরেকটি উরুর হাড়ের কোন হদিস নেই। সম্ভবতঃ শেয়াল কিংবা হায়না নিয়ে গিয়েছে।

কি করা যায় তাই নিয়ে আমরা চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলাম। দেখলাম আমাদের সঙ্গীরা কি করা উচিত তাই নিয়ে দু'ভাগ হয়ে গেছে। একদল বলছে, তারা একটা মাচান তৈরী করে দেবে আর সেটার ওপর আমি যেন বাঘটার জন্য আজ রাতে অপেক্ষা করি, কিন্তু অন্যদল বললো, এটা হবে অনর্থক সময় নষ্ট করা। তাদের মতে, মানুষখেকোটা আর এদিকে পা-ও দেবে না। কেননা সামান্যতম মাংসও এখানে পড়ে নেই। হ্যাঁ, হায়না নিশ্চয়ই আসবে, আসতে পারে শিয়ালও। কিন্তু বাঘ? নৈব নৈব চ। আর বাঘেরা পচা মাংস স্পর্শও করে না।

অবশ্য তখনই আমার মনে পড়ে গেলো যে, খোঁড়া বাঘটার ক্ষুধার্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আমার ধারণা সে এদিকে আসতে পারে। যদিও সম্ভাবনাটা খুবই ক্ষীণ, তবুও আমি এই সুযোগটা হাতছাড়া করতে রাজী হলাম না। ঠিক করলাম কাল্লার মৃতদেহের অবশিষ্ট অংশ যেখানে পড়ে রয়েছে সেখানেই একটা মাচান করে বাঘটার জন্য অপেক্ষা করবো। আমার এই সিদ্ধান্তের কথা সঙ্গীদের জানালাম। তাদের মধ্যে যারা এই ধরনের চিন্তাকে অনর্থক সময় ব্যয় বলে মনে করে তারাও আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিল। সকলে মিলে মাচান তৈরীর জন্য কাজ শুরু করলাম। এবং মুহূর্তের মধ্যে অভিজ্ঞ শিল্পী আপ্পুর প্রচেষ্টায় একটা সুন্দর মাচান তৈরী হয়ে গেল।

আপ্পু প্রায় পঁয়ত্রিশ গজ দূরে একটা ঘন ডালপাতায় ভরা গাছ ঠিক করলো। এর উপর মাটি থেকে প্রায় কুড়ি ফুট উপরে মাচানটা বাঁধল। সাধারণভাবে মাচান যে উচ্চতায় বাঁধা হয় এটি তারও অনেক উপরে। উদ্দেশ্য, ভালভাবে যাতে পর্যবেক্ষণ করা যায়। আমরা তারপর ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা হাড়গুলোকে একসঙ্গে করে সেখানে রাখলাম। এতে বাঘটির আকৃষ্ট হবার সম্ভাবনা জাগবে প্রবল।

এদিকে অন্যান্য চেনচুদের সঙ্গে কাজের জন্য আপ্পুকে রেখে আমি দ্রুত পেড্ডাচেরুভু অভিমুখে রওনা হলাম। প্রথমতঃ পেটে কিছু খাবার দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ রাতে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আনা দরকার। পেড্ডাচেরুভুতে ফিরে গিয়ে বায়ান্নাকে এই নতুন সংবাদ দিতেই সে খুব উৎফুল্ল হলো এবং আমার ভাগ্য যাতে সুপ্রসন্ন হয় সেজন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালো।

আমি যখন ফিরে এলাম তখন বেলা চারটে। দেখলাম, আপ্পু এবং আরও দু'জন চেনচু মাচানে অপেক্ষা করছে। শকুনের দৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য তারা মৃতদেহের তুচ্ছ অবশিষ্ট অংশগুলোকে পাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছে। চেনচুরা ফিরে যাবার আগে ডালপাতাগুলো সরিয়ে দিয়ে গেল। আপ্পুও ওদের সঙ্গে ফিরে গেল। সে আজ রাতটা ওদের সঙ্গেই থাকবে।

ওরা চলে যাবার পর আমি মানুষখেকো বাঘটার চিন্তায় মনোযোগ দিলাম। ভাবতে লাগলাম, বাঘটা কি সত্যিই প্রচারিত গল্প অনুযায়ী অন্য একটা বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আহত হয়েছে নাকি কোন শিকারীর গুলিতে আহত হয়ে পঙ্গু হয়েছে, যেটা অনেক সময়েই ঘটে থাকে। তবে ঘটনা যাই হোক না কেন, বাঘটা যে দুর্বল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মোষটাকে কাবু করতে পারবে এমন বিশ্বাস সম্ভবতঃ তার মনে নেই। এই কারণেই সে মোষের বাচ্চাটাকে হত্যা করায় সচেষ্ট হয়নি বলে আমার ধারণা। বাঘটার অবস্থা এতই কাহিল যে, সে তিনপায়ে বাগে আনতে পারে এমন ছোট ছোট প্রাণীর উপরই নির্ভরশীল। এবং তার ভাগ্য ভালো যে এই সময়ের মধ্যে সে কয়েকটি মানুষ পেয়ে গিয়েছে, যাদের শিকার করতে তার তেমন বেগ পেতে হয়নি।

এইসব কথা মনে হবার পরই আমার মনে নতুন আশার উদয় হলো। কেননা, যে বাঘের পক্ষে নিয়মিত খাবার যোগাড় করে পেট ভরানো সম্ভব হয় না তার ক্ষুধার্ত থাকা স্বাভাবিক। আর এই ধরনের ক্ষুধার্ত যে বাঘ সে গতরাতে পেটভরে খেলেও আজ আবার অবশিষ্ট মাংসের টুকরোগুলো খেতে আসবেই।

সন্ধ্যাটা কাটল নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে। এই অঞ্চলে সম্ভবতঃ পাখী আর বাঁদরের মতো প্রাণী খুব একটা নেই অথবা কোন অজ্ঞাতকারণে তারা অদ্ভুত-ভাবে চুপ করে রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা আমার দুর্ভাগ্য। কেননা, হরিণ আর এইসব ছোট ছোট প্রাণীরা যে সাবধানবাণী যোগায়, তার উপর নির্ভর করেই আমি সাধারণতঃ বাঘের চলাফেরা নির্ণয় করে থাকি। এই সময় দূর থেকে একবার দু'বার একটা তিতির ডেকে উঠলো। কিন্তু বনমুরগী কিংবা ময়ূরের কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না। এই অস্বাভাবিকতার কারণটা কি তা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম। হঠাৎই উত্তরটা পেয়ে গেলাম। সামনেই চেনচুদের বসতি। ওরা তীর ধনুক দিয়ে আশেপাশে জঙ্গল থেকে খাবার মতো সব পাখীদের শিকার করে ফেলেছে। অন্যেরা ভয়ে পালিয়েছে, আর এ মুখো হয় না।

অন্ধকার গাঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশাচর পাখীর দল ডাকতে আরম্ভ করলো। এই নিশাচর পাখীরা ভোজনের পক্ষে তেমন সুবিধাজনক নয়। আর শিকার করাও কঠিন। তাই এদের কপালে মৃত্যুবান জোটেনি। গোটা সন্ধ্যাটা যে নিদারুণ নির্জনতাকে সঙ্গী করে কাটাতে হয়েছে তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি রাতের পাখীদের কলরবকে অভিনন্দিত করলাম। একটা প্যাঁচা হঠাৎ কর্কশ স্বরে ডেকে উঠলো। তারই প্রত্যুত্তরে উপত্যকার গভীর থেকে আরেকটা প্যাঁচা ডেকে উঠলো। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেল। কিছুদূরে একজোড়া শেয়াল রাতের অভিযানে বেরুনোর আগে একবার ডেকে উঠলো।

সূর্যাস্তের পরই একধরনের ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুরু হয়েছিল। আমি এই ডাকের সঙ্গে পরিচিত। এর আগে অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও মহীশূরের জঙ্গলে আমি এই ডাক শুনেছি। ধীরে ধীরে তাদের জলসায় অন্যান্য পতঙ্গরা এসে যোগ দিল। শব্দটা ক্রমশঃ উঁচু পর্দায় উঠতে লাগলো। অন্য কোন শব্দ তাই আর শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ শব্দটা থেমে গেল। বোঝা গেল, দূরের ঝিঁ ঝিঁ গুলো ডাক বন্ধ করে দিয়েছে বলে আমার চারপাশের গুলোও ডাক বন্ধ করে দিয়েছে। মনে হলো যেন একটা ট্রাক্টর চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল।

নিস্তব্ধতা'র এমন একটা পরিবেশ তৈরী হলো যা এক অর্থে স্নায়ুর পক্ষে স্বস্তিকর, কিন্তু অন্য অর্থে এমন পরিবেশ অজ্ঞাত কোন অমঙ্গল ও ভয়ের ইঙ্গিত। ঠিক কি কারণে ঝিঁঝিঁ পোকাদের জলসা থেমে গেলো সেটা বুঝে উঠতে পারলাম না। রাতের কাকগুলো তখনও দূরে কান্নার সুরে ডেকে চলেছে। সঙ্গীরা প্রত্যুত্তর দিচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। ঠিক এমন সময়ই আমি মানুষ-খেকোটার গর্জন শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম নিস্তব্ধতার আসল কারণটা। বাঘটা উপত্যকার মাঝে দাঁড়িয়ে অবিরাম গর্জন করে চলেছে।

ঝিঁ ঝিঁ পোকার দল প্রথমেই বাঘটার ডাক শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু আমি তখন তাদের কোলাহলের জন্য সেই ডাক শুনতে পাইনি। ওদের জলসা থামতেই প্রথম আমার কানে এলো বাঘের গর্জন। কিন্তু ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলো মানুষখেকোটাকে ভয় করছে কেন? আমি নিজের মনে মনে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগলাম। যুতসই কোন উত্তর পেলাম না। ফলে একটা অস্বস্তি অনুভব করলাম। শেষপর্যন্ত ঠিক করলাম, মাদ্রাজে আমার যে প্রকৃতি-বিজ্ঞানী বন্ধুটি রয়েছে তাকেই জিজ্ঞেস করবো এই রহস্য সম্পর্কে।

বাঘটা তখনও গর্জন করে চলেছে। ক্রমশঃ তার গলায় আওয়াজ জোরালো হলো। বুঝলাম, বাঘটা এগিয়ে আসছে সামনের দিকে। কিন্তু কেন সে এমনভাবে গর্জন করে চলেছে? তার এই ডাকের মধ্যে রয়েছে একটা অস্বাভাবিকতা। কেননা, যখন কোন বাঘ তার শিকার করা খাদ্যের কাছে ফিরে আসে তখন সে আসে নিঃশব্দে। তখন তার প্রতিটি পদক্ষেপ হয় সতর্ক, দৃষ্টি থাকে সজাগ।

তাই বাঘটির এই ধরনের অস্বাভাবিক আচরণে অবাক না হয়ে পারলাম না। বসে রইলাম তার আগমনের প্রতীক্ষায়।

একসময় দেখলাম সে এসে হাজির হয়েছে মাচান থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। কিন্তু সেখানেই সে ঝোপের আড়ালে চলে গেলো। গর্জন তখনও বন্ধ হয়নি। বেশ কিছুক্ষণ সে আমার দৃষ্টির বাইরে ছিল। তারপরই দেখলাম কাল্লার মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ ও মাচানটার চারধারে বাঘটা ঘুরপাক খাচ্ছে। সেইসঙ্গে আরও বীভৎসভাবে গর্জন করছে।

আমার ধারণা হলো, বাঘটা সম্ভবতঃ আমার উপস্থিতি টের পেয়েছে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? বাঘটা যেখান থেকে ডাকতে শুরু করেছিল সেখান থেকে মাচানটা দেখা সম্ভব নয়। তাহলে সম্ভবতঃ বাঘটা আমার উপস্থিতি এবং মাচানটার অস্তিত্ব প্রথম থেকেই জানতো। আর তাই অবিরাম গর্জন করে আমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিল, যাতে আমি চলে যাই।

আমার উপস্থিতি মানুষখেকোটা শুধু একটা কারণে জানতে পারে। আমরা যখন মাচানটা তৈরী করছিলাম, বাঘটা সম্ভবতঃ তখন আশেপাশে লুকিয়ে থেকে আগাগোড়া সব দেখেছে। সে বুঝতে পেরেছিল তাই যে, কোন মানুষরূপী শত্রু তার অপেক্ষায় রয়েছে এবং তার কাছে যাওয়া মানে জীবনটা হাতের মুঠোয় করে যাওয়া। সমস্ত মানুষখেকোদের মতো এই বাঘটারও মানবজাতির প্রতি একটা ভয় রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে গত রাতে খাওয়া সত্ত্বেও সে আবার খাবার তাগিদে এখানে এসেছে। তার ধারণা ছিল যে, ক্রমাগত গর্জন করে শত্রুকে তাড়িয়ে দিতে পারবে। এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে, বাঘটা আপ্পু ও অন্যান্য চেনচুদের অনুসরণ করে ওদের বসতি পর্যন্ত গিয়েছিল এবং বাকী কটা হাড়ের লোভে আবার ফিরে এসেছে এখানে।

মানুষখেকোটা ঘুরপাক খেয়েই চলেছে। সেইসঙ্গে গর্জনও চলছে। আমি ধৈর্য ধরে বাঘটার কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম। এই অবস্থার অবসানে একটাই উত্তর হতে পারে। হয় আধঘণ্টার মধ্যে বাঘটা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে এগিয়ে আসবে না হয়তো আমিই ধৈর্য হারিয়ে বাঘটার সন্ধানে নিচে নাববো। অবশ্য তৃতীয়টাও হতে পারে যে, বাঘটা চলে যাবে এবং আমি তাকে হত্যা করার সুযোগটি হারাবো। তবে এটা যাতে না হয় সেজন্য আমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে।

সময় বয়ে চলেছে। আধঘণ্টা পেরিয়ে আরও দশ মিনিট হয়ে গেল। কিন্তু বাঘটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। বাঘটা হয় মাটিতে শুয়ে রয়েছে নয়তো ঝোপের আড়ালে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। আকাশে যথেষ্ট তারা রয়েছে।

সেই তারার আলোয় চারিদিকের অন্ধকার কিছুটা হাল্কা হলেও চারিদিকে কালো দেখছি আমি সব। ঝোপঝাড় সবই কালো ঠেকছে। বাঘটা কিন্তু তখনও গাছের ওপর যে মানুষটি লুকিয়ে রয়েছে তাকে তাড়ানোর জন্য প্রাণপণে ডেকে চলেছে।

যখন কোন কিছু করতে হয় তখন আমি খুব একটা সুস্থির থাকতে পারি না। তখন প্রতিমুহূর্তে কিছু একটা করার প্রবণতা আমার মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে। এখনও সেই প্রবণতা আমার এতো বেড়ে গিয়েছে যে, সাবধানে গাছ থেকে নামতে শুরু করলাম। অবশ্য আমি জানতাম যে, যতই সাবধানী হই না কেন মানুষখেকো শয়তানটা আমার নামার শব্দ ঠিকই শুনতে পাবে। এখন সে গাছের নীচে নামবার এবং যেখানে কাল্লার মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ পড়ে রয়েছে সেখানে যাবার সুযোগ দিলেই হয়। বিপদ ছিল একটাই। হয়তো অর্দ্ধেকটা নামার পর সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর সেটা যদি হয় তবে আমি রাইফেল ব্যবহার করতে পারবো না। রীতিমতো তখন অসহায়। এটা ভেবেই ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। গা ঘেমে নেয়ে উঠলো। সর্বাঙ্গ দিয়ে টপটপ্ করে ঘাম ঝরছে। হাত পিছলে যাচ্ছে। যতটা সম্ভব ধীরে ধীরে ঠিক জায়গামতো পা ফেলার জন্য সতর্ক হয়ে তবে নীচে নামতে লাগলাম। কেননা, এখন পরে গিয়ে আহত হবার মানে হচ্ছে মানুষখেকোটার দয়ার ওপর নির্ভর করে পড়ে থাকা।

আমি যখন ঠিক অর্দ্ধেকটা নেমেছি তখনই শয়তানটার ডাক বন্ধ হয়ে গেল। সে আমার নামার শব্দ শুনতে পেয়েছিল। টের পেয়েছিল যে শিকার নড়াচড়ার চেষ্টা করছে। তাহলে কি সে ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করতে এগিয়ে আসবে এখন? হয়তো আসতেও পারে। এমনকি কয়েকফুট দূরে এসে সে দাঁড়াতেও পারে।

এইসব ভেবে আমার গা অস্থির হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে দু'একবার পিছলে পরে যাবার উপক্রম হয়েছিল। যদিও তারার আলো ছিল যথেষ্ট, তবুও আমাকে পা ফেলে ফেলে দেখে নিতে হচ্ছিল ঠিক জায়গায় পা দিচ্ছি কিনা। শেষপর্যন্ত গাছের নীচের মাটি স্পর্শ করলাম। এখন আমার চঞ্চলতা ও অস্থির ভাবটা অনেকটা কেটে গেছে। তাড়াতাড়ি রাইফেলটা ঠিক করে নিয়ে গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। উদ্দেশ্য প্রতিমুহূর্তে যে আক্রমণের আশংকা করছি তার মোকাবিলা করা।

চারিদিকে দারুণ নৈঃশব্দ বিরাজ করছে। কোন পাতারও নড়াচড়ার শব্দ

শোনা যাচ্ছে না। ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলোও চুপ করে রয়েছে। ভাবলাম মানুষখেকোটা হয়তো আমাকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে। তবে সে নড়াচড়া করলেই আমি খস্‌খস্‌ আওয়াজ পাবো। বুঝতে পারবো সে কোথায় আছে। এবং আমি একটা সুযোগও পাবো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোনরকম আওয়াজ পেলাম না।

এরপরেই ঘটনাটা ঘটলো। আমি যেমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, বাঘটাও তেমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সে আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। ভয়ঙ্কর গর্জন তুলে আমাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এলো।

আমি তার আগমন যেদিক থেকে আশংকা করেছিলাম সেদিক থেকে সে আসেনি। সে যেখানে লুকিয়ে ছিল সেখান থেকে সরাসরিও আক্রমন করেনি। সে এসেছে পেছন দিক দিয়ে।

আমি হঠাৎ তার গর্জন শুনে ঘুরে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে হাতের টর্চটাও জ্বালিয়ে দিলাম। কিন্তু গাছের মোটা গুড়িটার আড়ালে থাকায় কিছুই দেখতে পেলাম না, এমনকি টর্চের আলো গাছে ধাক্কা খেয়ে আমারই চোখ ধাঁধিয়ে দিল। গাছটার ওপারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেখান থেকে বাঘটা রাগে ফুলতে ফুলতে আমার বাঁদিক থেকে হঠাৎ উপস্থিত হলো আমার সামনে। আমি দ্রুত একলাফে ডান দিক দিয়ে গাছটার আড়ালে চলে গেলাম। এবং রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে মানুষখেকোটার মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম।

বাঘটা সামনের দিকে তাড়া করবার ঝোঁকটা সামলে নিয়ে ঘুরবার চেষ্টা করলো। কিন্তু আমি তখন দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে রাইফেলের ট্রিগার টিপলাম। এগিয়েও এলাম গাছটার সামনে। আবার আর একটা গুলি ছুঁড়লাম সামনের আবছা অন্ধকারের মধ্যেই। গুলিটা গিয়ে লাগলো বাঘটার পেছনের দিকে।

কিন্তু বাঘটা মুহূর্তের মধ্যে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো। নেমে এলো একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। আমি আশা করলাম মৃত্যুমুখী বাঘটার করুণ আওয়াজ শুনতে পাবো নয়তো মারাত্মকভাবে আহত হয়ে আর্তনাদ করার অথবা আহত হয়ে রেগে গিয়ে ঘন ঘন গর্জন করার শব্দ শুনতে পাবো। শব্দ শোনার আগ্রহে কান খাড়া করে রাখলাম। কোন জন্তু আহত হওয়ার পর যদি তার পালাবার ক্ষমতা থাকে তাহলে সে ঝোপঝাড় ভেঙ্গে দ্রুত ছুট দেয়। সেরকম কোন শব্দও কানে ভেসে এলো না।

বাঘটা যেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছিল সেই জায়গাটা পনেরো মিনিট ধরে টর্চের আলোয় ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম। কিন্তু না, কিছু দেখতে পেলাম না।

একটা অপার্থিক নীরবতা বিরাজ করছে তখনও। কোন সম্বর বা চিতল হরিণেরও ডাক শোনা গেল না। তাহলে কি বাঘটা আমার প্রথম গুলিটাতে আহত হবার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে?

শেষপর্যন্ত একটা শব্দ কানে এলো। ভাল করে শোনার পর বুঝলাম ঝিঁ ঝিঁ পোকার দল ডাকতে শুরু করেছে। তারপরেই গোটা জঙ্গলটা নানা ধরনের শব্দে মুখর হয়ে উঠল। মনে হলো কে যেন সেই অদৃশ্য ট্রাক্টরটা ফের চালিয়ে দিল।

আমি নিশ্চিত হলাম যে, মানুষখেকোটা তাহলে ধারে কাছে কোথাও নেই।

আমার স্নায়বিক উত্তেজনা আস্তে আস্তে কমে গেল। মানুষখেকোটাকে শেষ যেখানে দেখেছিলাম সেখানটার মাটি পরীক্ষা করার জন্য টর্চের আলো ফেললাম। ভালভাবে জায়গাটা পরীক্ষা করে বাঘটার পালিয়ে যাবার পথটি অনুসরণ করলাম। বাঘটা ঠিক যেখানে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গিয়েছিল সেখানে পৌছুলাম কয়েক পা হেঁটেই। কিন্তু বৃথাই সব চেষ্টা।

হঠাৎই আমার মনে পড়লো যে আমি একবার ছেড়ে দু'বার গুলি ছুঁড়েছিলাম প্রথমে। কিন্তু তাতে একবারও বাঘটার গর্জন শোনা যায়নি। প্রথম দু'বার গুলি ছুঁড়েও বাঘটাকে আহত করতে পারিনি ভেবে মনে কষ্টই পেলাম।

এই অন্ধকারের মধ্যে চেনচু পল্ল'তে ফিরে যাওয়া নিরাপদ নয় মনে করে আবার এসে মাচানে বসলাম। মনে মনে নিজের ওপর ধিক্কার দিলাম। এইসব নানা চিন্তা করতে করতেই একরকম রাত পার হয়ে গেল। ভাবলাম, মানুষখেকোটা এখন নিশ্চয়ই আরো চালাক হয়ে উঠবে। এবং আর সে এখানে আসবে না। অবশ্য এতে বাঘটা আরও ক্ষুধার্তই হবে। এবং খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে শিকার করতে বাধ্য হবে। আর এর মাশুল দিতে হবে এই অঞ্চলের চেনচু ও অন্যান্য আদিবাসীদের। আমার দুর্বল শিকারের মূল্য আদায় করবে সে এখন।

রাত শেষ হবার খানিকটা আগেই হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোর হবার

কিছুক্ষণ পর আপ্পু ও কয়েকজন চেনচু এসে হাজির হয়েছিল সেখানে। তাদের ডাকে ঘুম ভাঙলো। তারা আগের রাতের গুলির পরিণতিতে কি ঘটেছে তা জানতে এসেছে। কিন্তু আমি অকৃতকার্য হবার জন্য রীতিমতো লজ্জাবোধ করলাম। তবুও তাদের সবিস্তারে ঘটনাটা বললাম। আপ্পু কোন কথা না বলে একটা ভুরু ওপরের দিকে তুলে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। তার দৃষ্টিতে আমি দেখতে পেলাম একরাশ ঘৃণা এবং আমি যে তা ধরতে পেরেছি সে তা বুঝতে পারলো।

আমি আর আপ্পু পেড্ডাচেরুভুতে ফিরে এলাম। আসার আগে চেনচুদের বলে এলাম যে, আবার যদি মানুষখেকোটার দেখা পাওয়া যায় তবে যেন তারা আমাকে জানায়। অবশ্য এছাড়া আর কিছু বলারও ছিল না। সারা রাস্তা আমার এবং আপ্পুর কারও মুখ দিয়েই কোন কথা বেরুলো না। দু'জনেই বুঝেছিলাম যে, এই পরিস্থিতিতে বেশী কথা বলা ঠিক নয়।

ফিরে এসে বায়ান্নাকে সব জানালাম। সে সব শুনে শিকারের ওপর রীতিমতো একটা বক্তৃতা দিল। উদ্দেশ্য আমি যাতে আমার ব্যর্থতার জন্য হতাশ না হয়ে পড়ি। আমি তার কথায় তেমন কর্ণপাত করিনি। সে সেটা বুঝতে পেরে শুতে চলে গেল।

এরপর দু'দিন আর কিছুই ঘটলো না। বায়ান্না জানালো, প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী আনতে আমাদের মারকাপুর ফিরে যেতে হবে। আমার কাছে কথাটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হলো। আমার ধারণা হলো, আমার ওপর আশা ছেড়ে দিয়েই সে ফিরে যাবার কথা বলছে। বায়ান্না হয়তো ভাবছে যে, মানুষখেকোটা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী চালাক।

কিন্তু আপ্পু বায়ান্নাকে বললে, তিনি যেন একাই মারকাপুরে খাদ্য আনতে যান। আর সে ও আমি সকাল সন্ধ্যে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াব বাঘটার সন্ধানে। বায়ান্না এই কথায় রাজী হলো ঠিকই। তবে সে বললো, আমরা অযথা সময়ের অপচয় করছি।

পরদিন সকালে আমার তিনজনেই একসঙ্গে বেরুলাম। বায়ান্না যাবে মারকাপুরের দিকে আর আমরা যাবো খোঁড়া বাঘটাকে খুঁজতে জঙ্গলে। আপ্পু এবার একটা নেড়ীকুকুর সঙ্গে নিয়েছে। কুকুরটার কান দুটো কাটা। 'ঘোড়া মাছি'র ঝাঁক যাতে ওর প্রতি আকৃষ্ট না হয় সেজন্যই কান দুটো কেটে দেওয়া হয়েছে। আমি এই মাছিগুলোর নাম জানি না। তবে এগুলো

নাকি আফ্রিকার টিসি-টিসি মাছির সমগোত্রীয়। এগুলোর কামড় তেমন মারাত্মক কিছু নয়, তবে অত্যন্ত জ্বালা করে এবং বেশ ব্যাথা হয়।

আপ্পু কুকুরটাকে আদিয়াপ্পা নামে ডাকছে। কুকুরটা দেখতে এতো রোগা যে মনে হয় কিছুই খায়নি বেশ কিছুদিন ধরে। কুকুরটার নাম আদিয়াপ্পা শুনে আমি খুব অবাক হলাম। কেননা, তেলেগু ভাষায় আদিয়াপ্পা সাধারণতঃ মানুষের নাম হয়। পরে জানলাম, আদিয়াপ্পা নামে তার এক প্রতিবেশী আছে, যাকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। তাই তাকে অপমান করার জন্যই সে ঐ নামে নেড়ী কুকুরটার নাম রেখেছে। সে আরও জানালো যে, সেই লোকটাও এর প্রতিশোধ নিয়েছিল তার কাপড় কাঁচার বোঝা নিয়ে যাবার জন্য যে গাধা রয়েছে তার একটার নাম 'আপ্পু' রেখে।

আমি আর আপ্পু হ্রদটা ধরে চক্কর খেলাম। সঙ্গে পায়ের ফাঁকে ফাঁকে চলেছে নেড়ী কুকুরটা। তবে এবার আমরা পূবধার ধরে এগোলাম। হ্রদটার এই দিকটায় ঘন ঝোপঝাড় থাকায় এখানে শিকারযোগ্য পাখী রয়েছে প্রচুর। আমরা কৃষ্ণসার হরিণের দলকেও দেখতে পেলাম এই দিকটায়। এই হরিণের দল সাধারণতঃ ঘন জঙ্গলে থাকে না। বরং শস্যক্ষেতের ধারে কাছে পতিত জমিতে এরা বিচরণ করে থাকে। একটা প্যাঁচালো সিংওয়ালা সাদা-কালোয় চিত্রিত হরিণও দেখা গেলো। সে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তবে আদিয়াপ্পার ক্ষুধাতুর গলার আওয়াজ শুনে হরিণটা দলবল নিয়ে ছুট দিল। নেড়ী কুকুরটা কিন্তু তাড়া করতে ছাড়েনি। তবে পারেনি কিছু করতে। সে হতাশ হয়ে আমাদের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলো যেন আমরাই তার না পারার জন্য দায়ী। তার শিকারটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় কুকুরটা যে মনে মনে ক্ষোভ প্রকাশ করলো সেটা আমরা বুঝলাম।

ভারতে যে বিভিন্ন জাতের হরিণ দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে কৃষ্ণসার হরিণ দেখতে সবচেয়ে সুন্দর। একসময় এদের প্রচুর সংখ্যায় দেখা যেতো। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন পতিত জমিতে এরা হাজারে হাজারে ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু সেই থেকে নানাভাবে ফাঁদে ফেলে এদের ধরা হতে থাকে। ফলে আজ তারা সংখ্যায় কমে গিয়েছে মারাত্মক ভাবে। এখনও এদের শিকার করা হয়ে থাকে। তাই ধীরে ধীরে এদের বংশ নিঃশেষ হতে চলেছে। যদিও এইসব হরিণগুলোকে রক্ষার জন্য সরকার নানা বিধি নিষেধ চালু করেছেন কিন্তু সেগুলোর অস্তিত্ব শুধু কাগজে কলমে। কেউ সে আইন মেনে

চলে না। এর পরিণতিতে একদিন কৃষ্ণসার হরিণের দল নিশ্চিত ভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এছাড়া, কৃষ্ণসার হরিণ জাবরকাটা প্রাণী। আর এজন্য এদের শিকার করা শিকারীদের পক্ষে অনুকূল। তারা যখন জাবর কাটে তখন বেশীক্ষণ চলতে পারে না এবং অল্পেতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিছুদূর যাবার পরই অসহায় ভাবে মাটিতে বসে পড়ে। কৃষ্ণসার হরিণের এই দুর্বলতাটা দেশী ও বিদেশী চোরা শিকারীর দল ভালো করেই জানে। এই হরিণেরা বেশীক্ষণ ধরে চরে বেড়াতেও পারে না। তাই শিকারীরা কোন একটি দলকে দেখলে তাদের চোখে চোখে রাখে যে পর্যন্ত না তারা জাবর কাটার জন্য মাটিতে শুয়ে পড়ে। তারপর কয়েকমুহূর্তে অপেক্ষা করে শিকারী বন্দুক কিংবা তীর-ধনুক আর কুকুর নিয়ে তাড়া করে। তখন হরিণগুলো ভয়ে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্ত্রীহরিণ কিংবা বাচ্চা হরিণগুলো বেশীদূর দৌড়ে যেতে পারে না। অল্পেতেই ক্লান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তখন কুকুরের দল হয় তার দেহ ছিন্নভিন্ন করে দেয় নয়তো শিকারীর বন্দুকের গুলিতে মারা পড়ে।

এবার আবার আসল ঘটনায় ফিরে যাই। আমরা হরিণগুলো দেখে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই একদল নীলগাই-এর পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। চারটে প্রাণীর এ দলটা গতরাতে হ্রদে জল খেতে এসেছিল। আমরা ঐ জায়গায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। কারণ দেখলাম, ঐ চারটে নীলগাই-এর পায়ের ছাপের ওপর একটা পুরুষ বাঘের পায়ের ছাপ পর পর গিয়েছে।

আমি আর আপ্পু সেখানকার মাটি ভালো করে পরীক্ষা করে সেই ছাপ ধরে এগুতে লাগলাম। কিছুক্ষণ যাবার পরই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এই ছাপটা খোঁড়া সেই মানুষখেকোটার নয়। কেননা, এই জানোয়ারটার চারটে পায়েরই ছাপ রয়েছে। তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি যে, এ নিশ্চয়ই সেই গর্জনকারী বাঘটার পায়ের ছাপ। এই বাঘটা কখনোই আমাদের পক্ষে সহায়ক কিংবা মঙ্গলকর নয়। আর খোঁড়া বাঘটাও একটা পুরুষ বাঘ, তাই সে নিশ্চয়ই এই বাঘটাকে সঙ্গ দিতে যাবে না। তাই এই বাঘটাকে খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই।

আমরা তখন সোজা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললাম। দুপুর পর্যন্ত হাঁটার পর অনুমান করলাম যে হ্রদটা থেকে প্রায় মাইল দশেক দূরে এসে পড়েছি। বেশী

দূরে যাওয়া ঠিক উচিত মনে করলাম না। তাছাড়া মানুষখেকোটার উৎপাত এই অঞ্চলটার মধ্যেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ। আমরা নীচুস্বরে আলোচনা করতে করতে অন্যদিকে মোড় নিলাম। এবার হাঁটতে আরম্ভ করলাম উত্তর-পশ্চিম দিকে, যাতে সন্ধ্যে হবার আগেই হ্রদের পশ্চিমপারে এবং চেনচু বসতির দু'মাইলের মধ্যে গিয়ে পৌছুতে পারি।

কিছুটা গিয়ে আমরা এক নতুন অসুবিধায় পড়লাম। দেখলাম পশু চলাচলের ছোট রাস্তায় এসে পড়েছি। অথচ আমরা যে পথে এগুচ্ছি তার সঙ্গে এই ছোট রাস্তাটি সমকোন তৈরী করে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে সোজা উত্তর-পূর্ব দিকে চলে গিয়েছে। যদিও রাস্তাটি সোজা হ্রদের পাড় পর্যন্ত গিয়েছে, তবুও আমরা তা ব্যবহার করতে পারলাম না। বরং সোজা ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে গন্তব্যস্থল অভিমুখে রওনা হলাম। এতে এগিয়ে যাওয়া যেমন কষ্টকর হলো তেমনি গতিও অনেক কমে গেল। কয়েকগজ পর পরই কাটা ঝোপ। সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে তবেই চলতে হচ্ছিল। ফলে আমাদের অনুমিত সময়ের হিসাবের সঙ্গে পথের দূরত্ব কিছুতেই মিলল না। সময় বেশীই লাগলো। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম আমরা। ঘন ঘন কম্পাস দেখতে লাগলাম।

বেলা তিনটের সময় গরম এত প্রচণ্ড হলো যে গা হাতপা পুড়ে যাবার যোগাড়। অগত্যা একটা পাহাড়ের কাছে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু ততক্ষণে আমরা ঘেমে রীতিমতো চান করে উঠেছি। যে পাহাড়টার কোলে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সেটির একদিকের একটা পাথর আমাদের দিকে ঝুলে রয়েছে। এক একবার সেই পাথরটার ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প জল পড়ছে। আর এই জলেই ওখানে একটা ছোট্ট জলাধার তৈরী হয়েছে। জলাধারে জল যত না পড়ছে তার চেয়ে বেশী জল যেন মাটি শুষে নিচ্ছে। জলাধারের জলটা দেখতে লাগছে কাঁচের মতো স্বচ্ছ। আর আমরা গরমে এত কাহিল হয়ে পড়েছিলাম যে, এই জলাধারটা আমাদের কাছে সাহারার মরুদ্যানের মতো মনে হলো।

কিন্তু এখানে এসে দেখি সেই বাঘের পায়ের ছাপ। শুধু পায়ের ছাপই নয়, থাবার অনেক আঁচড়ও দেখলাম। তার মানে বাঘটা এখানে রোজ জল খেতে আসে। এবং বসে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করতে করতে জল খায়। আমরা ঘটনাক্রমেই বাঘটার এই নিত্য জল খাবার জায়গা আবিষ্কার করে ফেলেছি। ভালো করে নজর করে দেখলাম, কিছু কিছু জায়গায় বাঘটার পঙ্গু পা-টার হেঁচড়ানোর দাগ রয়েছে।

নিঃসন্দেহ হলাম আমরা। খোঁড়া মানুষখেকোটার পায়ের ছাপেরই সন্ধান পেয়েছি শেষপর্যন্ত। এই নতুন আবিষ্কারে এত খুশী হলাম যে ইচ্ছে হলো প্রাণখুলে চেঁচাতে। তাছাড়া তৃষ্ণা মেটানোর এমন সুন্দর জল হাতে পেয়েও উৎফুল্ল হয়েছিলাম। আমি রাইফেলটা মাটিতে নামিয়ে রেখে জলাধারের কাছে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। মনে হলো যেন একটা সুরই আমার কানে বেজে চলেছে—জল খাও, যত পারো জল খাও। আপ্পুর দিকে তখন আমার নজর নেই, তার কথা পর্যন্ত চিন্তা করলাম না।

আপ্পু অবশ্য সাহেব সব কিছু করার অধিকার দিয়েছে মনে করে জল খেয়ে নিলো আগেই। আর আমি যখন অবচেতন মনে আনন্দে হিমশীতল জল পান করতে ব্যস্ত তখনই মানুষখেকোটা আমাদের আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়।

বাঘটা ডানদিক থেকে 'গরগর' শব্দে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। আবার একবার শব্দ করল সে। তারপরই সোজা আক্রমণ করতে এগিয়ে এলো।

ডান হাত দিয়ে রাইফেলটা হাতড়াতে হাতড়াতে আমি উবু হয়ে বসলাম, যাতে বাঘটার আক্রমণকে যথাসম্ভব মোকাবিলা করতে পারি। আবার একটা ভয়াবহ দৃশ্যের মুখোমুখি। দেখলাম, বাঘটা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে এলোমেলো পদক্ষেপে আমাদের দিকেই তেড়ে আসছে। এদিকে আপ্পু জায়গা পরিবর্তন না করে ঐ আক্রমণের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে পাগলের মতো হাতের কুড়ুলটা চক্রাকারে ঘোরাতে লাগলো। আর আদিআপ্পা সেই মুহূর্তে রেগে গিয়ে তার মনিবের পাশে দাঁড়িয়ে গজরাতে আরম্ভ করেছে।

আমার ধারণা, বাঘটা এই দৃশ্য দেখে ভয়ে পেয়ে যায়। এই পর্যন্ত সে যত লোককে মেরেছে তারা সকলেই বুদ্ধি হারিয়ে তারই হাতে প্রাণ সমর্পণ করেছে। তারা ভয়ার্ত আর্তনাদ করেছে কিন্তু কখনো প্রতিরোধ করতে সাহস করেনি। কিন্তু এক্ষেত্রে সে বিপরীত দৃশ্যের মুখোমুখি। একটা লোক হাতে কি যেন একটা জিনিস ঘুরিয়ে চলেছে। আর একটা নেড়ী কুকুর, যার দিকে তাকাতে ঘেন্না হয়, সম্মান নষ্ট হয়, মনে হচ্ছে সে যেন আক্রমণের মোকাবিলা করতে চাইছে। এইক্ষেত্রে তার মনের মতো মানুষ হচ্ছে দ্বিতীয়জন, যে মাটিতে উবু হয়ে পড়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে যেন ভয়ে ওঠার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

বাঘটা এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো। সেটাই তার সবচেয়ে বড় ভুল হলো। মাটিতে শুয়ে যে আমি বন্দুক বাগিয়ে রয়েছি সে সেটা বুঝতে

পারেনি। আমিও সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজী হলাম না। লক্ষ্য স্থির করে পরপর তিনটি গুলি ছুঁড়লাম। কাজ হলো তিনটেতেই। বাঘটা নড়াচড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রাণবায়ুও বেরিয়ে গেল।

মৃত জানোয়ারটাকে পরীক্ষা করে দেখলাম যে, আগে যা বলেছি তাই ঠিক। বাঘটা অন্য একটা বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মারাত্মক ভাবে জখম হয়। তার ডান পা'টা একরকম পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। আর এই কারণেই সে মানুষখেকোতে পরিণত হয়েছিল।

মানুষখেকোটাকে হত্যা করার ব্যাপারে আপ্পু আর তার কুকুর আদিয়াপ্পা যে সাহায্য করেছে সে কথাটা বায়ান্না মারকাপুর থেকে ফিরে এলে তাকে বললাম। বেটে খাটো আপ্পু আর তার কুকুরটি যদি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে যেতো তাহলে বাঘটা কখনোই দৌড়ে আসতো না এবং আমিও আজ এ ঘটনা বলতে পারতাম না। এদিকে বায়ান্না বৃথাই কষ্ট করে মারকাপুর থেকে খাদ্য নিয়ে এলো।

গল্পটি শেষ করার আগে আরেকটা কথা বলি। সেটা হলো, মানুষখেকোটার গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কেন ঝিঁ ঝিঁ পোকার দল ডাক বন্ধ করে দেয় সে সম্পর্কে। আমার মাদ্রাজের প্রকৃতি-বিদ্ বন্ধুটির ধারণা, বাঘের প্রচণ্ড গর্জনে মাটি কাঁপতে থাকে। ফলে সেই কম্পনে ভয় পেয়ে ঝিঁ ঝিঁরা ডাক বন্ধ করে দেয়। ঝিঁ ঝিঁ-রা শুনতে পায় না, তবে ওদের অনুভূতিশক্তি প্রবল। মাটি কাঁপায় ওদের ধারণা হয় যে, সম্ভবতঃ ভূমিকম্প হবে। তাই তারা চুপ করে যায়। ওরা তো তবু ভূমিকম্পের কথা ভেবে চুপ করে থাকে, কিন্তু আমি আপনি কি ভূমিকম্পের সময় চুপ করে বসে থাকতে পারবো?

জঙ্গলের কিছু অদ্ভুত ঘটনা

৩

জঙ্গলে যাওয়া মানেই সবসময় প্রাণী হত্যা বা শিকার করা তা কিন্তু মোটেই নয়। বরং উদ্দেশ্য অনেক সময় অন্যরকম থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেই লক্ষ্য করেছি যে, বিশেষ প্রয়োজন না হলে পশুহত্যা করতে মন চায় না। তাই এই সুযোগে আমি, বিভিন্ন জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যে সব অদ্ভুত ঘটনাবলীর মুখোমুখি হয়েছি, সেগুলিই পাঠক পাঠিকাদের কাছে পেশ করছি। আমার অভিজ্ঞতার ঝুড়িতে এগুলোর একটা বিশেষ স্থান রয়েছে।

নীলগিরি পর্বতমালার উত্তরে যে ছোট ছোট পাহাড় রয়েছে তার মধ্যে অবস্থিত যে বিরাট অঞ্চল সেটির পশ্চিমদিকটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা। সেই তুলনায় পূর্বদিকের জঙ্গলটা বেশ খানিকটা হাল্কা। মৌসুমী বায়ু নীলগিরি পর্বতমালায় বাধা পেয়ে পশ্চিমে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত ঘটায় পূর্বদিকে ততটা হয় না। তাই পূর্বে বন কম। বহু শতাব্দী আগে এই পুরো অঞ্চলটা জুড়ে কৃষিকাজ হতো। তখন ঘন লোকবসতিও ছিল। জঙ্গলের মধ্যে এখনো কয়েকটা গ্রামের, কেল্লার ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। তবে সেগুলো জঙ্গলে ঢাকা।

আমার চেমানাথের গোশালাটার কথা মনে আছে। এখনও সেখানে প্রায় আধ ডজন কাঞ্চির ঘর রয়েছে। দু'একর জমি নিয়ে এই গোশালাটা। জমিটা মোটামুটি বৃত্তাকারে কাঁটাঝোঁপ দিয়ে তিনফুট উঁচু করে বেড়া দেওয়া। তার ভেতরের জমিটায় যুগ যুগ ধরে অসংখ্য গরুর গোবর জমে ইঞ্চি দুয়েক পুরু গোবরের স্তর পড়েছে। গরমকালে যখন জঙ্গলে ঘাস থাকে না তখন গরুগুলোকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে সেটা শূন্য থাকে। তখন গোবরের স্তর শক্ত হয়ে সিমেন্টের রূপ ধারণ করে। আবার বৃষ্টি হলে গরু মোষগুলোকে নিয়ে আসা হয় সেখানে তখন আবার অন্য চেহারা হয় গোশালার। একদিকে বৃষ্টির জল। অন্যদিকে গরু মোষের মলমূত্র

মিলেমিশে একটা নরককুণ্ড তৈরী হয়। রাখালেরা থাকে ঠিক মাঝখানে। তাই তাদের সঙ্গে তখন দেখা করতে হলে আগন্তুককে প্রথম থেকেই প্রস্তুত থাকতে হয় যে গোবরে গোড়ালি কিংবা পায়ের আরো খানিকটা অংশ ডুবে যেতে পারে।

আমি শুধুমাত্র সেই গোশালার কথা বলছি তা নয়। আধমাইল দূরে যে প্রাচীন মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে সেটির কথাও বলবো। বিশাল ডুমুর গাছের শিকড় চলে গিয়েছে মন্দিরের দেওয়াল ভেদ করে। দেওয়ালের গায় গজিয়েছে গাছ। কিন্তু ভেতরে পূজার স্থানটি এখনো সুন্দরভাবে সংরক্ষিত।

মন্দিরটি শক্ত গ্রানাইট পাথরে তৈরী। মন্দিরের সামনের বাগানে একটা পাথরের তৈরী কুয়ো রয়েছে। তবে এখন আর সেই কুয়োতে জলের অস্তিত্ব নেই।

এই মন্দির থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে একটা পাথরের তৈরী কেল্লা। সেই কেল্লার চারিদিকে রয়েছে পরিখা। এখন অবশ্য জঙ্গলে সব ঢাকা। কেউ আর এখন সেদিকে পা বাড়ায় না। কবে এই অঞ্চলে বিপর্যয় ঘটে তা কেউ জানে না। তবে গল্প চালু আছে। বাবার মুখ থেকে ছেলের মুখ হয়ে সেই গল্প চলে এসেছে। সেই গল্পের কোন বিকৃতি নেই। অনুমান করা হয় দু'শ তিনশ' বছর আগে কিংবা তারও আগে এই অঞ্চলে বিপর্যয় দেখা দেয়।

জনশ্রুতি হিসেবে যে গল্প চালু আছে সেটা হলো, একবার ভয়ানক জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটায় হাজার হাজার লোক মারা যায়। ঐ রোগ নিরাময় করার কোন ওষুধ ছিল না, ডাক্তার বদ্যিও ছিল না। ফলে যেখানে রোগ দেখা দিত সেখানেই লোক মারা পড়তো অসহায়ভাবে। তাদের সেইসব মৃতদেহের সৎকার পর্যন্ত হতো না। ফলে সেগুলো গলে পচে ভীষণ রকম দুর্গন্ধ বেরুতো। সাত মাইল দূরে কালাহাণ্ডির লোকেরা পর্যন্ত নাকি সেই দুর্গন্ধ পেতো। গ্রামের যে কটা লোক ভাগ্যক্রমে বেঁচে ছিল তারা সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সেইথেকেই জনবসতি উঠে যায়। আস্তে আস্তে সেই অঞ্চলকে গ্রাস করে ঘন জঙ্গল।

সাংঘাতিক কি সেই রোগ, যা হাজার হাজার মানুষের জীবন নিয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। তবে রোগটার ক্ষমতা দেখে অনুমান করা হয়, ছোঁয়াচে রোগগুলোর মধ্যে সেটিই ছিল সম্ভবতঃ মারাত্মক। প্লেগ রোগের

মতোই হয়তো একটি কঠিন রোগ ছিল সেটি। এটা ঠিক যে, ঐ অঞ্চলে সেই যে জনবসতির লোপ পেয়েছিল তা নতুন করে গড়ে ওঠেনি।

গ্রানাইট পাথরের তৈরী সেই মন্দিরটি একসময় যে অন্যসব মন্দিরের মধ্যে শীর্ষস্থানে ছিল সেটা অনুমান করা যায়। মন্দিরে বাইরের লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। স্থানীয় ব্রাহ্মণরা খালি গায়ে খালি পায়ে পূজা করতো। মন্দিরের একপাশে একটা উঁচু মাটির মঞ্চ। তার উপরে স্থাপিত রয়েছে পাথরে খোদাই করা হিন্দুদের পবিত্র জীব ষাঁড়ের প্রতিমূর্তি। সবগুলোতেই ষাঁড় মাটিতে বসা অবস্থায় রয়েছে। সবথেকে বড় মূর্তিটা একফুট উঁচু ও লম্বায় আড়াইফুটের কাছাকাছি। আর সবচেয়ে যেটা ছোট সেটা চার ইঞ্চি উঁচু ও দশ ইঞ্চি লম্বা। মঞ্চের একধারে রয়েছে প্রায় ছ'ইঞ্চি উঁচু একটি পেতলের প্রদীপ। প্রদীপটা একটা খোদাইকরা দেবীমূর্তির উপর বসানো। কালের প্রভাবে প্রদীপটি আজ বিবর্ণ রূপ ধারণ করেছে।

এই প্রদীপটাকে ঘিরেই আমার গল্প। কয়েক বছর আগে আমি কয়েকজন পর্যটকের সঙ্গে ঐ মন্দিরে গিয়েছিলাম। তাঁরা সেখানে প্রথম গিয়েছিল। জঙ্গলের মধ্যেই আমার তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁরা মন্দিরটার কথা শুনেছিল, কিন্তু কোন পথে যেতে হয় সেটা তাদের জানা ছিল না। তাই তাঁরা আমাকে বলল পথ বাতলে দিতে। কিন্তু মন্দিরটা এমন জায়গায় যে খুঁজে পাওয়া শক্ত। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আমি গিয়েছিলাম ঐ মন্দিরে। আমি আর চারজন পর্যটক মিলে মন্দিরটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। একসময় এসে দাঁড়ালাম সেই ষাঁড়ের মূর্তিগুলির কাছে। এমন সময় একজন পর্যটকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো প্রদীপটার দিকে। সেই পর্যটক ভদ্রলোককে তার একজন সঙ্গী ক্যাপটেন নীড্ নামে ডাকলেন। ভদ্রলোক অষ্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন।

তিনি প্রদীপটা পকেটে ভরতে ভরতে বললেন, 'আমি এই পেতলের প্রদীপটা স্মারক হিসেবে নিজের কাছে রাখবো।'

আমি তার কথায় আপত্তি করলাম। বললাম, 'এটা করা আপনার পক্ষে ঠিক হচ্ছে না।' তাঁর স্ত্রীও আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'জন, ওটা আমাদের কোন কাজে আসবে না। ওটাকে জায়গামতো রেখে দাও।'

জন প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'না, এটা আমার প্রয়োজন।' এরপর আমরা সেখান থেকে বিদায় নিলাম। যুগযুগ ধরে যে প্রদীপটা তার নিজের জায়গায় ছিল সেটিকে সরানো যে অন্যায় কাজ হয়েছে সেটা না ভেবে

পারলাম না। আমি আমার আস্তানায় ফিরে গেলাম। পর্যটকরা ফিরে গেলেন উটকামণ্ড শহরের দিকে। চার'দিন পরে আমি জঙ্গলের প্রধান রাস্তাটা ধরে হাঁটছিলাম এমন সময় একটা হলদে-কালো রঙের ট্যাক্সি আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়লো। জঙ্গলের মধ্যে সাধারণতঃ ট্যাক্সি না আসায় আমি কৌতূহলী হলাম। ট্যাক্সির কাছে এগিয়ে দেখি ভেতরে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে রয়েছেন ক্যাপটেন নীড্। তাঁকে অসুস্থ দেখে আমি অবাক হলাম। তার সঙ্গে মিসেস নীড্ বসে আছেন। তাঁর মুখ শুকনো এবং গোটা মুখমণ্ডলে একটা চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

মিসেস্ নীড কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ যে আপনার সাক্ষাৎ পেলাম। জন ভীষণ অসুস্থ।'

তিনি না থেমে বললেন, তাঁরা যেদিন উটকামণ্ড পৌছান সেদিন সন্ধ্যাতেই তাঁর স্বামীর ভীষণ জ্বর হয় এবং অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। ডাক্তার বলছেন সর্দি-গর্মি হয়েছে এবং সেইমতো ওষুধ খান।

কিন্তু রাতে জ্বর বেড়ে গিয়ে ভুল বকতে শুরু করেন। তাঁর স্ত্রী ও সঙ্গীরা চিন্তিত হয়ে ডাক্তার ডেকে আনেন। এবং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে জানা গেল, তাঁর কালাজ্বর কিংবা ম্যালেরিয়া হয়েছে। কিন্তু কুইনাইন প্রয়োগ করেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হলো না। তৃতীয় দিনেও তাঁর অবস্থার কোন নড়চড় হলো না। তখন ডাক্তার স্বীকার করলেন যে, তাঁরা রোগ ধরতে পারছেন না। শেষে ক্যাপটেন নীডই জ্বরের আসল রহস্যটা বলে দেন। তিনি প্রায় সবসময়েই ভুল বকতেন জ্বরের ঘোরে। মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য আবার জ্ঞান ফিরতো। একদিন জ্ঞান ফিরলে তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'মার্গারেট! ঐ প্রদীপটা! আমাকে ওটা ওর জায়গাতেই বসিয়ে দিয়ে আসতে হবে। যাবার ব্যবস্থা করো তুমি। না হলে আমি কালই মারা যাবো। আমাকে নিজের হাতে ওটা রেখে আসতে হবে।'

ক্যাপটেন নীড এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। কিছুক্ষণ শ্বাস নিয়ে আবার বলে চললেন, একটা স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। প্রদীপটা সেই পবিত্র প্রাচীন মন্দিরের বেদীতে রাখা আছে। মিসেস্ নীড সমস্ত কথা ডাক্তারকে জানাতেই তিনি একটু হেসে বললেন যে, মিঃ নীড জ্বরের ঘোরে ভুল বকছেন।

কিন্তু মিসেস্ নীড গোটা ব্যাপারটা জানতেন। তাই হাল্কা ভাবে নিতে পারলেন না। হোটেলের টেবিলের ওপর প্রদীপটা বসানো ছিল। সেটা কি

একটা আকর্ষণে টানতো মীসেস্ নীভকে। ফলে তিনি প্রদীপটার দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হতেন।

মিসেস্ নীভ তাই ডাক্তারকে বললেন যে, মিঃ নীডকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে প্রদীপটা রেখে আসবেন মন্দিরে। তিনি আরও বললেন, মন বলছে না হলে সাংঘাতিক কোন বিপদ ঘটে যেতে পারে।

কিন্তু ডাক্তার কিছুতেই অনুমতি দিতে রাজী নন।

মিসেস্ নিডের মুখে ডাক্তারের বক্তব্য শুনে মিঃ নীড থেমে থেমে বললেন, 'তুমি যদি আমাকে নিয়ে গিয়ে প্রদীপটা রেখে আসার ব্যবস্থা না করো তাহলে কালই আমি মারা যাবো, মার্গারেট।'

মিসেস্ নীড বললেন, 'আমি তোমার হয়ে কাজটা সেরে আসছি।'

কিন্তু মিঃ নীড তা মেনে নিতে রাজী হলেন না। বললেন, 'না, তা হয় না। আ মি নিজে নিয়ে এসেছিলাম, আমিই ফেরত দিয়ে আসবো।'

তারপরই দু'জনে মিলে রওনা হন জঙ্গলের দিকে। আর পথে আমার সঙ্গে দেখা।

আমি কোন কথা না বলে ড্রাইভারের বা পাশের দরজা খুলে উঠে বসলাম ট্যাক্সিতে। ড্রাইভারকে কোন পথে যেতে হবে তা বলে দিলাম। ট্যাক্সিটা মন্দির পর্যন্ত যেতে পারলো না। ক্যাপ্টেন নীড পায়ে হেঁটে প্রদীপটা নিয়ে মন্দিরে যেতে চাইলেন, কিন্তু তার শরীরে তখন হাঁটবার মতো শক্তি নেই।

আমি তাই বাধ্য হয়ে বললাম, 'মিঃ জন, আমি বুঝতে পারছি যে প্রদীপটা নিয়ে যাওয়ায় আপনি খুঁব অনুতপ্ত। কিন্তু আপনি তো যতদূর পেরেছেন প্রদীপটা সঙ্গে করে এনেছেন। মন্দিরের দেবতা তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। এখন আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি আর মিসেস্ নীড আপনার হয়ে প্রদীপটা মন্দিরে রেখে আসি।'

মিঃ নীডের কথা বলার শক্তি ছিল না। তাই তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। আমি ও তাঁর স্ত্রী মন্দিরের দিকে এগোতে লাগলাম। মন্দিরের প্রধান ফটকের পুরানো দরজাটা বিশ্রী শব্দ করে খুলে গেলো। মিসেস্ নীভ বেদীটার ওপর প্রদীপটা রেখে মনে মনে প্রার্থনা করলেন। তারপর আমরা ট্যাক্সিতে ফিরে এলাম।

আমার হাতটা আপনা থেকে ঘুমন্ত মিঃ নীডের কপাল স্পর্শ করলো। তাঁর কপাল ও ঘাড় বেয়ে ঘাম ঝরছিল। শরীর একেবারে ঠাণ্ডা, জ্বর নেই।

আমি তখন তাঁর স্ত্রীর সাহায্যে কম্বলটা আরো ভালোভাবে মুড়িয়ে দিলাম। গাড়ীর জানালার কাচগুলো তুলে দিলাম, যাতে বাইরের গরম না লাগে। এরপর ড্রাইভারকে বললাম, এদের নিয়ে সোজা উটকামণ্ডের হোটেলে ফিরে যেতে। কেননা, মিঃ নীডকে আর হাসপাতালে নিয়ে যাবার প্রয়োজন ছিল না। তাঁর শরীর সুস্থ হয়ে উঠেছিল, জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল। মিসেস নীডের মুখে তখন খুসীর রেখা। ট্যাক্সিটি সোজা উটকামণ্ড অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

ঘটনাটা সত্যি যা ঘটেছিল, আমি সেটাই আপনাদের কাছে বিবৃত করলাম। ঘটনাটা অবশ্য আপনারা নানাভাবে ব্যাখ্যা করবেন। কেউ হয়তো বলবেন, এটা সম্মোহনের ব্যাপার। আমি সেই সব বিতর্কে যেতে চাই না। শুধু একটা কথাই বলবো, ঘটনাটা সত্যি।

আরেকটি অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হয়েছি সম্প্রতি। ঘটনাটা ঘটেছে উটকামণ্ড থেকে মাইল পনেরো দূরে মাভানহল্লা গ্রামের আধ মাইলের মধ্যে। এটা একটা যাদুর ব্যাপার।

মাভানহল্লা গ্রামের একটি সুন্দরী বালিকার সঙ্গে একটা লোকের বিয়ের কথা হয়েছিল। লোকটি থাকে বারো মাইল দূরের গাড্ডুপল্লী গ্রামে। ভারতে পাত্রপাত্রীরা নিজেরা পছন্দমতো বিয়ে ঠিক করে না। তাদের বাবা-মা বিয়ে ঠিক করেন এবং দেনাপাওনা ঠিক করেন। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত পাত্র ও পাত্রী নিজেদের মুখ পর্যন্ত দর্শন করতেপারে না। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা হয়েছিল। পাত্র তার বাবাকে সঙ্গে করে মাভানহল্লায় এসে পাত্রী দেখে পছন্দ করে দিন ঠিক করে গিয়েছিল।

পাত্র ইরিলা সম্প্রদায়ের লোক। এদের নিয়ম যে, পাত্রের বাবা মেয়ের বাবা-মাকে কিছু টাকা যৌতুক হিসেবে দেয়। আসল ব্যাপারটা হলো, পাত্রীকে টাকা দিয়ে কিনে নেয় এরা। কিন্তু ভারতের যৌতুক প্রথা ঠিক এর বিপরীত। পাত্রীপক্ষ পাত্রপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী যৌতুক দেয়।

এই সুন্দরী বালিকার বিয়ে পাকা হবার পর পাত্রের বাবা জানালো যে তারা কোন টাকা পয়সা দিচ্ছেন না কিংবা দিতে পারছে না। ফলে পাত্রীর বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে বিয়ে ভেঙ্গে দিল। এবং যৌতুক দিতে পারবে এমন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক করলো।

ঘটনাটার আরম্ভ এখান থেকেই। গাড়ুপল্লীর ছেলেটা অপমানিত হয়ে ভীষণ চটে গেলো। সে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রায় শ'খানেক মাইল পথ হেঁটে কোল্লেগাল শহরে এসে পৌঁছুলো। কাবেরী নদীর তীরে এই শহরটা। এই শহরে থাকে এক নামকরা যাদুকর। যেকোন অশুভ কাজের জন্য সে রীতিমতো বিখ্যাত। ছেলেটি গিয়ে হাজির হলো তার কাছে। যাদুকরটি ছেলেটির কাজ হাসিলের জন্য একটি ভেড়া উৎসর্গ দেওয়া দরকার বলে জানালো। সেইসঙ্গে নিল বেশ কিছু টাকা। পূর্ণিমার রাতে ভেড়া উৎসর্গ করা হলো। রাত তিনটের সময় কাজ শেষ হলো। ভেড়ার রক্ত অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য যে আত্মাটা কাজ করবে তাকে দেওয়া হলো। আর মাংসটা ঐ যাদুকর খেয়ে নিলো।

কোল্লেগাল থেকে মাভানহল্লা গ্রামের দূরত্ব একশত মাইল। সেখানে মেয়েটি ঘুমোচ্ছিল। ঠিক ঐ সময়ে অর্থাৎ তিনটের সময় মেয়েটি পেটে অসহ্য যন্ত্রণায় ঘুম থেকে জেগে উঠলো। সোজা ছুটে গেলো ঘরের বাইরে পায়খানা করার উদ্দেশ্যে।

পরের ঘটনা মেয়েটার মুখ থেকেই শোনা। পায়খানা থেকে বেরুনো মাত্রই দুটো লোক তার কাপড় চেপে ধরে এবং গাড়ুপল্লীতে যাবার জন্য তাকে অনুনয় করে। তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবার জন্য এটা নতুন বরের ফন্দি মনে করে মেয়েটি জানায় যে, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সে তাদের কাছে আসবে।

কিন্তু লোকদুটো মেয়েটির কথা শুনতে চাইলো না। মেয়েটি তখন বললো, রাস্তা তো অনেক দূর! এর উত্তরে লোকদুটো বলে যে তারা তাকে বয়ে নিয়ে যাবে।

কথাবার্তা চলাকালীন সময়ে মেয়েটি হঠাৎ লোকদুটির নীচের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলো। লোকদুটির কারও কোন পা নেই। জ্যোৎস্নার আলোয় সে পরিষ্কার দেখলো মাটিতে লোকদুটির কোন পা নেই। যেখানে পা রেখে দাঁড়ানো সম্ভব সেখানটা পরিষ্কার। শুধু মাটি।

মেয়েটি তখন বিকট চিৎকার করে উঠে। আর তাতেই লোকদুটি পালিয়ে যায়। চারদিক থেকে লোকজন ছুটে এলো। মেয়েটি তাদের সব খুলে বললো। কিন্তু প্রতিবেশীরা সব শুনে তা বিশ্বাস করতে চাইলো না। ভাবলো মেয়েটি স্বপ্ন দেখেছে। কেননা, যদি লোকগুলি থাকতো তাহলে অন্যের তো সকলের দেখতে পাবার কথা!

মেয়েটি সেদিন সারাদিন কোন ভাত খেলো না। তবে সে দিব্যি সুস্থ ছিল। সন্ধ্যায় সবাই জোড়াজুড়ি করতে মেয়েটি ভাত তরকারী নিয়ে খেতে বসলো। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়ে মুখে দিতেই আগুনে পুড়ে যাবার মতো অসহ্য জ্বালা করতে লাগলো এবং খাবার ক্রমশ শক্ত হয়ে যেতে লাগলো। সে তাড়াতাড়ি মুখ থেকে ভাতগুলো নীচে ফেলে দিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার ঘটলো। ভাতের বদলে মুখ থেকে পড়লো একটা পাথর।

পরপর আটদিন এই একই ঘটনা ঘটলো। আমি ঘটনাটা শুনি মাভান-হল্লায় গিয়ে। মেয়েটা দিনের বেলায় যখন খেতো তখন কোন অঘটন ঘটতো না, আশ্চর্যজনক ঘটনাটা ঘটতো রাতের বেলায় খেতে গেলেই।

ঘটনাটা শুনে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। আমি মেয়েটির সঙ্গে, তার বাবা-মার সঙ্গে এবং বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কথা বললাম। সবাই আমি এতক্ষণ যা বললাম তারই পুনরাবৃত্তি করলেন। মেয়েটার মুখ থেকে যে সব পাথর এবং অন্যান্য জিনিস বেরিয়ে ছিল সেগুলো মেয়েটার বাবা তুলে রেখেছিলেন। আমি চাইতেই তিনি সেগুলো আমাকে দিয়ে দিলেন।

সেই আশ্চর্যজনক ঘটনার সাক্ষী হিসেবে পাথর ও অন্যান্য জিনিসগুলো এখনো আমার কাছে রয়েছে। সেগুলোকে সামনে রেখেই এই গল্প লিখছি। যে সব জিনিসগুলো নিয়ে এসেছিলাম তার মধ্যে বিভিন্ন আকার ও গড়নের পাথরের টুকরো রয়েছে ছ'টা, ছ'টা কলসী ভাঙার টুকরো, দু'খণ্ড কয়লা এবং একটি কাঁচের টুকরো।

আমি আগেই বলেছি যে, আশ্চর্যজনক ঘটনাটা ঘটতো রাতের বেলায়। তাই আমি একদিন নিজে দেখবো বলে সন্ধ্যার আগে মেয়েটির বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম।

মেয়েটি নিশ্চুপভাবে মাটিতে শুয়ে ছিল। তবে মুখটা মাঝে মাঝে এমনভাবে নাড়াচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন মুখের মধ্যে কিছু রয়েছে। তার আশপাশে আরও বেশকিছু লোক দাঁড়িয়ে।

আমি নিজে নাস্তিক। তাই আমার মাথায় এলো যে, মেয়েটা সম্ভবতঃ নাটক করে চলেছে। আমার সন্দেহ হলো, গাড়ুপল্লীর লোকটাকে বিবাহ করার ইচ্ছেতেই মেয়েটি এইসব করছে। নাটকটা সম্পূর্ণ তার তৈরী। মেয়েটি দিনের বেলায় টালিভাঙা পাথরের টুকরো প্রভৃতি যোগাড় করে সম্ভবতঃ লুকিয়ে রাখে। আর সন্ধ্যায় খাবার খেতে যাবার আগে সেগুলো

মুখে পুড়ে নেয়। ফলে প্রথমে মুখে ভাত নিয়েই সে বস্তগুলিসমেত ভাত ফেলে দেয়। মেয়েটির সামনে আরও যত লোক দাঁড়িয়ে তাদের সকলের সামনে চালাকিটি ফাঁস করে দেবার জন্য আমি রীতিমতো ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

মেয়েটিকে পরীক্ষার জন্য আমি তাকে বড় করে হাঁ করতে বললাম। টর্চের আলো ফেলে ভালো করে দেখলাম। কিন্তু না কিছুই নেই। আঙুল দিয়ে তার জিভের তলাটাও পরীক্ষা করলাম। দেখলাম মুখের দুপাশও। আমি এই সময় আমার বাঁ হাতটা দিয়ে জোর করে তার ঘাড় চেপে ধরে রইলাম, যাতে তার মুখের মধ্যে যে পাথরটা ছিল বলে আমার সন্দেহ সেটা যেন আঙুলে ঠেকে।

ঘাড়টা জোরে ধরে থাকায় মেয়েটার শ্বাস কেমন যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু সে চুপ করে বসেই রইলো। নিজেকে মুক্ত করার সামান্যতম চেষ্টা করলো না। আমি তার এই ব্যবহারে অবাক হলাম। ঘাড় ছেড়ে দেবার পর সে কিছুক্ষণ মুখ নাড়া ও গাল ফোলানো বন্ধ করলো।

আধঘণ্টা পরেই তার খাবার এসে হাজির হলো। মেয়েটি ভাত যেই মুখে তুলতে গেলো আমি অমনি তাকে থামিয়ে দিলাম। আমার ধারণা হলো, ভাতের মধ্যে পাথর লুকানো রয়েছে। তাই তার মাকে ভাত মাখতে বললাম।

মেয়েটি এবার হাত বাড়িয়ে একমুঠো ভাত তুলে নিল। আমি তার সব-কিছু ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। সে ভালোভাবেই চিবিয়ে ভাত খেতে লাগলো। কোনরকম অস্বাভাবিকতা দেখা গেলো না। ভাবলাম মেয়েটি তাহলে আমাকে তার চাতুরীতে ভোলাতে পারেনি। তাই নিজের মনে আনন্দের হাসি হাসলাম।

কিন্তু কয়েক গ্রাস ভাত খাওয়ার পর আমি মেয়েটির মুখ থেকে কড়্মড় আওয়াজ শুনতে পেলাম। তার চোখে মুখে একটা ভীতির ভাব। আমি বুঝতে পারলাম, এটা তার আসল ভয়। মেয়েটি হঠাৎ মুখ থেকে ভাত অস্ফুট আর্তনাদ করে ফেলে দিল। দেখলাম, ভাতের বদলে পড়ল একটা পাথর।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে তাঁকে হাঁ করতে বললাম। আবার আঙুল দিয়ে মুখটা পরীক্ষা করলাম। আমি তার মুখে যা পেলাম তা আপনারা হয়তো বিশ্বাস করতে পারবেন না। আমি তো হাত দিয়েই স্তম্ভিত। মুখের মধ্যে আরো কিছু পাথরের টুকরো।

মেয়েটি ভাত গিলে ফেলার কোন সুযোগই পায়নি এ বিষয়ে আমি

নিঃসন্দেহ। তাহলে ভাতই পরিণত হয়েছে পাথরে! সেদিন সন্ধ্যায় যে পাথরটা মেয়েটির মুখ থেকে বেরিয়েছিল সেটা এখনও আমার টেবিলের ওপর সাজানো।

আপনারা নিশ্চয়ই ভাববেন, আমার গল্প এখানেই শেষ। কিন্তু না এখনো শেষ হয়নি। আমি তার পরের দিন আবার গিয়ে হাজির হলাম। মেয়েটির খাবার খাওয়া লক্ষ করলাম ভালো করে। কিন্তু সেদিনও সে আমার অনুসন্ধানী মনকে বিদ্রুপ করে মুখ থেকে একটা কাঁচের টুকরো বের করলো। সেটাও এখন আমার সামনে রয়েছে। কাঁচটা কিন্তু মসৃণ নয়। কেন যে তার গাল বা জিভ কেটে গেল না সেটাই আমি ভেবে পাইনি। সেদিন আরও বেশী লোক এসেছিল মেয়েটির খাবার খাওয়া দেখতে।

দূর দূরান্তে এই আশ্চর্যজনক ঘটনার সংবাদ বিদ্যুৎ-এর মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। পরের দিন বিকালে একজন চিকিৎসক এসে হাজির হলেন সেখানে। লোকটা প্রায় আমার বয়সী। ভরতীয় খ্রীষ্টান। আমি সেদিন সন্ধ্যায় একটু তাড়াতাড়িই মেয়েটির বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। গিয়ে দেখি, সেই চিকিৎসক ভদ্রলোক দরজার কাছে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে রয়েছেন। খানিকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে জোরে হেসে উঠলেন। ইংরাজীতে জানালেন, নিজের পরিচয়। তাঁর ভারতীয় নাম পুট্টাস্বামী। তিনি উট্কামণ্ডে বেড়াতে এসেছিলেন, সেখানেই মেয়েটার কথা তিনি প্রথম শুনেছেন। আর তারপরই চলে এসেছেন এখানে।

তাঁর কথাবার্তায় অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ স্পষ্ট। তিনি বিনয়ের সঙ্গে বললেন যে, ভগবান তাঁকে রোগ আরোগ্যের ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তাই তিনি মেয়েটিকে ভালো করতে এসেছেন। আমি প্রায় বিদ্রুপের স্বরে তাঁকে বললাম 'তাহলে আপনি রোগ সারানো যায় কিনা তার চেষ্টাই করতে এসেছেন।'

—না মশাই। আমি মেয়েটিকে সারাবোই বলে এসেছি। ভগবান কখনও ব্যর্থ হয় না।

ভদ্রলোকের এমন গভীর আত্মপ্রত্যয়ের মুখোমুখি হয়ে আমি লজ্জাই পেলাম। তিনি মেয়েটির বাবা মা এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে সব কিছু জেনে নিলেন। সবশেষে আমিও দু'দিন ধরে যা দেখেছি তা সবিস্তারে বললাম।

মেয়েটি ততক্ষণে ঘামতে শুরু করেছে। তার মুখ ও গাল নড়ছে। গত দু'দিনে আমি যা যা দেখেছি সে সবই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। পুট্টাস্বামী মেয়েটির

পাশে প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাঁটুগেড়ে বসে ছিলেন। চোখ বন্ধ। তবে মুখে বিড়-বিড় করে কি সব যেন বলছিলেন।

আমি তখন মেয়েটিকে আগের মতো আবার হাঁ করতে বললাম। এবং ভালো করে পরীক্ষা করলাম। সব দেখে শুনে নিঃসন্দেহ হলাম যে, মুখের মধ্যে কিছু নেই।

এরপর শুরু হলো নাটকের শেষ দৃশ্য। মেয়েটি সামনের ভাত তরকারী মাখিয়ে মুখে দিয়ে চিবোতে লাগলো। পুট্টাস্বামী নীরবতা ভঙ্গ করে আদেশের ঢঙে বলে উঠলেন। গলার আওয়াজ যেমন দৃঢ় তেমনি জোরালো। 'আমি নাজারেথের যীশুখ্রীষ্টের হয়ে আদেশ করছি, তুমি যেই হও মেয়েটির দেহ ছেড়ে বেরিয়ে এসো।'

মেয়েটির মুখ থেকে তখন পাথর চিবানোর বিশ্রী আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সে আর্তনাদ করে শুয়ে পড়লো মাটিতে। তারপর মাটিতে গড়াতে লাগলো। নিজের চুল প্রাণপণে টানছে সে, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠছে। আবার পুট্টাস্বামী জোরে বলে উঠলেন, 'নাজারেথের যীশুখ্রীষ্টের নামে বলছি, এই মুহূর্তে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে এসো'।

মেয়েটি ক্রমশঃ খিঁচতে খিঁচতে ধনুকের মতো বেঁকে গেলো। যে ভাত-তরকারী মুখে দিয়েছিল সেগুলো ফেলে দিল। গলা দিয়ে তখন তার বিশ্রী শব্দ বেরুচ্ছে। আর ভীষণভাবে সে কাঁপছে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার সে এদিক ওদিক গড়াতে লাগলো। তার মুখে আর পাথর নেই।

পুট্টাস্বামী আনন্দে কাঁপতে লাগলেন। মৃদুভাবে বললেন, 'ভগবান যীশুকে অশেষ ধন্যবাদ'।

আমরা বুঝলাম, মেয়েটি ভালো হয়ে গিয়েছে। ঐ আশ্চর্য অথচ অতি সাধারণ লোকটির ভেতর থেকে যে ক্ষমতা বিচ্ছুরিত হয়েছে তার প্রভাব যে কতখানি সেটা আমরা অনুভব করতে পেরেছিলাম।

আমি নিজে এই ঘটনার সাক্ষী। তাই অলৌকিক বলে উড়িয়ে দিতেপারিনি।

* * *

এখন আমি আপনাদের যার কথা বলবো সে একজন ডাকাত। ন'জন লোককে খুন করেছে সে।

গল্পের শুরু বহু বছর আগে। লোকটির নাম ছিল শেলভারাজ্। পুলিশের খাতায় তার সম্পর্কে যা লেখা আছে তা হলো, "বয়স ৩৬ বছর,

উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, গায়ের রং মোটামুটি কালো, মোটা প্যাচালো বাহারে গোঁফ রাখে সে, উপরের ঠোঁটটা অদ্ভুতভাবে উপরের দিকে তোলা, আর চোখের ডান দিক থেকে কান পর্যন্ত একটা কাটা দাগ আছে।"

পারিবারিক ঝগড়াকে কেন্দ্র করেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। শেলভারাজের সঙ্গে প্রতিবেশী একজনের ঝগড়া হয়েছিল। ঐ প্রতিবেশীটি একদিন রাতে আত্মীয়স্বজন নিয়ে এসে হামলা করে শেলভারাজের বৃদ্ধ পিতার ওপর। তাঁকে ঘর থেকে বাইরে টেনে এনে খুন করা হয়। তারপর মৃতদেহটাকে প্রকাশ্য রাজপথের ধারে ঝুলিয়ে দেয় তারা।

শেলভারাজ প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়ার ব্যাপার জেনেও নিজেকে এর সঙ্গে প্রথমে জড়াতে চায়নি। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা নৃশংসভাবে খুন হওয়ায় শেলভারাজ আর ঠিক থাকতে পারলো না। নিজের ভাই ও আরও পাঁচজনকে নিয়ে সে হত্যাকারীর বাড়ী আক্রমণ করলো এবং বাড়ীর ন'জনকেই দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয় শেলভারাজ।

ঘটনাটা দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শেলভারাজের সহযোগীদের মধ্যে তিনজন ধরা পড়ে পুলিসের হাতে। বিচারে তাদের ফাঁসির হুকুম হয়। আর শেলভারাজ ও তার ভাই সহ অন্যান্যরা এদিক ওদিক পা লিয়ে বেড়াতে থাকে।

দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়াও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠলো। কোন পক্ষই পুলিসের সাহায্য নিতে রাজী হলো না। মৃত ন'ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন শেলভারাজ, তার ভাই এবং অন্য দু'জনকে খুঁজতে লাগলো। শেষে একদিন সন্ধান পাওয়া গেলো শেলভারাজ ও তার সঙ্গীদের। তারা কোথায় লুকিয়ে ছিল সেটা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। শেলভারাজের ছোট ভাই-য় অন্য এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয় ছিল। সেই বাড়ীতেই তারা আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু সেই বাড়ীর কর্তা এই অবৈধ প্রণয়ের সম্পর্ক জানতে পেরেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং মৃত ন'ব্যক্তির আত্মীয়দের শেলভারাজদের গোপন আস্তানার খবরটা জানিয়ে দেন। তারা রাতে এসে পেট্রোল দিয়ে সেই বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনে শেলভারাজের ভাই ও তার অবৈধ প্রণয়ী মারা পড়ে। আর শেলভারাজ ও তার অন্য দুই সঙ্গী পালিয়ে যায় কোনক্রমে।

শেলভারাজ জমিজমা-বিষয় সম্পত্তি সব ফেলেই চলে এসেছিল। তাই

নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে সে ডাকাতি শুরু করলো একসময়। ভদ্রসমাজে গিয়ে যে সুস্থভাবে জীবিকা অর্জন করবে সেটা শেলভারাজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেন না, তাহলেই পুলিসের হাতে ধরা পড়তে হবে। ডাকাতির ক্ষেত্রে অবশ্য শেলভারাজ ভদ্রতা রক্ষার চেষ্টা করে চলেছিল।

অচিরেই শেলভারাজ দক্ষিণ ভারতের রবীনহুডে পরিণত হলো। সে বড়লোকদের টাকা লুঠ করে এনে গরীবদের খাদ্য যোগাতো। ধনী ব্যবসায়ী, জমিদার, বড় দোকানদারই ছিল তার শিকার। ডাকাতি করে যে অর্থ শেলভারাজ সংগ্রহ করতো তার খুব অল্পই নিজে রাখতো। বেশির ভাগটাই পঙ্গু, অন্ধ ও অসুস্থ গরীব মানুষকে দিয়ে দিতো। ফলে গরীবরা তাকে দেখতো ত্রাণকর্তার মতো এবং তাকে শ্রদ্ধা করতো, ভালো বাসতো। অন্যদিকে ধনীরা ও পুলিসের লোকেরা তাকে ঘৃণা করতো এবং ভয় পেতো।

এই সময়ে শেলভারাজের নাম পাল্টে গেল। অনেকটা আকস্মিকভাবে। লোকে তখন তাকে ডাকতো 'মাম্পটি ভায়া' বলে। অবশ্য তাকে এই নামে ডাকার কারণও ছিল। শেলভারাজের উপরের ঠোঁটটা এমন ভাবে তোলা ছিল যে মুখটি মাম্পটির মুখের মতো দেখতে। স্থানীয় ভাষায় মাম্পটি মানে বেলচা। শেলভারাজ সাধারণভাবে জঙ্গলেই থাকতো। তার এলাকা ছিল কোল্লেগাল জেলার পূর্বাংশে কাবেরী নদীর তীর থেকে শুরু করে সালেম জেলার দোদ্দাহাল্লা বা পাহাড়ের ওপরে চিনার নদী ও পেন্নাগ্রাম শহরের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত বেশ কয়েক মাইল জুড়ে।

সে যখন তখন উদয় হতো এবং যখন তখন অদৃশ্য হয়ে যেতো। উত্তর ভারতের চম্বল উপত্যকার কুখ্যাত ডাকাত মান সিং-এর মতোই দক্ষিণ ভারতের এই মাম্পটি ভায়া গরীবদের ভালোবাসা পেয়েছিল। পুলিস কখনোই তার গতিবিধির সঠিক খবর সংগ্রহ করতে পারতো না। বরং পুলিস জঙ্গলে হানা দিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে লোকে খবর পৌছে দিতো তার কাছে।

মাম্পটি ভায়ার অপারেশন ছিল খুবই সাধারণ ধরনের। তার অনুচর ছড়ানো থাকতো চারিদিকে। তাদের কেউ এসে খবর দিয়ে যেতো। আর রাতে অপারেশনে বেরুতেন স্বয়ং শেলভারাজ। বন্দুক ও ছোরা দেখিয়ে টাকা-পয়সা লুঠ করে নিয়ে আসতো সে।

অবশ্য তার আরও একটি কাজ ছিল। সেটা হলো তোলা আদায় করা। অর্থাৎ যারা কাঠ চুরি করতো তাদের ভয় দেখিয়ে সে পয়সা আদায় করতো।

এইসব কাঠচোররা রাতে লরী আর লোকজন নিয়ে জঙ্গলে আসতো। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে তা লরী বোঝাই করে ভোর হবার আগেই পালিয়ে যেতো। কিন্তু মাম্পটি ভায়ার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া চলতো না। ইঞ্জিন চালু করে লরীড্রাইভার রওনা হওয়ার আগেই মাম্পটি ভায়া বন্দুক নিয়ে গিয়ে হাজির হতো। টাকা-পয়সা দিয়ে তবে লরী ছাড়তে হতো।

কিন্তু একদিন একটি লরীর ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করে টাকা না দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। মাম্পটি ভায়া ড্রাইভারকে কিছু না বলে গাড়ীর চারটি টায়ারই গুলি করে ফাটিয়ে দিল। তখন ড্রাইভার ভয়ে টাকা দিল। কিন্তু চারটি চাকাই ফেটে যাওয়ায় রাতের মতো সেখানে থেকে অপেক্ষা করতে হলো। কাঠগুলো লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেও বাঁচতে পারলো না। ধরা পড়ে গেল তারা সদলবলে এবং তাদের জেল হলো। আর লরীটা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই ঘটনার পর মাম্পটি ভায়ার সম্মান বেড়ে যায় দারুণ-ভাবে।

পুলিসের কাছে মাম্পটি ভায়া সম্পর্কে যে রিপোর্ট জমা হয়েছিল তা থেকে হিসাব করে দেখা যায় যে, বছরে মাম্পটি ভায়া গড়ে পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করতো। এই হিসাব ছাড়াও মাম্পটি ভায়া চালাকী করে এমন সব লোকের বাড়ীতে ডাকাতি করতো যারা বেআইনী কাজের সঙ্গে জড়িত। ফলে তাদের কোনদিনই পুলিসের সাহায্য নেওয়া সম্ভব হতো না।

মাম্পটি ভায়ার নিজের ওপর অগাধ আস্থা ছিল। প্রতিটি জায়গায় ডাকাতি করতে যেতো সে নিজে এবং একা। তার পরনে থাকতো খাঁকি রঙের শার্ট আর প্রায় ছেঁড়া হাফপ্যান্ট। কোমরে একটা বেল্ট ব্যবহার করতো সে। সেই বেলটের বাদিকে ঝোলানো থাকতো বড় একটা ছোরা। ডান দিকে থাকতো তলোয়ার। আর কাঁধে ঝুলতো একটা গুলির ছড়া। এছাড়া সব সময়ের সঙ্গী হিসেবে থাকতো চুরি করে সংগ্রহ করা পুরানো ধরনের পয়েন্ট বারো বোরের হ্যামারলেস বন্দুক। বেশীর ভাগ সময় মাথা খালি থাকতো। তবে মাঝে মাঝে জঙ্গলের চৌকিদারদের ফাঁকি দিতে নীল টুপি পরতো সে। মাম্পটি ভায়া এতসব কাজের মধ্যেও স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য করতে কিন্তু ভোলেননি কোনদিন। প্রায়ই সে তার বাড়ীতে স্ত্রীর কাছে যেতো। পুলিস মাঝে মাঝে তার খোঁজে মেচারীতে তার বাড়ীতে গিয়ে হানা দিতো। কিন্তু কখনোই

তাকে ধরতে পারেনি। একবার তো মাম্পটি ভায়া স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে গিয়েছিল সেখানে। সে চলে আসবার পরেই পুলিস ব্যাপারটা ধরতে পারে।

এই ঘটনার ঠিক একমাস পরে একদিন মেচারীর পথে দেখা গেলো একজন মানুষ সারাদেহ ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। পুলিসের সন্দেহ হলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং হাতে হাতকড়া লাগানো হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, সে একজন স্ত্রী লোক। পরে সেই স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে জানা যায় যে, মাম্পটি ভায়াই পুলিশকে ঠকানোর জন্য তাকে পাঠিয়েছিল।

এই ঘটনায় মাম্পটি ভায়ার দলের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। আইন শৃঙ্খলাকে থোরাই কেয়ার করে সে চলতে লাগলো। দেখা গেল, মাম্পটি ভায়া প্রকাশ্যে থানার প্রবেশ পথে একটা নোটিশ টাঙিয়ে আগে জানিয়ে দিয়েছিল যে এক সপ্তাহ পরে সে মেচারীতে ডাকাতি করতে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে দুই ওয়াগানভর্তি কনস্টেবলকে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করে সেখানে পাঠানো হয়। ডাকাত ধরতে যাতে তাদের কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য সমস্তরকম বর্ণনাও জানিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু দেখা গেলো বর্ণনানুযায়ী কেউই এলো না। তবে দুপুর বেলায় কনস্টেবলদের খাবার সময় একজন ভিখারী এসে জ্বালাতন শুরু করলো। ভিখারীটির এক চোখ কানা, মাথায় ও গালে চুলের চিহ্নমাত্র নেই। সে খাবারের জন্য এতই পীড়াপীড়ি শুরু করলো যে, কয়েকজন তাদের ভাতের থেকে কিছুটা তুলে দিল, কিন্তু অন্যরা তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলো।

কিছুক্ষণ পরেই একজন কনস্টেবল জানালো যে, তার টিফিন ক্যারিয়ারটি পাওয়া যাচ্ছে না। সকলেরই সন্দেহ হলো ঐ ভিক্ষুকই তাহলে ওটা চুরি করেছে। কেননা তাদের মতে ভিক্ষুক মানেই চোর। কি আর পাবে। এদিকে দু'টো দিন কেটেও গেল। কিন্তু তৃতীয় দিন সকালে সেই টিফিন ক্যারিয়ারটি পাওয়া গেল থানার প্রবেশ পথে। আর সেটা খুলে পাওয়া গেল একটা চিরকুট। টিফিন ক্যারিয়ারটি না বলে ধার করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। নীচে মাম্পটি ভায়ার সই।

শোনা যায়, এই ঘটনায় পুলিসী কর্তারা এত ক্ষেপে গিয়েছিলেন যে, মাম্পটি ভায়াকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে আনার জন্য ৩০০ জন সশস্ত্র পুলিশকে জঙ্গলে পাঠানো হয়েছিল। ৫০ জনের করে একটি দল তৈরী করা

হয়েছিল। তারা বিভিন্ন পথে জঙ্গলে প্রবেশ করেছিল মাম্পটি ভায়াকে ধরতে। কর্তৃপক্ষ আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন জীবিত ধরবারই চেষ্টা করা হয়। কেননা, ঐ টিফিন ক্যারিয়ারটার ঘটনার ঠিক কয়েকদিনের মাথাতেই একটা জমিদার বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছিল। আর ডাকাত জমিদারের বন্দুকটা নিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য গুলি ছিল না বন্দুকটার। পুলিশের ধারণা, গুলি সংগ্রহ করা ডাকাতের পক্ষে সম্ভব হবে না।

কিন্তু পুলিশ যখন জঙ্গল তন্ন তন্ন করে মাম্পটি ভায়াকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন সে পালিয়ে এসেছে শহরে। শহরের একটি সিনেমাহলে সে ছবি দেখতে ঢুকলো। অর্দ্ধেক ছবি দেখার পরেই সে এসে উপস্থিত হলো টিকিটঘরে এবং ছুরি দেখিয়ে ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে সব টাকা ছিনিয়ে নিলো। কিন্তু ক্যাশিয়ার অনেক অনুনয় বিনয় করলো যে. এতে তার চাকুরী খোয়া যাবে; এমনকি জেলও হয়ে যেতে পারে। কেননা, কর্তৃপক্ষ এই টাকা লুঠের কথা বিশ্বাস নাও করতে পারেন। ডাকাতটি তখন এক টুকরো কাগজ নিয়ে তাতে লিখে দিলো যে মাম্পটি ভায়া টাকা লুঠ করে নিয়েছে। আর পাঁচটি টাকা ক্যাশিয়ারকে দিয়ে বললো, ঘটনাটা যেন মালিককে জানিয়ে দেয় এবং হৈ-চৈ বাধাব আগেই সে যেন কাছের কোন হোটেল থেকে কিছু খেয়ে নেয়।

ঠিক তার পরদিনই সকালে ডাকাতটা ওখান থেকে এগারো মাইল দূরে উত্তাইমালাই-এ একটা দোকানে হানা দিয়ে ৬৩ টাকা ছিনিয়ে নেয়। সেই সময় ডাকাতটার মাথায় ও গলায় জড়ানো ছিল একটা মাফলার এবং গায়ে ছিল একটা ওভারকোট। আর দোকানদার যাতে না চেচায় সেজন্য সে তরোয়ালটা থাপ থেকে বের করে দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু এই সময় পেন্নাগ্রামের একটা লোকের মাথায় বুদ্ধি এলো যে ডাকাত ধরিয়ে দিলে সে পুলিসের কাছ থেকে বড় পুরস্কার পাবে। লোকটা সালেম শহরের জেলখানার পাহারাদার ছিল। চাকুরী থেকে কি কারণে বরখাস্ত হবার পর সে গ্রামের বাড়ীতে অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছিল। মাম্পটি ভায়াকে যে পুলিশ খুঁজছে সে কথা সে গ্রামে এসে জানতে পেরেছিল। তাই সে ভাবলো একটু চালাকির আশ্রয় নিয়ে ডাকাতটার সঙ্গে দেখা করে তার বিশ্বাসী অনুচর হলে কেমন হয়। আর কিছুদিন পরে পুলিসকে সব জানিয়ে তাকে ধরিয়ে দিয়ে পুরস্কার আদায় করা যাবে সহজেই। বুদ্ধিটা জব্বর। লোকটা এও ঠিক করলো যে, পুলিসের সঙ্গে আগেই শর্ত করে

নেবে যে ডাকাতটিকে হাতে নাতে ধরিয়ে দেবে কিন্তু পরিবর্তে তাকে তার পদে পুনর্বহালের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সেই বরখাস্ত পাহারাদারটি কাজে নেমে পড়লো। সে জানিয়ে দিল যে পুলিসের ওপর সে ভীষণ চটে গিয়েছে। ডাকাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেও ডাকাতি শুরু করবে। একথাও সে জানিয়েছিল যে সালেম জেলার ব্যবসায়ী আর জমিদারদের টাকা কিভাবে সহজে হাতড়ানো যায় সে সব বলে দেবে। খবরটি যথাসময়ে ডাকাতটির কানে গিয়ে পেঁছুলো। সে একজন অনুচর মারফত যোগাযোগ করলো পাহারাদারটির সঙ্গে। প্রাথমিক একটা কথাবার্তা হলো প্রথম দেখায়। ঠিক হলো পরের দিন রাত দশটার সময় পেন্নাগ্রাম থেকে আট মাইল দূরে একটা গোয়ালঘরে তারা গোপনে মিলিত হবে। পাহারাদারটি ভাবলো এটাই বোধ হয় স্বর্ণ সুযোগ। সে তাড়াতাড়ি পুলিসকে খবরটা জানিয়ে দিল। পুলিসও তৈরী হয়ে রইল। তবে কথা হলো যে, পাহারাদারটা একটা হাতকড়া নিয়ে যাবে এবং সেটা সে ডাকাতটার হাতে লাগিয়ে দেবে। তারপর পুলিস ঠিক সাড়ে দশটায় গিয়ে হাজির হবে।

পরদিন যথাসময়ে ডাকাতটার সঙ্গে মিলিত হলো পাহারাদারটি। কিন্তু বেচারী পাহারাদার। তার ভাগ্য এমনই খারাপ যে, তাকে যে হাতকড়াটা দেওয়া হয়েছিল সেটা পাথরের গায়ে লেগে টুং করে আওয়াজ করে উঠলো। মাম্পটি ভায়ার কানকে ফাঁকি দিতে পারলো না সেই শব্দ।

ডাকাতটি সরাসরিই প্রশ্ন করলো পাহারাদারটিকে, হাতে তোমার কি? লোহার মতো শব্দ হলো যে?

পাহারাদারটি দেখলো বিপদ, ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই সে আর কোন কথা না বলে ঝাঁপিয়ে পড়লো ডাকাতটার ওপর। দু'জনেই দারুণ শক্তিশালী, বেশ কিছুক্ষণ ধরে চললো ধস্তাধস্তি। কেউ হার স্বীকার করতে রাজী নয়।

এক সময় সেই পাহারাদারটি মাম্পটি ভায়ার ওপর চেপে বসলো এবং গলা চেপে ধরলো। মাম্পটি ভায়া সুযোগ খুঁজছিল। হঠাৎ পীঠের কাছে একটা পাথরের টুকরো লাগলো। সেটাই তুলে নিয়ে সে সোজা পাহারাদারটির মাথায় মারলো। ফলে লোকটি মুহূর্তের মধ্যে অচেতন হয়ে পড়লো। মাম্পটি ভায়া উঠে দাঁড়ালো এবং তরোয়ালটা বের করে সোজা পা তুলে লোকটার বুকের ওপর দাঁড়ালো। কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে

প্রতিআক্রমণ করতে চাইলো, তখন মাম্পটি ভায়ার তরবারি গিয়ে পড়লো তার হাতের ওপর। তিনটি আঙ্গুল কেটে বেরিয়ে গেল। পাহারাদারটি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো।

ঠিক সেই সময়ই পুলিসের গাড়ীর আওয়াজ পেল ডাকাতটি। আর সামান্যতম দেরীর অর্থ ধরা পড়া। তাই ডাকাতটি দ্রুত বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই ঘটনার পর থেকে মাম্পটি ভায়া খুব সতর্ক হয়ে গেল। মাস চারেকের জন্য সে জঙ্গল থেকে চলে গেলো। ধর্মপুরী ও কৃষ্ণগিরি সহরে গিয়ে আস্তানা পাতলো সে। চললো, চুরি ডাকাতি।

চারমাস পর পুরানো কর্মক্ষেত্রে ফিরে এলো সে। তার মধ্যে দেখা গেল নাটকীয় পরিবর্তন।

এইসময়ে পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট তার পরিবারের সঙ্গে এক রবিবার পিকনিক করতে জঙ্গলে আসেন। তারা জীপগাড়ীটা কিছুটা দূরে রেখে হোগেনাইকাল জলপ্রপাতে স্নান করতে যান। কিন্তু স্নান সেরে এসে দেখেন গাড়ীতে যে ক্যামেরাটা রেখে গিয়েছিলেন সেটা নেই। তারা দেখতে পেলেন গাড়ীর গায়ে চক দিয়ে পাঁচবার লেখা রয়েছে 'মাম্পটি ভায়া—ডাকাতদের রাজা'।

আমি মাঝেমধ্যে যখন এইসব অঞ্চলে ভ্রমণ করতে গিয়েছি তখন মাম্পটি ভায়া সম্পর্কে এমনি ধরণের নানা গল্প শুনেছি। তার জীবনের প্রথম দিক্‌কার ঘটনাগুলো শোনার পর আমার মনে একটা অদ্ভুত মায়ার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু যখন তার চুরিডাকাতির কথা ক্রমাগত কানে আসতে লাগল তখন তার সম্পর্কে আমার সমস্ত ধারণা ভেঙ্গে গেল। বরং সে যে একজন বদমায়েস সেটাই আমার মনে গেঁথে বসলো। তবে পুলিসের কাছে বারে বারে তার অসীম সাহস, রসবোধ ও অসামান্য শৌর্যের কথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য কেমন যেন কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

একদিন আমি বন্ধুদের নিয়ে হোগেনাইকালে মাছ ধরবার জন্য গিয়েছি। দেখলাম শান্ত ও নিস্তব্ধ গ্রামটায় কেমন যেন একটা চঞ্চলতা। সকলের মধ্যে উত্তেজনাও বেশ। জানা গেল, মাম্পটি ভায়া নাটকীয়ভাবে আবার হানা দিয়েছে।

ঘটনাটা ছিল এইরকম, কিছুদিন আগে মাদ্রাজ সরকার জলপ্রপাতটার

উজানে নদীর বুকে একটা বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব কিনা তা সরেজমিনে অনুসন্ধান করবার জন্য একজন ইঞ্জিনীয়ারকে সেখানে বহাল করেন। তারই নেতৃত্বে সেখানে বিভিন্ন পরীক্ষানীরিক্ষা চলছিল। বাঁধ যেখানে নির্মান করা হতে পারে এমন একটা জায়গায় একটা ক্যাম্পও করা হয়েছিল। সেখানে ছিল প্রায় শতাধিক কর্মী। এদের মাইনে দেবার জন্য একটা ছোটখাটো অফিসও খোলা হয়েছিল, নিযুক্ত হয়েছিল সপ্তাহ শেষে মাইনে দেবার জন্য একজন কেরানী।

একদিন মাম্পটি ভায়া গিয়ে হাজির মাইনে দিত যে লোকটি তার কাছে। লোকটির কাছে দু'সপ্তাহের টাকা ছিল। ডাকাতটা প্রথম সপ্তাহের মাইনের টাকায় হাতও দিল না, বরং পরের সপ্তাহের জন্য যে টাকাটা ছিল সেই ৩৫০ টাকা নিয়ে সে চলে গেল।

কিন্তু এই অল্প টাকায় খুশী হতে পারলো না সে। তখন একমাইল দূরে উত্তাইমালাই-এ মৎস বিভাগের পরিদর্শকের বাড়ী গিয়ে সে হাজির হল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জানালো বনবিভাগের চৌকিদার সে, গাছ চোরদের সম্পর্কে বিশেষ খবর এনেছে। পরিদর্শকটি দরজা খুলে মাম্পটিভায়াকে দেখেই তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল। মাম্পটভায়া তখন তরবারী বের করে ভয় দেখালো। পরিদর্শকটি হাতের কাছে যে টাকা ছিল তাই দিয়ে তবে ডাকাতটাকে বিদায় করলো।

আমি এই দুটি ঘটনা শোনার পর প্রথমে মৎস বিভাগের পরিদর্শকের সঙ্গে দেখা করলাম। তারপর দেখা করলাম ঐ ইঞ্জিনীয়ার-এর সঙ্গে। কথা বললাম সেই মাইনে দেবার কেরানীটির সঙ্গেও। তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম আমি আগে যা শুনেছি এরা সেই একই কথা বললো।

অবশ্য সেই মুহূর্তে আমি ডাকাতটা সম্পর্কে যত না আগ্রহী ছিলাম তার চেয়ে বেশী আগ্রহী হয়ে পড়েছিলাম বাঁধটা সম্পর্কে। কেননা, এখানে বাঁধ নির্মানের অর্থ উজানের দিকে হাজার হাজার একর জঙ্গল বন্যায় ধ্বংস হয়ে যাবে আর ভাটির দিকে গড়ে উঠবে শহর। মনে মনে শঙ্কিত হলাম যে, উত্তাই-মালাইতে গত বিশ বছর ধরে যে কুঁড়ে ঘরটিতে আমি থেকেছি সেটা সমেত গোটা গ্রামটাই জলের তলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তাই ইঞ্জিনীয়ারটির কাছে বাঁধটি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানতে চাইলাম। তিনি আমার আগ্রহের উত্তরে জীপে করে সব ঘুরিয়ে দেখাতে চাইলেন।

দিন ঠিক হয়ে গেলো। আমি আর ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকটি ছাড়াও সঙ্গে চললো একজন পাহারাদার। পাহারাদারটির হাতে পুলিসের রাইফেল। মাথায় চুলের চিহ্ন নেই, কোমরের পাশ দিয়ে জড়িয়ে ধুতি পরা, গায়ে খাকি হাফশার্ট। পায়ে মোজা ছাড়া পুলিসের বুট।

গাড়ী যেতে যেতে আমি লোকটির সঠিক পরিচয় জানতে চাইলাম। ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোকটি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, মাম্পটি ভায়া আক্রমণ করতে পারে আশঙ্কায় জঙ্গলের পথে কাজে যাবার সময় পাহারাদার হিসেবে আমার পাশে পাশে থাকার জন্য পুলিসের এই লোকটিকে পাঠানো হয়েছে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা বাঁধ যেখানে নির্মিত হবে সেই জায়গায় এসে পৌছলাম। জীপ থেকে নেমে নদীর পাড় ধরে কখনও পাথরের উপর দিয়ে কখনও নরম বালির উপর দিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম। আমি সশস্ত্র পুলিসটিকে ডাকাতটি সম্পর্কে দু'চারটি প্রশ্ন করলাম। সে আমার প্রশ্নের উত্তরে বললো, 'যদিও আমি একজন সরকারী কর্মচারী তবুও বলবো সরকার বোকাদের নিয়ে তৈরী।' সে আরও বললো, তার হাতের হাস্যকর অস্ত্রটার মতো একটা অস্ত্র দিয়ে ইঞ্জিনীয়ারের মতো গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষকে মাম্পটি ভায়ার মতো বদমায়েস লোকের হাত থেকে রক্ষা করতে পাঠানো সৌখিনতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি তখন হাতের অস্ত্রটা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। পাহারাদারটি থুতু ফেলে একটু ব্যঙ্গ করে হাসলো। কাঁধ থেকে রাইফেলটা নামিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললো, 'এটা বাইরে থেকে রাইফেলের মতো দেখতে ঠিকই, কিন্তু আসলে এটা বন্দুক।'

আমি অস্ত্রটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম। একটা পয়েন্ট ৪১০ শটগান এটি, কাঠের কাঠামোটি পুলিশের পয়েন্ট ৩০৩ রাইফেলের মতো দেখতে। পাহারাদার পুলিশটি বেল্টের সঙ্গে লাগানো চামড়ার ব্যাগ থেকে গোটা দশেক গুলি বের করে আমার হাতে দিল।

পুলিশটি ক্ষোভের সঙ্গে বললো, 'সরকার মনে করেছে যে মুরগী মারার এই বন্দুকটা দিয়ে আমি মাম্পটি ভায়ার মতো জাঁদরেল ডাকাতকে ঘায়েল করবো।'

সে খানিকক্ষন থেমে আবার বলা শুরু করলো, এই গুলিগুলোর গতিও খুব বেশী নয়। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর পর্যন্ত যায়। সুতরাং ডাকাতটা পঞ্চাশগজ

দুরত্বের বাইরে বসে আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারবে, আমি তাকে কিছুই করতে পারবো না। সে তখন ইচ্ছে করলেই আমাদের দেহ গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিতে পারে।

আমি মুখটা গম্ভীর করে বললাম, 'আচ্ছা, যদি মাম্পটি ভায়া ঐ পাহাড়টার আড়াল থেকে দেখা দেয় তখন তুমি কি করবে?'

আমার কথা শুনে সে চমকে গেল। ভয়ার্ত চোখে পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগলো, 'মহোদয়গণ, আমি সাধারণ ছাপোষা মানুষ। ঘরে আমার বউ ও ছ'টা বাচ্চা। কোলেরটা এখনো মায়ের দুধ খায়। যদি ডাকাতটা এখন এসে হাজির হয় তাহলে আমি এই বন্দুকটা ফেলে রেখে পালাবো। এজন্য অপরাধ নেবেন না।'

তার কথা শুনে আমরা দু'জনে জোরে হেসে উঠলাম। সে বুঝতে পারলো তার বোকামি। আমি তখন তাকে বললাম যে, সকলকে তুমি জানিয়ে দাও মাম্পটি ভায়া নামের বিপজ্জনক মানুষটির সঙ্গে এণ্ডারসন সাহেব দেখা করতে চান।

এই ঘটনার পর তিন চারমাস কেটে গেল। চিনার নদী যেখানে কাবেরী নদীর সঙ্গে মিশেছে তারই বারো মাইল উজানে চিনার নদীর তীরে আমার বারো একরের একখণ্ড জমি আছে। আমি সেখানে কয়েকদিন থাকবো বলে তাঁবু ফেললাম। আমার পুরোনো বন্ধু শিকারী রঙ্গাকে আমি এই জমিটাতে চাষ বাস করার জন্য থাকতে দিয়েছিলাম। সেখানে তার একটা কুঁড়ে ছিল। সে সেই কুঁড়েতে আমাকে থাকবার জন্য অনুরোধ করলো ভীষণভাবে। সে বললো, 'কাছাকাছি একটা পাগলা হাতি আছে। সে রাতে আপনার তাবুটা দেখলেই ছুটে আসবে এবং ঘুম ভাঙবার আগেই আপনাকে পায়ের তলায় পিষ্ট করে ফেলবে।'

আমি সপ্রশ্ন চোখে তাকালাম তার দিকে। বললাম, পাগলা হাতি? কতটা পাগলা? কই বনবিভাগ এরকম কোন জানোয়ারের কথা আমায় জানায় নি তো!

রঙ্গা বললো, সময়টা গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। চারিদিকে সব কিছু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। চিনার নদীতে তখন এক বিন্দুও জল নেই। চারিদিকে শুধু বালি আর বালি। এই সময়ে হাতিদের এই অঞ্চলে থাকার কথা নয়। তখন একমাত্র কাবেরী নদীতে জল থাকে। তাই হাতিদের সেখানে থাকার কথা—।

এই পর্যন্ত বলা হওয়ার পরই আমি তাকে বললাম, তুমি কি ঠিক জানো ?

আমার দৃষ্টি থেকে রঙ্গা চোখ ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। তবে আর কোনরকম সন্দেহ না রেখে সে স্পষ্টই বললো যে, 'এখানে মাস্পটি ভায়া আছে। গতরাতে সে এখানে এসে দেখা করে গেছে। তাকে আমি ভালো করে চিনি। আপনি যদি আমার সঙ্গে কুঁড়েতে থাকেন তাহলে সে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু যদি একলা তাঁবুতে থাকেন তাহলে সে আপনার ক্ষতি করতে পারে।'

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। বললাম, 'রঙ্গা, তুমি একটা দারুন খবর শোনালে। আমি এই বিশেষ প্রকৃতির লোকটির সঙ্গে আলাপ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে'ছিলাম। তুমি এখুনি তাকে আমন্ত্রন জানিয়ে এসো। সোজা যেন আমার তাঁবুতে আসে। আমি তার সঙ্গে দেখা করবো।'

আশ্চর্য হয়ে গেল রঙ্গা। সে খানিকটা তাচ্ছিল্যভাবে বললো, 'আমি যাব না। আমি কি ডাকাতের বন্ধু ?'

আমি বললাম, 'তুমি তাই। ভয় নেই। আমি কাউকে বলবো না।'

জমিটার যেখানে আমি সাধারণতঃ প্রতিবার এলে তাঁবু ফেলি এবারও সেখানটায় তাঁবু খাটালাম। সে রাত্রে প্রায় দশটা পর্যন্ত রঙ্গার সঙ্গে কথা বলে ঘুমোতে গেলাম। রঙ্গা তার কুঁড়েতে ফিরে গেলো। আমি আলো না জ্বালিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। কেননা আলো থাকলে মশার উৎপাত বেশী হয়। আর চাঁদের আলোর তীব্রতা ছিল বেশ ফলে সবই দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট ভাবে। ডাকাতটার কথা চিন্তা করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। চোখটা একটু খুলতেই দেখলাম, তাঁবুর প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মানুষের মূর্তি। চাঁদের আলোতে মূর্তিটি আলোকিত। দেখলাম সে তার শটগানটি আমার দিকে তাক করে রেখেছে। তার ছেঁড়া প্যান্টের ওপরে ছেঁড়া খাকি হাফসার্টটা ঝুলে রয়েছে। কোমরের বেল্টের সঙ্গে ঝুলছে লম্বা একটা তরোয়াল। একপাশের কাঁধ থেকে ঝুলছে গুলির ছড়াটা। অন্যকাঁধে চামড়ার কেসে একটা বায়নোকুলার ঝুলছে। একটা ওড়না দিয়ে মাথাটা পাগড়ীর মতো করে বাঁধা থাকলেও তার মোটা গোঁফজোড়া আমি স্পষ্টই দেখতে পেলাম। পায়ে তার রাবারের একজোড়া জুতোও রয়েছে।

চোখদুটো পুরো না খুলে পিটপিট করে তাকে দেখলাম। এবার হাত

দিয়ে চোখ দুটো রগড়াতে লাগলাম। সে তখনও নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে। আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রাত তখন দু'টো।

আনন্দে উঠে বসলাম। অভিবাদনের ভঙ্গীতে বললাম, 'শুভ রাত্রি, মাম্পটি ভায়া। তোমার সঙ্গে দেখার করার ইচ্ছে আমার বহুদিনের।'

কিন্তু ডাকাতটি কর্কশ স্বরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'সাহেব, আমার কথা বলার সময় নেই। আমি আমার কাজ সারতে এসেছি। একদম পালাবার চেষ্টা করবেন না, চেঁচাবেনও না। আপনি এখুনি তাঁবুর বাইরে যান। আমি আপনার বন্দুক রাইফেল ও টাকাপয়সাগুলো চাই। এগুলো দিতে যদি কোন আপত্তি করেন তবে আমি আপনাকে খুন করতে বাধ্য হবো।'

আমি তাব কথা শুনে হতাশ হলাম। কোথায় তার সঙ্গে একটু কথা বলবো তা না হয়ে গোটা ব্যাপারটাই বিপরীত হয়ে গেলো। আমি যেখানে বসেছিলাম সেখানেই বসে রইলাম। গম্ভীর স্বরে বললাম, 'মাম্পটি ভায়া আমি তোমার দুঃসাহসিক কার্যকলাপের কথা শুনে অবাক হয়েছি। তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করে আছি বহুদিন ধরে। তোমার সব কাজ যে ভালো লাগে তা নয়, তবে তোমাকে আমি সাহসী বলেই জানি। অথচ এখন দেখছি তুমি কাপুরুষ, ধাপ্পাবাজ।'

সে রাগে গজগজ করতে লাগলো। মুখ বিকৃত করে বলে উঠলো, 'সাহেব আমাকে বেশী ঘাঁটাবেন না, তাহলে—'

আমি মনের জোরে তাকে বাধা দিলাম, যদিও আমার তখন ভয়ে গলার স্বর বন্ধ হবার উপক্রম। আমি বললাম, 'দেখ, তুমি আমার জিনিসগুলো নিয়ে চলে যেতে পারো না। কেননা, তুমি ভালোভাবেই জানো যে, তুমি আমায় ঠকাচ্ছ। আমাকে গুলি করে মারবার সাহসও তোমার নেই। তুমি যদি ডাকাতি করতে গিয়ে কোন সাহেবকে হত্যা করো তাহলে সরকার তোমাকে ছেড়ে দেবেন না। বরং সৈন্যদল পাঠিয়ে তোমাকে যেভাবেই হোক ধরবেনই। এছাড়া আমি অনেক আশা করেছিলাম যে, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবো। কিন্তু তা আর হলো না। তুমি আমাকে হতাশ করলে।'

আমরা দু'জনেই মিথ্যে কথা বলছিলাম। কিন্তু ভয় আমাকে রীতিমতো জড়িয়ে ধরেছে। কেননা, লোকটা যে এর আগে অনেক লোককে খুন করেছে সেটা আমি জানি। তাই ভাবলাম, সে কি আমায়ও গুলি করে হত্যা করবে নাকি ঐ তরোয়ালটা দিয়ে মাথাটা কেটে ফেলবে?

আমি যে ধাপ্পা দিচ্ছি সেটা সে বুঝতে পেরেছিল, তবে সে ভেবেছিল যে, আমি তার ধাপ্পাটা পুরোপুরিই ধরতে পেরেছি। পরমুহূর্তেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

মাম্পটি ভায়া তার বন্দুকটা মাটিতে রেখে তার উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো। তারপর সে মৃদুস্বরে বললো, 'সাহেব, আপনি অদ্ভুত ধরনের লোক বটে। আপনি আমার মনের মতো লোক। আমি এই প্রথম আপনার মতো লোক দেখলাম যে আমার কাছে দয়া চাইলো না।' মাম্পটি ভায়া তখনো বলে চলেছে, 'আপনাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে, আপনি আমাকে ধরিয়ে দেবার বা আমার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করবেন না। আপনি আমাকে কথা দিন, আমাদের আজকের এই রাতের আলাপের কথা কাউকে জানাবেন না। এমনকি আমাদের বন্ধু রঙ্গাকেও নয়।'

আমি এবারে একটু স্বস্তি ফিরে পেলাম। বললাম, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি কেউ এ সম্পর্কে কিছুই জানবে না।' ঘর ছেড়ে দু'জনে বাইরে এলাম। সুন্দর চাঁদের আলোয় চারিদিকে একটা স্নিগ্ধতার পরিবেশ তৈরী হয়েছে। বললাম, 'এসো, আমরা দু'জনে আমাদের হাত মেলাই।'

ডাকাতটা তার বন্দুকটা মাটিতে রেখে আমার সঙ্গে হাত মেলালো। ছেঁড়া জামাপ্যান্ট পরা মারাত্মক রকমের একটা দস্যুর সঙ্গে এই নীল সাদা রঙের পায়জামা পরা শ্বেতাঙ্গটির, যার বুকটা তখনো ভয়ে ধড়াস ধড়াস করছে, করমর্দনের দৃশ্যটা যে আন্তরিকতার স্পর্শে কত প্রাণবন্ত তা যে কোন দর্শকের আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে।

আমরা মাটির উপরে বসে থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। প্রথম আলাপেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, বেচারা একজন সঙ্গী চাইছে, যার সঙ্গে প্রাণখুলে দুটো কথা বলা চলে। আমাকে পেয়ে সে মনের সব কথা বলতে লাগলো একের পর এক। তার গোটা জীবনের ইতিহাসটাই নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করলো। প্রথম প্রথম মনে হলো তার কথায় অহঙ্কার মিশে রয়েছে, কিন্তু যতই সে বলে যেতে লাগলো ততই লক্ষ্য করলাম তার কথার মধ্যে আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে। আমি স্পষ্ট বুঝলাম যে, তার জীবনে যা কিছু ঘটেছে সেজন্য সে অনুতপ্ত, দুঃখিত। আমি তার কথায় অবাক হয়ে গেলাম এবং সাধ্যমতো তাকে সাহায্য করতে চাইলাম।

একসময়ে সে তার গল্প শেষ করলো। দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে

রইলাম। চাঁদের আলোয় তার মুখটা উজ্জ্বল লাগছিল। আমিই নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠলাম, 'মাম্পটি, একটা অন্যায়ের প্রতিবাদে আরেকটা অন্যায় করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কোনও দিন হয়নি, হবেও না। যা হোক, যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গিয়েছে। আমার ধারণা তুমিও তার জন্য অনুতপ্ত। তাই না?'

ডাকাতটা নীরবে মাথা নীচু করেই ঘাড় নেড়ে আমার কথায় স্বীকৃতি জানালো।

আমি তখন তাকে বললাম, 'তুমি এই অন্যায় পথ ত্যাগ করো। তবে তোমার বৈষয়িক স্বার্থের খাতিরে তোমার পক্ষে এই পথ ত্যাগ করা সম্ভব হবে কিনা সেটা আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু তুমি নিজেই ভেবে দেখো, তোমার অপরাধের জন্য ফাঁসি তোমার অনিবার্য। তুমি যদি আমার পরামর্শ চাও তাহলে আমি বলবো তুমি এই ডাকাতি-দস্যুবৃত্তির পথ ছেড়ে দাও। তাছাড়া, তোমার বিরুদ্ধে প্রতিটি লোক…।'

আমার এই কথা শুনে মাম্পটি প্রবলভাবে বাধা দিলো। সে উত্তেজিত ভাবে বললো, 'সাহেব, আমার যে বন্ধুবান্ধবও আছে সে কথাটা ভেবে দেখেছেন কি? এই যে এতগুলো লোক আমার খবরাখবর এনে দেয়, যারা আমাকে পুলিশের গতিবিধির খবর জানিয়ে সাহায্য করে তাদের কথা বাদ দিচ্ছেন কেন? আপনি কি জানেন তারা আপনার সম্পর্কেও আমাকে জানিয়েছিল?'

তারপর সে একটা সত্যি কথা আমার কাছে ফাঁস করলো। সে বললো, 'ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের দেহরক্ষী হিসেবে যে পুলিসটা কাজ করছিল সে আরেকটা পুলিসকে জানিয়েছিল, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। সেই পুলিসটাই আমাকে খবরটা জানিয়ে দিয়েছিল। আপনি খুব অবাক হচ্ছেন তাই তো? না, অবাক হবার কিছু নেই। যে পুলিসটি আমাকে খবর দিয়েছিল তার বাবার আমি বন্ধু ছিলাম। তাই সে তার সহকর্মী পুলিসদের গতিবিধিও আমাকে সবসময় আগাম জানিয়ে দিতো। অবশ্য রঙ্গাও আমার একজন ভালো বন্ধু।'

আমি তাকে তখন অন্যভাবে বোঝার চেষ্টা করলাম। বললাম, 'মাম্পটি, তোমার কি মাঝে মাঝে নিজেকে একা মনে হয় না? লোকের সঙ্গে মেশার ইচ্ছে তোমার মনে কি আলোড়ন তোলে না? এমন একজন লোককেও কি

তোমার মন চায় না যাকে তুমি মন খুলে সব বলতে পারো, যেমন আমাকে বললে। তুমি বিশ্বাস করে এমন কতজন লোককে তোমার মনের কথা বলতে পারো?'

সে উৎসাহী হয়ে বললো, 'হ্যাঁ, সাহেব, নিজেকে সবসময়ই একা মনে হয়। মনে হয় যেন কত দুঃখী আমি। কিন্তু আমার কোন উপায় নেই। কি করবো, বলুন!'

লোকটা যে অন্তর দিয়ে কথাগুলো বলে গেলো সেটা আমি বুঝতে পারলাম। তার সামনে যে সমস্যা বর্তমান তার কথা ভেবে আমি মনে মনে বেশ ভীত হলাম। তাই চুপচাপ নিজের মনে চিন্তা করতে লাগলাম। হঠাৎই যেন সমস্যা সমাধানের একটা সূত্রও পেয়ে গেলাম।

তাঁকে বললাম, 'মাম্পটি ভায়া তুমি এক কাজ করো। আজ রাতেই সোজা কাবেরী নদীতে চলে যাও। সেখানে গিয়ে তোমার বন্দুক, ছুরি, তরোয়াল, এমনকি চুরি করা বায়নোকুলারটা পর্যন্ত জলে ছুঁড়ে ফেলে দাও। তোমার জামাকাপড়গুলো পর্যন্ত রাখবে না। গোঁফ চুল সব কেটে ফেল। তবে জামাকাপড়গুলো জলে না ফেলে পুড়িয়ে ফেলাই ভালো। কেননা নদীতে ফেললে সেগুলো ভেসে উঠবে।'

'তারপর এই অঞ্চল থেকে সোজা নদী পেরিয়ে একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে যাবে ওরেগাঁও শহরে। সেখান থেকে নাক বরাবর চলে গেলে তুমি মাদ্রাজ প্রদেশের সীমান্ত পেরিয়ে মহীশূরে গিয়ে প্রবেশ করবে। ওখানকার পুলিশ তোমাকে চিনতেও পারবে না। মহীশূরে প্রবেশের পরই একটা সড়ক পাবে। সেটির ডানদিকে যে রাস্তাটি গেছে সেটি ধরে হেঁটে যাবে। সেই সঙ্গে লোকের কাছ থেকে কাঁকনহাল্লি শহরে যাবার রাস্তাটা জেনে নেবে। ঐ শহরের তেত্রিশ মাইল উত্তরে বাঙ্গালোর। আমি সেখানেই থাকি। তুমি বাঙ্গালোর পৌছে আমার সঙ্গে দেখা করো। আমি তখন তোমাকে আরও সাহায্য করবো।'

আমি তাকে এও বললাম যে এতটা রাস্তা হেঁটে যেতে অনেকদিন লাগবে। ঐ সময় দাড়িগোঁফ চুল গজাতে দিও না, সেগুলো কেটে ফেলো। রাস্তায় যেতে যেতে কাজ নেবার চেষ্টা করো। তা হলে কিছু টাকাও জুটবে এবং সুবিধেও হবে। যাবার সময় আমি তোমায় আমার বাঙ্গালোরের ঠিকানা দিয়ে যাব।

সে মৃদুস্বরে বললো, 'সাহেব, আমার অনেক টাকা পয়সা আছে। আপনি আপনার ঠিকানা লিখে দিয়ে যান, যাতে আমাকে সেখানে গিয়ে বেশী খোঁজাখুঁজি করতে না হয়।'

আমি তাকে বললাম যে, ঠিকানা লিখে দেওয়া সম্ভব নয়। তুমি যদি ধরা পড়ে যাও তাহলে আমার হাতের লেখা ঐ কাগজ দেখে পুলিশ আমাকেও সন্দেহ করবে। আমি বিপদে পড়বো। আমি বরং তোমায় ঠিকানাটা মুখে বুঝিয়ে বলে দেব।'

ডাকাতটি আমার কথায় রাজী হলো। আমি বললাম, 'আমার নাম এণ্ডারসন। সেখানে গিয়ে বলবে এণ্ডারসন সাহেবকে চাই। নাম যাতে না ভুলে যাও সেজন্য ওটা মুখস্থ করে ফেলবে।'

সে আমার নামটা কয়েকবার আওড়ে নিলো। আমি আবার বলতে শুরু করলাম, 'আমি যা যা বলছি তা ভালো করে মনে রাখবে কিন্তু! মহারানী ভিক্টোরিয়ার মূর্তির কাছে একটা যাদুঘর আছে তারই কাছাকাছি একটি বাড়ীতে আমি থাকি। তুমি বাঙ্গালোরে পেঁছে প্রথমেই ভিক্টোরিয়া মূর্তির খোঁজ করবে। সেখানে গিয়ে দেখবে যাদুঘরটা কোথায়। মূর্তি আর যাদুঘরের মাঝে যে কালো বাড়ীটা দেখবে সেটাই হলো আমার আস্তানা। কি মনে থাকবে তো? নামটা কিন্তু ভুলো না। আমি যা যা বললাম দিনে দু'বার করে তা মনে করার চেষ্টা কোরো তাহলেই আর ভুলবে না।'

মাম্পটি ভাঙ্গা শিশুর মতো আমার পা দুটি জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলো। তার বিশাল দেহটা তখন থরথর করে কাঁপছে।

সে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'সাহেব, আপনি আমার বাবা-মা। ত্রিভুবনে আপনিই আমার প্রকৃত বন্ধু। আপনাকে আমি কিছুক্ষণ আগেই মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম। এজন্য আমি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি। আপনি যা বলবেন সাহেব, আমি তাই করবো।'

আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু হঠাৎ আমিই যেন কেমন হয়ে গেলাম। আমার গলা কেমন যেন আটকে এলো। মাম্পটির মাথার পাগড়িটার কাপড়টা মাটিতে তখন লুটোপুটি খাচ্ছে।

আমি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তাকে তুলে দাঁড় করালাম। তার দুই কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'বন্ধু, আর সময় নেই। পাঁচটা বেজে গেছে।

তুমি চলে যাও। ঐ দেখ, চাঁদের আলো কমে এসেছে, সূর্যের রঙিন আভা ক্রমশঃ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। বন্ধু, সাহস সঞ্চয় করো। মনে বল আনো। আমার কথাগুলো মনে রেখো। নিজেকে আর ঠকিয়ো না। তুমি যতদিন না বাঙ্গালোর গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করছো ততদিন ভগবান তোমার সহায় হোন্ এই কামনা করি।'

মাম্পটি ভায়া চট্‌করে হাঁটু গেড়ে বসে আমার পা'দুটি চুম্বন করলো। তারপর আমাকে সেলাম জানিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আমি একা বসে রইলাম। দু' মিনিট পরেই আমার আদি ও অকৃত্রিম বন্ধু রঙ্গা এসে হাজির হলো।

সন্দেহ ভরা চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'মনে হচ্ছে সাহেবের কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি। চোখের নীচে কালো দাগ পড়েছে। মশার উপদ্রবেই সম্ভবতঃ ঘুম হয়নি, তাই তো?'

আমার তখন কোন কথাতেই ভালো লাগছিল না। তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'আমি ভালই ঘুমিয়েছি। আর তুমি তো জানো সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা আমার অভ্যেস।'

রঙ্গা একটু কেশে নিলো। তারপর নীরস গলায় বললো, হয়তো কাল রাতে আমি বেশী খেয়ে ফেলেছিলাম। আর তাই ভোর পর্যন্ত স্বপ্নই দেখে গিয়েছি। স্বপ্নে দেখলাম, চারিদিক জ্যোৎস্নার আলোতে উজ্জ্বল। দু'টো লোক চাঁদের আলোতে তাঁবুর সামনে বসে আছে। সাহেব, দু'জনের মধ্যে একজন আপনি নিজে। আর অন্যজনের পরনে ছিল খাকি জামা প্যান্ট ও কাঁধে বন্দুক। দু'জনে কথা বলতেই দারুণ ব্যস্ত ছিলেন। আচ্ছা সাহেব, স্বপ্ন খুব অদ্ভুত, তাই না?'

রঙ্গার কথা থেকে বুঝলাম সে প্রথম থেকেই আমাদের উপর লক্ষ্য রেখেছিল। আমি আচমকা মুখটা ঘুরিয়ে তার মুখের কাছে এনে দৃঢ়স্বরে বললাম, 'হাঁ, খুব অদ্ভুত ধরনের স্বপ্ন দেখেছ তুমি। কিন্তু স্বপ্ন তো স্বপ্নই। ও কিছু নয়। রঙ্গা, স্বপ্নটার কথা তুমি ভুলে যাও। আর এই স্বপ্ন নিয়ে কোন কথা বলো না। তুমি যদি এই স্বপ্নের কথা আমাকে বা অন্য কাউকে বলো তাহলে জানবে তোমার সঙ্গে আমার পঁয়ত্রিশ বছরের বন্ধুত্বের অবসান ঘটবে।'

সে দ্রুত স্বর বদলে হাসি মুখ করে বললো, 'সাহেব, আমি কাল রাতে কোন স্বপ্নই দেখিনি। কালরাতে আমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছি।'

আমি হাসতে হাসতে তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, তাহলে আমাদের বন্ধুত্ব ঠিক থাকছে। সেও আমার কথা শুনে একচোট হাসলো।

এই ঘটনার পর আস্তে আস্তে তিনমাস কেটে গেছে। আমি এইসময়ে মাঝে মাঝেই মাম্পটি ভায়ার কথা চিন্তা করেছি। এরপর একদিন দুপুরে আমি বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া সবে শেষ করেছি। এমন সময় কুকুরগুলো একসঙ্গে ডেকে উঠলো। আমার এ্যালসেশিয়ান কুকুরটা আকারে তার দশ ভাগের একভাগ হবে এমন একটা লোমশ অজ্ঞাতকুলশীল কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলো। কুকুরগুলো একটা ভিখিরিকে দেখেই অমন করে চেঁচাচ্ছিল। এই রকমের ভিখিরি অবশ্য ভারতে প্রায় সময়ই দোরগোড়ায় চোখে পড়ে। ভিখিরিটি একটি লাঠিতে ভর দিয়ে ঠিক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। মাথা কামানো, গোঁফ দাড়িও পরিষ্কার করে কামানো, পরনে ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো, পায়ে পুরানো ছেঁড়া জুতো এবং চোখে বড় গোল চশমা। গলায় তার তুলসীর মালা। কপালে সিঁদুর চন্দনের রেখা টানা।

সে খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার দিকে বড় বড় চোখ তুলে তাকালো। প্রায় তাচ্ছিল্যের সুরে জিজ্ঞেস করলো, 'সাহেব, বাড়ীতে কিছু ভিক্ষে পাবার আশা করা যায় কি ?'

ভিখিরিটির কথা শুনে আমার ভীষণ রাগ হলো। মনে হলো তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিই। আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। ভাবলাম, লোকটাকে খুব গালাগালি করবো। সে তখনও তার অহঙ্কারী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কাছে গিয়েই আমি লক্ষ্য করলাম, জুলপির কাছে একটা কাটা দাগ। বুঝতে কোন অসুবিধাই হলো না।

—আরে মাম্পটি ভায়া যে, কি খবর। সে বুঝতে পারলো যে এবার আমি তাকে চিনতে পেরেছি, তার দৃষ্টিতে তখন আর কোন অহঙ্কার নেই। সে খুশীতে ভরপুর হয়ে উঠলো। চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জলও বেরিয়ে এলো।

সেই সময়ে আমার ছেলে ডোনাল্ড বাড়ীতে ছিল না। এমনকি আমার স্ত্রীও বাড়ী ছিল না। একমাত্র চাকরটাই ছিল।

আমি মাম্পটিকে হাতের ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বলে চাকরটাকে চেঁচিয়ে ডাকলাম। চাকরটাকে বললাম, যাতো চট করে জেনে আয় যে, মাদ্রাজ থেকে মেল ট্রেন কখন আসবে। রেল স্টেশনটা আমার বাড়ী থেকে দু'মাইল

দূরে ছিল। অর্থাৎ মাম্পটির সঙ্গে আমি নিরিবিলিতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কথা বলার সময় পাবো।

ছোকরা চাকরটি চলে যেতেই মাম্পটিকে ঘরে নিয়ে এলাম। চা ও জলখাবারও সাজিয়ে দিলাম। জানতে চাইলাম, সে কিভাবে এখানে এসে হাজির হতে পারলো।

মাম্পটি বলার জন্য তৈরীই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'সাহেব আপনি যা যা বলেছেন আমি সেইমতই কাজ করেছি। বন্দুক, ছুরি ও তরোয়ালটা জলে ফেলে দিয়েছি, যদিও ওগুলো ফেলতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তারপর আপনার কথামতো পথ ধরে মহীশূর রাজ্যের সীমান্তে এবং শেষপর্যন্ত কাঁকনহাল্লিতে পৌঁছুই। সেখানে একজন জমিদারের কাছে শ্রমিক হিসেবে কাজ নেই। সাহেব, সেই জমিদার তার শ্রমিক-কর্মচারীদের যে কি নির্মমভাবে খাটিয়ে নেয় তা আর কি বলব! জমিদারের অত্যাচার কয়েকমিনিটের জন্য আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল মাম্পটি ভায়ার মূর্তিতে তাঁকে উচিত শিক্ষা দিতে! যদিও সেটা করিনি, তবে তখন থেকেই ঠিক করি যে, আর কারও কাছে কাজ নেব না।'

মাম্পটি ভায়া বলে চলেছে, পথে আসতে আসতে এক ভিখারী দেখেছি। তাদের একটা জিনিস আমার বিশেষভাবে নজরে পড়েছে যে, তারা প্রত্যেকে কোন না কোন ধর্মের আবরণে নিজেদের বেশ আটকে রেখেছে। তারা যে না খেয়ে রয়েছে এমন আমার কখনও মনে হয়নি। যে কোন ভাবেই হোক খাবার তাদের জুটেই যেতো। তাই আমিও তখন ঠিক করলাম যে সন্ন্যাসী হবো। এখন আমি আর মাম্পটি ভায়া নই। আমার নতুন পরিচয় ওমকৃষ্ণ। বেশ ভালোই খেতে পারছি। আমি এখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমনে বেরিয়েছি। ভাবছি মাদ্রাজ শহরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করবো।

"মাম্পটি" বলেই জিভ কামড়ে নিজেকে সামলে নিলাম। না, এখন আর ও নাম নয়। এখন তুমি তো ওমকৃষ্ণ। আমি তাকে বললাম, খবরদার মাদ্রাজ যাবে না। ওখানে পুলিশের কোন গুপ্তচর তোমার পাত্তা লাগাতে পারে। তার চেয়ে তুমি বরং উত্তর ভারতে যাও। হায়দ্রাবাদেও যেতে পারো। মনে রেখো, অতীতের কর্ম থেকে যতদূরে থাকবে ততই তোমার লাভ।

সে মুহূর্তের জন্য মাথা নীচু করে কি ভাবলো। তারপর বললো, 'সাহেব আপনি ঠিকই বলেছেন।'

এবার সে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। আমি তাকে কিছু টাকা দিতে চাইলাম পথের প্রয়োজনের জন্য। কিন্তু সে তা কিছুতেই নিতে রাজী হলো না। সে বললো, 'সাহেব আমি একেই আপনার কাছে ঋনী, আর সেই ঋণের বোঝা বাড়াবেন না। অতীত জীবনের সংগ্রহ থেকে আমি সঙ্গে করে একটি মাত্র জিনিস এনেছি। সেটি আপনাকে দিয়ে যেতে চাই।'

সে তার ছেঁড়া পোষাকের ভিতর থেকে হাতড়ে হাতড়ে একটা সোনার আংটি বের করলো।

আমি বললাম, 'এটা আবার কোথা থেকে চুরি করেছ?'

'আমি এটা চুরি করিনি, সাহেব। উত্তাইমালাইতে যে ইঞ্জিনীয়ার লোকটি বাঁধ তৈরীর কাজ তদারক করতে গিয়েছিলেন তার কাছ থেকেই এটা পেয়েছি।' আংটিটা কিভাবে সে পেয়েছিল সেই ভেবে একচোট হেসে উঠলো। তারপর বলতে শুরু করলো সেই কাহিনী।

'একদিন নদীর ধার দিয়ে ইঞ্জিনীয়ার লোকটি হেঁটে যাচ্ছিলেন, সঙ্গে তার একজন পুলিস দেহরক্ষী ছিল। বোকা পুলিসটার কাছে রাইফেলের মতো দেখতে সামান্য একটা বন্দুক ছিল। ওরা জানতো না যে, এই অস্ত্রটার আসল রূপটা আমি জানি।'

এই বলে সে আরও একবার হেসে উঠলো। তারপর বললো সেই কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা।

'আমি একটা পাথরের আড়াল থেকে তাদের ওপর নজর রেখেছিলাম। পাথরটার কাছ দিয়ে যাবার সময় আমি পুলিসটাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, সে যদি আমাকে বাধা দিতে আসে তাহলে তাকে হত্যা করবো। এই শুনেই পুলিসটা বন্দুক ফেলে সোজা দৌড় লাগালো। আমি তখন ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের কাছে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু তিনি একটুও ভীত হলেন না। বরং পুলিসটির পালিয়ে যাওয়া দেখে হেসে উঠলেন। আমি পুলিসের সেই বন্দুকটা জলে ফেলে দিয়ে কঠিন স্বরে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের কাছে সব টাকা পয়সা চাইলাম। তখন ইঞ্জিনীয়ার সাহেব গম্ভীর স্বরে যা বললেন তাতে তো আমি অবাক। তিনি বললেন, মাম্পাটি ভায়া, ভয় দেখিও না। ভদ্রভাবে চেয়ে নিতে শেখ। এই বলেই তিনি দশটি টাকা ও আঙ্গুলের আংটি-টি খুলে দিলেন। ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের অসামান্য ব্যবহার ও সাহসিকতা দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁকে তাই সেগুলো ফেরত নিতে বললাম। কিন্তু

তিনি রাজী হননি। আমি আংটিটা বেশ কিছুদিন ব্যবহার করেছিলাম কেননা, ওটা বিক্রি করতে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। এই ঘটনাটি ঘটেছিল আপনার সঙ্গে দেখা হবার অনেক আগে।'

সে কিছুক্ষণ থেকে আবার বলতে লাগলো, 'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি আর ডাকাতি করিনি, সাহেব। আর আংটিটা আমি আপনাকে দেব বলে নিয়ে এসেছি।'

কিছুক্ষণে পরেই ওমকৃষ্ণ বিদায় নিল। এরপর একটা বছর কেটে গেছে। কিন্তু মাম্পটি ভায়ার কোন খবরই জানতে পারিনি বা শুনিনি। অথচ অনেকবারই তার কথা আমার মনে হয়েছে। আমি তাকে তার পুরানো আস্থানাগুলোতে খুঁজেছিলাম অনেকবার। কিন্তু কোনবারই কিছু জানতে পারিনি। কেউ তাকে আর দেখতেও পায়নি। সবার চোখের সামনে থেকে সে যেন কেমন ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু একদিন সারা দেশে সোরগোল পড়ে গেল। খবরের কাগজে ছাপা হলো: মাম্পটি ভায়াকে হত্যা করা হয়েছে। নিহত হয়েছে তার এক বন্ধুও। হত্যাকারী মাম্পটি ভায়ার মাথার জন্য মাদ্রাজ সরকার যে পুরস্কার ঘোষণা করেছিল সেটা দাবি করেছে বলেও সংবাদে লেখা হয়েছে। আমার মনে পড়ে গেল ঘোষণাটার কথা। জীবিত বা মৃত যেভাবেই হোক মাম্পটি ভায়াকে ধরিয়ে দিতে পারলে মাদ্রাজ সরকার পাঁচশ টাকা ও পাঁচ একর জমি পুরস্কার দেবেন।

কিভাবে মাম্পটি ভায়াকে হত্যা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে নানা গল্প চালু আছে। কেউ কেউ বলেন, সে তার পত্নীকে দেখতে গিয়েছিল। কারো কারো মতে, সে তার খুব প্রিয় উপপত্নীকে দেখতে গিয়েছিল। পত্নীই হোক আর উপপত্নীই হোক, শেষপর্যন্ত সেই স্ত্রীলোকটি বিশ্বাসঘাতকতা করে। স্ত্রীলোকটির নাকি এক ভাই ছিল, বাজারে তার প্রচুর দেনা। তাই দেনা মেটানোর প্রয়োজনে স্ত্রীলোকটিকে দিয়ে সে মাম্পটি ভায়াকে হত্যা করায়। মাম্পটি ভায়ার খাবারের সঙ্গে শক্তিশালী রাসায়নিক বিষ ফলিডল মিশিয়ে দেয় স্ত্রীলোকটি। আর সেই খাবার খেয়েই মাম্পটি ভায়ার মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়। তখন লোকটি গুলি করে মাম্পটি ভায়াকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়। কেননা, পুরস্কার ঘোষণার সঙ্গে যে কথা বলা হয়েছিল তা হলো, ডাকাতটাকে যে জীবিত অবস্থায় ধরে আনতে পারবে বা নিজের জীবন বাঁচাতে গিয়ে

ডাকাতটাকে হত্যা করেও নিয়ে আসবে তাকেই পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার কোন কথা ঘোষণায় ছিল না।

শোনা যায়, পুরস্কারটা সেই লোকটি পেয়েছিল। আর পুলিশও মাম্পটি ভায়ার মৃতদেহটি ধর্মপুরীতে নিয়ে এসে প্রায় এক হাজার লোকের সামনে সমাধিস্থ করেছিল।

এবার আমি আপনাদের যে গল্পটা বলবো সেটা একটা জানোয়ারকে নিয়ে। না, এর সঙ্গে কোন যাদু বা কোন ডাকাতের যোগাযোগ নেই। এবারের কাহিনী একটি হাতিকে নিয়ে। হাতিটি ছিল অস্বাভাবিক প্রকৃতির এবং দল থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

বনের ভেতর দিয়ে একদিন গাড়ীতে করে যাচ্ছি। আন্নাইকুট্টিতে বনবিভাগের যে বাংলো আছে তার ঠিক মাইল দুয়েক আগে এবং কিছুক্ষণ আগে যে পুরানো মন্দিরটার কথা বলেছি তার মাইল দশেক পরে একজায়গায় আমি প্রথম হাতিটাকে দেখতে পাই। আমাদের গাড়ীর পঞ্চাশগজ দূরে মাঠের মধ্যে হাতিটা, ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার চলাফেরায় এতটুকু অস্বস্তি নেই। আমাদের গাড়ীটাকে সে ভ্রুক্ষেপও করলো না। ভাবটা এমন যে মাইল খানেকের মধ্যে সে ছাড়া আর কেউই নেই। আমাদের গাড়ীটা লোকজনে ভর্তি ছিল। তাতে বেশকিছু সখের ফটোগ্রাফারও ছিল।

আমি গাড়ীর পেছনে ডানদিকে বসেছিলাম। গাড়ী চালাচ্ছিল আমারই এক বন্ধু। বাকী সবাই বিদেশী পর্যটক, ভারতের জঙ্গল দেখতে এসেছেন। এই বিদেশীদের একজন, যিনি আগে সার্কাসে ও চিড়িয়াখানায় হাতি দেখেছিলেন, গাড়ী থেকে হঠাৎ নেমে পড়লেন। আমাদের হুঁশিয়ারি অগ্রাহ্য করে হাতিটার দিকে এগিয়ে গেলেন। বেশ কিছু ছবি নিলেন তিনি হাতিটার। তারপর হাতিটাকে ভয় দেখানোর জন্য প্রথমে চেঁচিয়ে উঠলেন এবং পরে পাথর ছুঁড়তে লাগলেন। প্রথম পাথরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। কিন্তু দ্বিতীয়টা একটা গাছের ডালে লেগে গিয়ে পড়ে হাতিটার পিঠের ওপর। তৃতীয় পাথরটা শুঁড়ের নীচে মুখের ওপর লাগলো।

কিন্তু এতেও হাতিটা ভয় পেল না। আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে নিকটবর্তী একটা গাছের আড়ালে গিয়ে ফের আমাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে

রইলো। তার মুখের ভাব এমনই যে সে বলতে চাইছে, কে বাপু তোমরা, একটু শান্তিতে থাকতে দিতে পারো না?

হাতিটার এই ধরণের ব্যবহারে আমরা সত্যিই অবাক হলাম। পাথরের আঘাতেও সে বিরক্ত হলো না। দলছুট পুরুষ হাতির এমন আচরণ তো ভাবাই যায় না। আমার প্রথমে ধারণা হয়েছিল, হাতিটা ক্ষেপে গিয়ে আক্রমণ করবে এবং ভদ্রলোক অতি সাহসের পরিণতিতে বেঘোরে প্রাণটা খোয়াবেন। অবশ্য গাড়ীশুদ্ধ লোকেরই প্রাণ যেতে পারতো। তাছাড়া বুনো হাতিকে রাগিয়ে দিয়ে পরে নিজেকে বাঁচাতে গুলি করে তাকে হত্যা করা রীতিমতো আইন বিরুদ্ধও।

আমরা শেষে অনেক কষ্টে সেই ভদ্রলোককে গাড়ীতে তুলে অন্যত্র যাত্রা করলাম। ফেরবার সময় ঐ একই রাস্তা দিয়ে ফিরছিলাম। আর মনে মনে ভাবছিলাম, হাতিটাকে আবার দেখতে পাব কিনা। ঠিক এমন সময় এক ফার্লং দূরে রাস্তার একধারে হাতিটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। বন থেকে সংগ্রহ করে আনা ডালপালা থেকে সে পাতা চিবিয়ে খাচ্ছে। আমরা গাড়ীটা থামালাম হাতিটাকে দেখবো বলে।

হাতিটাকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে দেখলাম। নিখুঁত তার দেহ। তার পায়ে এমন কোন আঘাত দেখলাম না যা তার এইরূপ অস্বাভাবিকতার কারণ হতে পারে। আর একটা জিনিস আমাদের নজরে এলো যে, হাতিটা বেশ বুড়ো। তার কানের ওপরকার ভাঁজ ও কপাল বসে যাওয়া থেকেই আমরা এটা বুঝতে পেরেছিলাম।

এবারও সেই বিদেশী পর্যটক ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে হাতিটার দিকে পাথর ছুঁড়তে লাগলেন। আমাদের মনে তখন আশঙ্কা, এবার নিশ্চিত কোন অঘটন ঘটবেই।

কিন্তু এবারও হাতিটা কিছু করলো না। নির্বিকারভাবে সে গাছের পাতা খেয়ে যেতে লাগলো। তার এই অস্বাভাবিক প্রকৃতির কোন কারণই আমি উদ্ঘাটন করতে পারলাম না। পোষা হাতিও এমন নির্বিকার হয় না। কেননা পোষা হাতি যদিও কিছু করতো না কিন্তু নিশ্চিতভাবেই সেই স্থান পরিত্যাগ করতো।

আমাদের সঙ্গীটি কিন্তু কোন কিছুতেই নিরস্ত হতে রাজী নন। একসময় চেঁচিয়ে আমাদের জানালেন যে, তিনি হাতিটার কাছে যাচ্ছেন। আমি মনে

মনে ভাবলাম, লোকটা পাগল নাকি। আমরা সকলে তখন গাড়ী থেকে নেমে তাকে বাঁধা দিলাম। এবং টানতে টানতে গাড়ীতে নিয়ে এলাম। হাতিটার কিন্তু তখনো এ ব্যাপারে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

ভদ্রলোক তখনও চেঁচিয়ে চলেছেন। তিনি বললেন, আরে রেখে দিন আপনাদের ভারতীয় হাতির কথা, ওগুলো তো তুচ্ছ খরগোসের মতো শান্ত। সেদিন রাতে খাওয়া দাওয়ার সময় সবাই হাতিটাকে নিয়েই আলোচনা করতে লাগলেন। আমাকে এমন সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো যে সেগুলোর উত্তর দেওয়া একরকম অসম্ভব। পুরুষ হাতিটা কেন এমন আশ্চর্য্যজনক ব্যবহার করলো—সকলের মনে সেটাই প্রশ্ন। অবশ্য একটা জুতসই উত্তর খুঁজে বের করবোই—এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই বিছানায় শুতে গেলাম।

পরদিন সকালে প্রাতঃরাশ সেরেই বেরিয়ে পরলাম। দু'জন কারুম্বা পথ প্রদর্শককে সঙ্গী হিসেবে নিলাম। আমার সঙ্গে রইলো রাইফেল। জীপে চড়ে সোজা হাজির হলাম গতকাল যেখানে হাতিটিকে দেখেছিলাম সেই জায়গাটায়। গাড়ীটাকে দাঁড করিয়ে হাতিটা যে পথ ধরে বনের মধ্যে চলে গেছে সেদিকে এগুলাম। কারুম্বারা সঙ্গে থাকায় বেশ সুবিধে হয়েছিল। আন্নাইকুট্টি নদীকে নিশানা ঠিক করে প্রায় আধমাইল হেঁটে যাবার পর হাতিটাকে দেখতে পেলাম। একটা গাছের তলায় হাতিটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

কারুম্বারা অবশ্য সতর্ক হয়ে হাঁটতে লাগলো। কিন্তু আগের দিনের অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখে আমি সোজা হাতিটার দিয়ে এগিয়ে গেলাম। জংলী লোকদুটো বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে হাঁটছিল, যাতে বিপদ দেখে পালাতে পারে। আগের দিন সেই বিদেশী পর্যটক ভদ্রলোক যতটা পর্যন্ত হাতিটার কাছাকাছি গিয়েছিল, আমি ঠিক ততটাই এগিয়ে গেলাম। কিন্তু এবারও হাতিটা কোনরকম কিছু করলো না। বরং চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

সাহস করে তখন হাতিটার চারপাশ একবার ঘুরে এলাম। আমার ধারণা হলো যে, হাতিটা সম্ভবতঃ আহত নয়তো অসুস্থ। অন্ধ হওয়াও বিচিত্র নয়। আবার বধিরও হতে পারে। সম্ভবতঃ তাই তার ঘ্রাণশক্তি নেই। এগুলোর যে কোন একটি যে হতেই হবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

আমি আরেকবার হাতিটার চারপাশ ঘুরলাম। দেখলাম, সে চোখ দুটো পিট্‌পিট্ করে আমাকে দেখছে। তবে চোখে কোন রাগ নেই। বুঝলাম

হাতিটা অন্ধ নয়। এমন সময় দেখলাম, হাতিটা তার শুঁড়টাকে বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দিকে। আমার এবার বুঝতে কষ্ট হলো না যে, হাতিটার ঘ্রাণশক্তিও রয়েছে।

তাহলে তার ত্রুটিটা কি? সে তার শুঁড়টাকে এবার ওপর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিল এবং সোজা মুখে পুরে দিল। হাতিটা যদি আহত বা অসুস্থ হতো তাহলে এমন স্বচ্ছন্দে চিবিয়ে খাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হতো না। হাতিটাকে দেখে একটা জিনিষ বোঝা গেছে, সেটা হলো সে খুব বয়স্ক।

আমি যখন হাতিটাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলাম তখন আমার সঙ্গী কারুম্বা দু'জন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়েছিল। তাদের একজন চেঁচিয়ে বললো, "সাহেব, বিজ্ঞ প্রভুটি (কারুম্বারা সাধারণতঃ ঐ নামেই হাতিকে চিহ্নিত করে) খুবই বুড়ো। পৃথিবী থেকে ছুটি নেবার সময় হয়ে এসেছে। তাই সে শান্তিতে মরতে নদীর ধারে এসেছে।"

সেদিন আর কিছু ঘটলো না। অগত্যা ব্যাপারটার ইতি টেনে আমিও তাঁবুতে ফিরে এলাম। কিন্তু ফেরার পথে আখ বোঝাই গাড়ী দেখে আসার পথে হাতিটাকে আরেকবার পরীক্ষা করার কথা মনে হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটা ছ'ফুটের মতো লম্বা দেখে আখ কিনে নিলাম।

পরদিন সকালে তিনজন কারুম্বাকে নিয়ে আবার আন্নাইকুট্টি গেলাম। সেখানে গিয়ে হাতিটার যাবার পথ লক্ষ্য করে কিছুটা এগিয়ে যাবার পর আন্নাইকুট্টি নদীর ধারে তাকে দেখতে পেলাম। হাতিটা একটা গাছের ছায়ায় নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

আমি খুব সন্তর্পণে এগুতে লাগলাম। একজন কারুম্বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আমার পীড়াপীড়িতে দু'টুকরো আখ নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে এগুতে লাগলো। হাতিটার কাছাকাছি যেতেই সে মুখ ঘুরিয়ে একেবারে আমাদের মুখোমুখি দাঁড়ালো। আমি তখন বাঁ হাতে দু'টুকরো আখ ও ডান হাতে রাইফেলটাকে বাগিয়ে হাতিটার দিকে এগুতে লাগলাম। হাতিটার চোখের হাবভাব থেকে বুঝেছিলাম যে, সে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতেই আগ্রহী।

আমি হাতিটার খুব কাছাকাছি যেতেই সে ভয় পেয়ে গেল। শুঁড়টাকে বাঁচানোর জন্য গুটিয়ে নিল। ভয়ে কানদুটোকে একবার বাইরের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আবার টেনে মাথার সঙ্গে লাগাতে লাগলো। ঠিক যেন কুলোর মতো

হাওয়া করতে লাগলো। ইঙ্গিতটা নিশ্চিতভাবেই ভয়াবহ। তাহলে কি হাতিটা আক্রমণ করবে?

কিন্তু অল্প সময় বাদেই হাতিটা শান্ত হয়ে গেল। কয়েকমিনিট অপেক্ষা করে আমিও কয়েক পা এগিয়ে আখের একটি টুকরো বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে। হাতিটা এক ঝটকায় আমার হাত থেকে আখটি নিয়ে নিলো। তারপর সেটিকে মাটিতে ফেলে আছড়াতে লাগলো। আমি বুঝলাম সে এখন কি করবে তাই ভাবছে। আখগুলো কি মুখে পুরবে? নাকি সে তার এলাকায় অনুপ্রবেশকারী হিসেবে আমাকে আক্রমণ করবে?

শেষপর্যন্ত দেখলাম সতর্কতার সঙ্গে একটি আখের টুকরো মুখে পুরলো। সে এমনভাবে আখ চিবোচ্ছিল যে, মনে হলো কোনদিন সে আখের মিষ্টি স্বাদ পায়নি। তার চোখে শত্রুতার কোন চিহ্ন নেই। তবে ভয়ের চিহ্ন তখনও রয়েছে।

প্রথম টুকরোটি খাওয়া হয়ে গেলেই আমি দ্বিতীয় একটি টুকরো বাড়িয়ে দিলাম হাতিটার দিকে। মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সে সেটিকে নিয়েও চিবোতে লাগলো।

বাকী আখের টুকরোগুলো নিয়ে কারুস্বা দু'জন কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা আর এগুতে চাইছিল না। আমি তখন সেগুলোকে নিয়ে এসে একের পর এক আখের টুকরোগুলো হাতিটাকে দিতে লাগলাম। সেও নিশ্চিন্তে সেগুলো খেয়ে নিলো। বুঝলাম আমার সঙ্গে হাতিটার একটা বন্ধুত্ব তৈরী হয়েছে তাহলে।

পরদিন আমি একুশ মাইল দূরে গুনলুপেটে গেলাম। সেখান থেকে একগাড়ী বোঝাই আখ কিনলাম। ফেরার পথে আমি আমার পুরানো বন্ধু মুদুমালাই সংরক্ষিত বনের রেঞ্জ অফিসার মিঃ চন্দ্রনের সঙ্গে দেখা করলাম। মুদুমালাই বনের কাছাকাছি এলাকাতেই সেই হাতিটা তার শেষজীবন কাটাচ্ছে। আমি মিঃ চন্দ্রনকে হাতিটার কথা বললাম। তিনি তো সব শুনে অবাক। তিনি এও বললেন যে, তার সুদীর্ঘ চাকুরী জীবনে এমন গল্প আর কখনও শোনেননি। তবে তিনি দুবছর আগের একটা ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিলেন।

সেবার আমি, মিঃ চন্দ্রন ও আমাদের একজন জার্মান বন্ধু—এই তিনজনে মিলে গাড়ীতে করে মুদুমালাই সংরক্ষিত বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। বনের

মধ্যে একটা সংকীর্ণ রাস্তা ধরে আমরা যখন বাঁক নিচ্ছি তখনই একটা দাঁতালো হাতির একেবারে ঘাড়ে গিয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। হাতিটা রাস্তার ওপর বাঁশের ঝাড় ভেঙ্গে এনে মনের সুখে খাচ্ছিল। হঠাৎ আমাদের দেখে হাতিটা জীপটার দিকে তেড়ে এলো। আমাদের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। কেননা, সংরক্ষিত সেই বনে অস্ত্র প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। অগত্যা আমরা তখন ভগবানের নাম জপ করছি।

হাতিটা গাড়ীর একেবারে সামনে এসে ইঞ্জিনের ঢাকনাটার উপর শুঁড়টা দিয়ে সপাং করে একবার মারলো। আর কিছুই করলো না। আস্তে আস্তে সে গাড়ীর সামনে থেকে চলে গেলো। আমরা সকলে মিলে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। তবে আমি গাড়ী থেকে নেমে যেই রাস্তার মাঝে পড়ে থাকা বাঁশগুলো সরাতে গেলাম অমনি আমায় হাতিটা তেড়ে এলো।

আমি তখন তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে বসলাম। হাতিটাও বাঁশগুলোকে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলো। তখন আমরা তাকে আর না ঘাঁটিয়ে সেখান থেকে চলে এসেছিলাম।

আরও আগে এমনি ধরণের একটা ঘটনা ঘটেছিল। মি চন্দ্রন শোনালেন সেই কাহিনী। একদিন তিনি একদল পর্যটককে নিয়ে সেই একই গাড়ীতে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। ড্রাইভারও সেই একই লোক। বনের মধ্যে জীপের শব্দে ভয় পেয়ে একটা বাচ্চা হাতি রাস্তায় এসে পড়ে। তাকে অনুসরণ করে তার মা'ও এসে হাজির হয়। বাচ্চা হাতিটার একেবারে কাছাকাছি আমাদের দেখে তার মা তো রেগে আগুন। সে তখন শুঁড় দিয়ে গাড়ীটাকে উল্টে দেয় এবং বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে যায়। সম্ভবতঃ বাচ্চাটাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবার অভিপ্রায়ের কারনেই হাতিটা আর বেশী কিছু করেনি।

এসব ঘটনার তুলনায় আন্নাইকুট্টির বৃদ্ধ পুরুষ হাতিটার অনুগত স্বভাব অনেক বেশী আশ্চর্যজনক।

আমি পরদিন বেশ কিছু আখ সঙ্গে নিয়ে বনের মধ্যে হাজির হলাম। কিন্তু সেদিন হাতিটা মাত্র দু'টুকরো আখ খেলো।

তার পরের দিন আমার বিশেষ কাজ থাকায় আর যাওয়া হয়নি। চতুর্থ দিন কয়েকজন কারুম্বাকে সঙ্গে নিয়ে আখসহ বনের মধ্যে সেই নির্দিষ্ট জায়গায় গেলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি সেখানে হাতিটা নেই। অবশ্য সঙ্গী

কাঙ্গমরা আমাকে জানালো যে, মৃত্যুর জন্ত হাতিটা কোথায় যেতে পারে। তাদের মতে, নদীর আটমাইল উজানে বিরাট যে জলাশয় আছে সেখান-টাতেই হাতিটাকে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

তাই আমরা তখন সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। হাতিটাকে দেখতেও পেলাম সেখানে। হাতিটা জলাশয়ের মধ্যে কাত হয়ে শুয়ে পড়েছিল এবং ডুবে মরবার জন্ত শুড়শুদ্ধ মুখটা জলের তলায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। তবে তার বিরাট দেহের খানিকটা জলের উপরে ছিল। তাই দেখেই আমরা হাতিটাকে চিনতে পেরেছিলাম।

হাতিদের মৃত্যুটা বড় অদ্ভুত। বয়স যখন তাদের খুব বেশী হয়ে যায়, যখন আর প্রতিদিন খাদ্য সংগ্রহ করে খাবার ক্ষমতা থাকে না তখন হাতিরা নিজের ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে। তবে কোথায় গিয়ে কেমন করে মৃত্যুবরণ করে সেই রহস্যের সন্ধান এই ঘটনার মধ্যে দিয়েই জেনেছিলাম।

৪

আমার জীবনে আমি এমন অনেক মানুষের সঙ্গে মিশেছি যাদের কথা কোনদিন ভোলা সম্ভব নয়। ভোলা সম্ভব নয় তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই। তবে এই সব মানুষগুলোর অধিকাংশ অরণ্যবাসী—এদের মধ্যে যেমন রয়েছেন ভারতীয়, তেমনি রয়েছেন ইঙ্গ-ভারতীয় কিংবা খাঁটি ইউরোপিয়ান। আমার তো ধারণা, অরণ্য মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে যথেষ্ট সহায়ক। অরণ্যে যত দীর্ঘ সময় বাস করা যায় ততই ব্যক্তিত্ব স্বচ্ছতা লাভ করে। এইরকম একটি চরিত্র হলো আমার বন্ধু হাগি হেইলস্টোন। উত্তর কোয়েম্বাটোর জেলার এক কোনে তালাইমালাই নামে জায়গার কাছে মুদিয়ানূরে একটি সুন্দর বাড়ীতে সে বাস করতো। বাড়ীটা সে-ই তৈরী করেছিলো। নাম দিয়েছিল সেটির 'ময়ার উপত্যকার খামারবাড়ী'। জায়গাটা ময়ার নদী থেকে খুব একটা দূরে নয়। আর এই ময়ার নদীই উত্তর কোয়েম্বাটোরকে নীলগিরি বন বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

হাগির চরিত্রের তুলনা মেলা ভার। সে নিজেই তার তুলনা। আমি যে স্কুলে পড়তাম সেও সেই স্কুলে পড়তো। তবে পাশ করে গিয়েছিল সে আমার আগে। তখন থেকেই সে বিভিন্ন ধরণের জীবিকা গ্রহণ করে এসেছে। সত্যি কথা বলতে কি তার তুখোর বুদ্ধি ছিল। সে যে জিনিষকে স্পর্শ করেছে সেটাই সোনা হয়েছে। এইসব অর্থের কিছু দিয়ে সে জঙ্গলের একটা বিরাট অংশ কিনেছে এবং তার উপর তৈরী করেছে 'ময়ার উপত্যকার খামার বাড়ী'।

আগ্নেয়াস্ত্রের একটা মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে হাগির। টাকা দিয়ে যতরকমের বন্দুক কেনা যায় সবই তিনি কিনেছেন। তবে তার মনপসন্দ ছিল পয়েন্ট ৪২৩ মশার রাইফেল। এই রাইফেলের ব্যারেলটা বহুশিরবিশিষ্ট। আমার যতদূর মনে পড়েসে বলেছিল যে, এটা দিয়ে একটা হাতি এবং ২০টিরও বেশী বাঘকে গুলিবিদ্ধ করেছে সে। আমার ছেলে ডোনাল্ডকে হাগির খুব পছন্দ হয়েছিল। সে তাকে ঐ রাইফেলটি উপহার দিয়েছিল। রাইফেলটি

পেয়ে ডোনাল্ড খুব খুশী হয়েছিল। রাইফেলটি হাগির খুব প্রিয় ছিল বলেই উপহারটির মূল্যও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। খোলাখুলি বলতে গেলে আমি এটা ভাবতেও পারি না যে আমার প্রিয় পুরানো পয়েণ্ট ৪০৫ রাইফেলটি কাউকে দিয়ে দেবো। কেননা, গত ৪০ বছরেরও বেশী সময় ধরে যে সেটা আমার বিশ্বস্ত সঙ্গী!

আমার গল্পের ঘটনাস্থল যেখানে সেখানে এমন এক ধরণের ঘাস হয়, যার কাণ্ডগুলো শুকিয়ে গেলে দেশলাই কাঠির চেয়েও শক্ত হয়, অথচ অত সহজে ভাঙ্গা যায় না। হাগি এই বিশেষ ধরণের ঘাসের কথা শুনেছিল বা দেখেছিল। সেই ঘাসগুলো সহজে ভাঙ্গে না ঠিকই, কিন্তু জলতে থাকে খুব সহজে। হাগির মাথায় এসেছিল যে সে এই ঘাসের চাষ করে একটা দেশলাই কারখানা তৈরী করবে। আর এই উদ্দেশ্যেই ময়ার উপত্যকায় খামারবাড়ী তৈরী করে সে ঐ বিশেষ ধরণের ঘাসের চাষ করার পরিকল্পনা নেয়। এই বিশেষ ঘাসের তৈরী দেশলাই-এ খরচ পড়বে যেমন প্রায় অধেক তেমনি এটা হবে অনেক উন্নত মানের।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। প্রচুর পরিমাণে বীজ যোগাড় করলো সে। তারপর বর্ষার শুরুতে প্রথম বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই জমিতে ভালো করে লাঙ্গল দিয়ে সেই বীজগুলো ছড়িয়ে দিল। বৃষ্টির জল পেয়ে তড়তড়িয়ে ঘাসগুলো বেড়ে উঠলো। বহু একর জায়গা জুড়ে শুধু খাস আর ঘাস। জমিটাও ছিল উর্বর। ফলে অল্পদিনেই ঘাসগুলো পাঁচ ছ'ফুট লম্বা হয়ে উঠল। আমার মনে পড়ে, ঐ ঘাসগুলোকে মৃদুমন্দ বাতাসের ছন্দে তাল মিলিয়ে ঢেউ তুলতে দেখেছি। কিন্তু হাগির এই ঘাস থেকে দেশলাই কাঠি তৈরী হবার আগেই সেখানে এসে ভিড় জমালো হরিণ, বিশেষ করে চিতল হরিণের দল। পালে পালে বন্য শূয়রও এসে ঘাসের বনে আশ্রয় নিল। হরিণের দল ঘাসগুলো মহাআনন্দে খেতে শুরু করলো। আর শূয়রেরা সেটাকে তাদের আস্তানা তৈরী করলো। শূয়রের দল চারিদিকে নালী কেটে গোটা ঘাসবনের বারোটা বাজিয়ে ছাড়লো। শুধু তাই নয়, সংখ্যায় শূয়রের দল বাড়তেও লাগলো। তখন হাগি প্রকৃতপক্ষে ভাবতে শুরু করলো যে, দেশলাই কাঠি তৈরীর ব্যবসা আঁকড়ে ধরে রাখবে নাকি হ্যাম ও বেকনের প্রতিষ্ঠান খুলে বসবে।

এদিকে হরিণ ও শূয়রের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোকে খাবার আকর্ষণে এলো বাঘ ও চিতাবাঘ। চিতাবাঘের চেয়ে বাঘই বেশী এল এবং তারা এসেছিল

এত সংখ্যায় যে তারা হরিণ ও শূয়রদের নির্বংশ করার পর চিতাবাঘের উপরও তাদের থাবা ফেললো। ফলে চিতাবাঘগুলো ঘাসের বন ছেড়ে পালানোই সবচেয়ে ভালো মনে করে বিদায় নিলো।

হাগির একজন সহকারী ছিল। তার নাম সুইজা। ডিসুজারই অপভ্রংশ। ভারতের পশ্চিম উপকূলের ম্যাঙ্গালোরের লোক সে। সুইজা এক অর্থে খুব গুণী লোক। সে হাগির জন্য সবই করে দেয়। তার প্রয়োজন কোন্ কোন্ জিনিষের সেগুলোই যে শুধু সুইজা জানতো তাই নয়, ভবিষ্যতে কি প্রয়োজন হতে পারে তাও জানতো সে।

একবার সে আমার কাছে তাঁর প্রভু সম্পর্কে বলেছিল, "আমি জানি না কর্তা অঢেল টাকা বিনিয়োগ করে আরও টাকা করতে চান কেন? ভোগ করে যাবার মত যথেষ্ট টাকা তো কর্তার আছেই। তা নয়, টাকা খরচ করে তাঁর দেশলাই কাঠি তৈরী করা চাই। বাবুল গাছের ছাল থেকে দাঁতের মাজন তৈরী করা চাই। হাতির গোবরের সঙ্গে জংলী গাছের বীজ মিশিয়ে সার তৈরী করা চাই। মাটির তলায় জল আছে কিনা তা বুঝবার উপায় বার করা চাই। এক ধরনের পাথর, কর্তা যাকে আকরিক লোহা বলেন, তা বার করবার জন্ত মাটি খোঁড়া চাই। এরকম আরও কত কি! এত টাকা খরচ, কিন্তু কিসের জন্ত? এটা বেশ ভাল জায়গা। কর্তার উচিত উপভোগ করা। এখানে প্রচুর মেয়েও পাওয়া যায়, যুবতী মেয়ে। বুড়ো স্বামীগুলো এখানে নেই। কর্তাকে যখনই বলি, কর্তা তো দারুণ রেগে যান। তিনি বলেন— "সুইজা, তুই দারুণ বদমাস। তোর একটা বউ রয়েছে আরও তিনটে মেয়ে যোগাড় করেছিস তুই। আমি তোকে একটা বিয়ে করার হাত থেকে বাঁচিয়েছি। তুই এখন আমাকে সেই বিপদে ফেলতে চাস।"

কিন্তু এই সুইজা লোকটা ছিল খুবই ভাল। যে কোন কাজে ছিল সে সমান উৎসাহী এবং সরিসার মত তেজ সম্পন্ন। আর খেতও সে বেশ। তার বিরাট পেটটা এবং মুখে খুশির হাসি লেগে থাকা দেখেই তা বুঝা যেত।

একবার ইষ্টারের সময় সুইজার মনে হল তার এবং তার প্রভুর এ সময় হরিণ ও শূয়রের ঝলসানো মাংস খাওয়া উচিত। হাগিকে সে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ করে প্রভুর সরু নলের রাইফেলটা চেয়ে নিল। এবং শিকারের খোঁজে দেশলাই ঘাসের বনের মধ্যে কষ্টে পথ করে এগিয়ে গেল। গ্রীষ্মের উত্তাপে ঘাসগুলো একটু শুকিয়ে এসেছিল এবং পাতলা হয়ে গিয়েছিল।

সুইজাকে বেশীদূর যেতে হ'ল না। সে দেখল একটা মাঝারি আকৃতির শূয়র-ছানা ঘাসের মাথাগুলোর ফাঁক দিয়ে মুখবার করে গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। সে গুলি ছুঁড়ল। শূয়রছানাটা পড়ে গেল, কিন্তু আবার উঠে পড়ল এবং পালিয়ে গেল। সুইজা ছারবার পাত্র নয়। সেও শূয়রছানাটাকে অনুসরণ করতে লাগল।

ঠিক তখনই শূয়রছানাটা যেখানে অদৃশ্য হয়েছিল সেখানে ঘাসগুলো খুব জোর নড়ে উঠল। একটা ক্রুদ্ধ গর্জনও শোনা গেল এবং একটা মৃত্যু পথযাত্রী পশুর আর্তনাদ ভেসে এল। সুইজা সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে পালিয়ে এলো এবং তার প্রভুকে সব বলল। হাগি মুহূর্ত দেরী না করে তার ভারী রাইফেল-গুলোর একটা নিয়ে বেরিয়ে এল এবং শূয়র ছানাটা কোনদিক দিয়ে পালিয়ে ছিল তা জেনে নিয়ে সুইজাকে সঙ্গে করে সেদিকে এগিয়ে গেল। হাগি আগে আগে চলেছে। সুইজা তার পিছন পিছন। কিন্তু হাগি এইভাবে পিছন পিছন চলায় তাকে বাধা দিল। সে চায় না যে সুইজার রাইফেলের বুলেট পিছন থেকে তা'র গায়ে লাগুক। সুতরাং সে চাকরটিকে ফিরে গিয়ে খোলা জায়গায় অপেক্ষা করতে বলল।

শূয়রছানাটাকে যে জায়গায় মারা হয়েছিল হাগি সেখানে গিয়ে মৃতদেহটার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখতে পেল না। হত্যাকারী সেটাকে নিয়ে গেছে। শুকনো ঘাসের নুয়ে পড়া এবং ভাঙা ডাটা দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে শিকার নিয়ে কোনদিকে গেছে। সতর্কতার সঙ্গে প্রায় পুরো একশ গজ এগিয়ে যেতেই সামনের দিক থেকে হঠাৎ একটা জোর গর্জনের শব্দ বুঝিয়ে দিল যে হত্যাকারী সামনেই কোন জায়গায় আহারে রত রয়েছে এবং সেখানে অন্যের অনধিকার প্রবেশে সে রীতিমতো রেগে গিয়েছে। কিন্তু হেইলস্টোন বহু বাঘ দেখেছেন ও মেরেছেন তাই গর্জনে ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসবার পাত্র তিনি নন। লুকিয়ে এগিয়ে চললেন তিনি এবং বাঘটা আরও জোরে গর্জন করতে লাগল। হাগি অবশ্য ভালো ...ই জানতেন, যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে।

কয়েক মুহূর্ত বাদেই বাঘটা আক্রমণ করল। শুকনো দেশলাই ঘাসের ভিতর দিয়ে লম্বা লম্বা লাফে সে এগিয়ে এল। যতক্ষণ না জানোয়ারটা শেষ লাফ দিয়ে সোজাসুজি তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার কোচকানো মুখটি দেখা না যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করল। তারপর সোজা গুলি ছুঁড়লো। এই ভাবেই তালওয়াদির মানুষখেকোটার জন্ম হ'ল। হাগির বুলেট সোজাসুজি

বাঘটার মুখে আঘাত করল। গুলির ধাক্কায় তার গতি শ্লথ হল, কিন্তু পিছন থেকে ভারটা তাকে তবুও সামনের দিকে ঠেলতে লাগল। ফলে বাঘটা মাত্র কয়েক গজ দূরে ডিগবাজী খেয়ে পড়ল। হাগি দ্বিতীয়বার গুলি করবার জন্য দ্রুত বন্দুকের বোল্ট ঠিক করতে গিয়েই দেখল গুলি আটকে গেছে।

তারপর যা করা উচিত ছিল হাগি তাই করল। সে পিছন ফিরে দৌড়ে পালিয়ে এল।

বাঘটা সম্ভবতঃ সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল বা এমনও হতে পারে যে সে খুব জোর আঘাত পেয়েছিল, ফলে সে পিছু ধাওয়া করতে পারেনি। ঘাসের মধ্যে ছট্‌পট্‌ করতে করতে সে যন্ত্রণায় থাবা এবং দাঁত দিয়ে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে বড় বড় গর্ত করে ফেলল।

হাগি আর একটা রাইফেল আনবার জন্য দৌড়ে গিয়ে বাংলোতে ঢুকল। সুইজা তার পিছু পিছু দৌড়তে দৌড়তে জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে! ঘর থেকে বন্দুক নিয়ে একপা একপা করে হেইলস্টোন যখন আবার সেই জায়গাতে গিয়ে পৌঁছল তখন দেখল বাঘটা পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু মাটিতে যে ছিটে ছিটে রক্ত ও লালা পড়েছিল তা থেকে পরিষ্কার হল যে সে মুখে অথবা গলার কাছে আঘাত পেয়েছে।

শিকারীদের মধ্যে সাধারণতঃ এই ধারণা প্রচলিত যে আহত মার্জার শ্রেণীর প্রাণীকে সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করতে নেই। যথেষ্ট সময় বাদ দিয়ে তা করা উচিত। ঐ সময়ের মধ্যে প্রাণীটা রক্তপাতের ফলে মরেও যেতে পারে। অন্ততঃপক্ষে ক্ষতটা এতবেশী শক্ত হয়ে যেতে পারে যে প্রাণীটার বেশীদূর যাওয়া সম্ভব না হতে পারে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করতে বলেন এমন একটা দলও আছে। তাদের যুক্তিটা হচ্ছে, আহত প্রাণীকে তার আঘাতের ধাক্কা ও ব্যথা এবং ভয়টা কাটিয়ে উঠতে দেওয়া উচিত নয়। এই যুক্তির প্রচারকরা মনে করেন যে, সময় অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং ব্যথাটা বেশীদিন ধরে উপভোগ করতে করতে আহত পশুটা বেপরোয়া হয়ে পড়ে এবং প্রতিশোধ নেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। তাঁরা এ যুক্তিও দেখান যে, একটা পশুর জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য্য কোন অঙ্গে গুলি করে তাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য গভীর যন্ত্রণা ভোগ করানো মানবিকতার বিচারে অত্যন্ত নিষ্ঠুর কাজ।

দুটো মতই কিছুটা ঠিক এবং কিছুটা ভুল। জীবমাত্রেরই চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য

ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এবং প্রত্যেকেই ঘাত-প্রতিঘাতে নিজের নিজের মতেই সাড়া দেয়। হাগি দ্বিতীয় মতবাদটার দৃঢ় সমর্থক ছিল। সুতরাং সে আহত পশুটাকে অনুসরণ করতে মোটেই বিলম্ব করল না।

লম্বা দেশলাই ঘাসের জমির ভিতর দিয়ে রক্তের দাগটা স্পষ্ট চলে গেছে। হাগি জমি ছাড়িয়ে সোজা বনের মধ্যে সেই দাগটা ধরে এগিয়ে গেল। আর সেখানে গিয়েই ব্যাপারটা খানিকটা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ল। হাগিকে নিজের ক্ষমতার উপরই নির্ভর করতে হচ্ছিল, কেননা যে সুইজা অস্ত্র বন্দুকটা নিয়ে তখনও তার পিছু পিছু চলছিল সে জীবজন্তুর পায়ের চিহ্ন খুঁজে বার করাতে ওস্তাদ ছিল না। তারা বাঘের পায়ের দাগটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা শুকনো খাদ পার হয়ে গেল। খাদটার মধ্যে বাঘটা কিছুক্ষণ শুয়ে ছিল। তারপর উঠে আবার চলতে আরম্ভ করেছে এবং খাদটার ওপারে যে সমভূমি আছে তার ভিতর দিয়ে চলে গেছে। বাঘটা যে শুয়েছিল তা দেখে বোঝা যাচ্ছে, সে গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। আর যেহেতু হাগি সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনুসরণ করেছে সেহেতু বাঘটা খুব বেশী দূরে যেতে পারেনি। সম্ভবতঃ তার ও সুইজার চলার শব্দ বাঘটা শুনতে পেয়েছে। তবে বাঘটার উচিত ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে তাদের দু'জনকে অনুসরণ করা।

ইতিমধ্যেই রক্তের পরিমাণ কমতে আরম্ভ করেছে এবং সমতল জায়গাটার ভিতর দিয়ে আরওএক ফার্লং যাবার পর দেখা গেল বাঘটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেছে। সেখানে জমি ক্রমশঃ প্রস্তর সঙ্কুল হতে আরম্ভ করেছে। তাই হাগিকে সতর্কভাবে রক্তের ফোঁটা দেখে দেখে চলতে হচ্ছিল। কিন্তু খানিকটা যাবার পর আর রক্তের দাগ দেখতে পাওয়া গেল না। ফলে চলার গতিও থামাতে হলো।

কোন অজ্ঞাত কারণে মুদিয়ামুরের বনাঞ্চলে জংলী জাতি বা আদিবাসীদের বসতি একেবারেই নেই। লোকের বিশ্বাস, মহীশূরের মুসলমান শাসনকর্তা টিপু সুলতান যখন আশপাশের অঞ্চল আক্রমণ করে দৃষ্টি গোচর সবকিছু ধুলিসাৎ করে দিয়েছিলো তখন থেকেই এরকম হয়েছে। এই অঞ্চলের পাহাড়-জঙ্গল সম্পর্কে জানা এমন কোন লোক নেই যে হাগি পরে ফিরে আসবে। বাঘটাকে খুঁজে দেখবে।

হাগির খামার যেখানে সেই মুদিয়ামুরের প্রায় দু'মাইল দক্ষিণে তালাই মালাই গ্রাম। উর্বর জমি দিয়ে ঘেরা একটা ছোট্টগ্রাম সেটা। প্রায় দু'মাস পরে

এখানকার একজন বাসিন্দা তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে একখণ্ড জমি কিনল। অবশ্য কেনবার বন্দোবস্ত করল বলা ভাল, কেননা এই হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রেজিস্ট্রারের অফিসে নথিভুক্ত করবার এবং সাবরেজিষ্ট্রারের সামনে সই করবার কথা। সাবরেজিষ্ট্রারের সামনেই ক্রেতা টাকাটা বিক্রেতাকে দেবে। মুদিয়ানুরের সাতমাইল উত্তরে অপেক্ষাকৃত বড় গ্রাম তালওয়াদিতে এই পদস্থ কর্মচারিটির অফিস। সুতরাং বিক্রেতা এবং ভাবী ক্রেতাকে ন'মাইল রাস্তা অতিক্রম করে তালওয়াদি পৌছানর জন্য তালাইমালাই থেকে পায়ে হেঁটে এক সঙ্গে রওনা হ'ল। ক্রেতাকে জমির দাম বাবদ দেয় টাকা এবং বিক্রয় কোবালা সম্পাদনের আনুষঙ্গিক ব্যয় ধরে মোট ৪০০ টাকা ক্রেতা সঙ্গে নিল!

মোট রাস্তার দুই তৃতীয়াংশ যাবার পর তারা একটা নদী পার হ'ল। নদীটাতে অল্পই জল ছিল, দুপুরের আহার হিসাবে সঙ্গে করে আনা তরকারী ছাতু দিয়ে খাবার জন্য তারা একটা বড় গাছের তলায় থামল। তারপর ক্রেতা হাতমুখ ধোবার জন্য ও জল খাবার জন্য নদীতে গেল, এবং তার সঙ্গী নিদ্রাজড়িত চোখে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

হঠাৎ বিরাটাকৃতির একটা কিছু নদীটার ওপর পাড় থেকে জলপানরত মানুষটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে যেমন হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিল তেমন হঠাৎ-ই নদী পার হয়ে অপর পাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। একমাত্র ব্যতিক্রম হতভাগ্য ক্রেতাটির আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না। সেই ভয়ানক ভৌতিক বস্তুটার সঙ্গে সেও অদৃশ্য হয়েছে।

বিক্রেতাটি এই ঘটনায় খানিকটা হকচকিয়ে গেলেও পরক্ষণেই সে লাফিয়ে উঠে যত জোরে পারল তালওয়াদির দিকে ছুটে চলল এবং অভূতপূর্ব দ্রুততার সঙ্গে ঐ তিন মাইল পথ অতিক্রম করল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে সাবরেজিষ্ট্রার ও তাঁর অফিসের কেরানীদের সামনে সমস্ত ঘটনাটা বলল। ব্যাপারটা পূর্বাপর অস্বাভাবিক মনে হওয়াতে সাবরেজিষ্ট্রার তাকে থানায় পাঠাল। থানাতেও সে সমস্ত ঘটনাটা আবার বলল।

থানার ভারপ্রাপ্ত কনস্টেবল বললেন, এই কাহিনীটার মধ্যে আশ্চর্য্য হবার মত কিছু নেই। সে যুক্তি দেখাল এই যে, ক-বলল সে ৪০০ টাকায় খ-এর কাছে একটা জমি বিক্রী করছে, ক আর খ বিক্রয় কোবালা রেজেষ্ট্রী করবার জন্য রওনা হ'ল, খ সঙ্গে ৪০০ টাকা নিল, এখন ক বলছে পথে একটা

আশ্চর্য ধরনের জীব জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল এবং খ'কে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, ক বলছে সে নিজে তখন ঠিক জাগ্রত ছিল না। সুতরাং ঐ আশ্চর্য ধরণের জীবটি কি রকমের তা সে বলতে পারে না। কিন্তু ফলাফল যা থেকে যাচ্ছে তা' হচ্ছে এই যে খ অদৃশ্য হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ৪০০ টাকাও অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং জমিটা ক-এরই থেকে গেছে।

আর কথা না বাড়িয়ে প্রধান কনষ্টেবল হতভাগ্য বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করল এবং তাকে থানার নির্জন হাজতে আট্‌কে রাখল। তারপর কেন সে একজন হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করেছে বলে মনে করে তা' বিবৃত করে একটা দীর্ঘ রিপোর্ট লিখল সত্যমঙ্গলমে, সেখানে পুলিশের আর বন বিভাগের প্রধান কার্যালয় রয়েছে। বন্দীকে সেখানে পাঠাতে হবে। সেখানকার পুলিশ সাব ইনস্পেক্টারকে সে একথা জানাতেও ভুলল না যে, তিনি যেন রিপোর্টটা পড়বার সময় অনুগ্রহ করে মনে করেন যে, হেড কনেস্টবলের বিনীত নিবেদন এই যে বহুদিন আগেই তার একটা পদোন্নতি হওয়া উচিত ছিল। আর একজন বিপজ্জনক হত্যাকারীকে এই সাহসিকতাপূর্ণ ও নাটকীয় গ্রেপ্তার নিশ্চয়ই তার সেই দাবীর যথার্থতা প্রমাণ করবে। সে মনে করে এই সমস্ত বিবেচনা করে তাকে অবিলম্বে উচ্চতর পদে উন্নীত করা উচিত। সাব ইনস্পেক্টরের নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ জীবন ও উন্নতির জন্য প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করছে—একথা জানিয়ে সে রিপোর্টটা শেষ করল।

এক সপ্তাহ পরে তালওয়াদি থানার চতুর্থ কনেস্টবল ছুটি থেকে ফিরে এল। প্রধান কনেষ্টবল তখন ভেবে দেখল যে সে দু'জন পুলিশ নিয়েই কাজ চালাতে পারবে। সুতরাং আর দু'জন পুলিশের পাহারায় বন্দীকে এবং তার রিপোর্টটা সে চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী সত্যমঙ্গলমে পাঠিয়ে দিল। ওখানেই সাব ইনস্পেক্টার থাকত। ওখানে তারা তিনদিনে পৌছবে, কেননা সমস্ত রাস্তাটা তাদের হেঁটে যেতে হবে। তালওয়াদি থেকে সত্যমঙ্গলম যাবার পথের উপরেই ছিল হেইলস্টোনের খামার বাড়ীর প্রবেশ পথ। দৈবক্রমে হেইলষ্টোন তখন সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সে পুলিশ দুটোকে বন্দীকে হাতকড়া পড়িয়ে মাঝখানে রেখে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, লোকটা কি দোষ করেছিল এবং তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কনেষ্টবল দুটো বিশ্রাম পেয়ে আনন্দিত হ'ল। তারা বলল, একজন খুনীকে তারা পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে। আর হতভাগ্য জমি বিক্রেতাটি তখন ফুঁপিয়ে

কেঁদে উঠে বলল সে নির্দোষ। সমস্ত ঘটনাটা আবার সে সাহেবকে বলল।

হাগি নিজের কান চেপে ধরল।

সদয়ভাবে তবে খানিকটা দৃঢ়তার সঙ্গে সে বলল, "নির্বোধ কোথাকার, কান্না থামাও। যদি তুমি আমার সাহায্য চাও তবে একটা সহজ কথার উত্তর দাও। তোমার সঙ্গীকে যে বিচিত্র একটা কিছুতে টেনে নিয়ে গিয়েছে বললে সেই বস্তুটা কি? অন্ততঃ সেটা কি রকম দেখতে?"

নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করল লোকটা। তারপর বলল, "সাহেব, আমি আমার বন্ধুকে জল খাবার জন্য নিচুতে নামতে দেখলাম। তারপরেই আমার চোখে ঘুম এসে ভর করেছিল। আমার কানে কোন শব্দ এলো না। কিন্তু আমি যেন দেখতে পেলাম একটা বিশাল লম্বা দেহ জঙ্গল থেকে লাফিয়ে নদী পার হয়ে এপাড়ে এল এবং আবার লাফিয়ে ফিরে গেল। কেবল তখনই আমি দেখলাম যে লোকটা নেই। আমার নিদ্রাচ্ছন্ন ভাবটাও মুহূর্তে কেটে গেল। আমি দৌড়ুতে দৌড়ুতে তালওয়াদি যাই। অথচ পুলিশগুলো বলছে, আমি আমার বন্ধুকে মেরে ফেলে তার টাকা কড়ি নিয়ে নিয়েছি।"

এই কথা কটি বলেই সে আবার কাঁদতে লাগল।

দুমাস আগে যে বাঘটাকে সে জখম করেছিল তার কথা হঠাৎ মনে পড়লো। হাগির প্রায়ই ওটার কথা মনে হয়। বাঘটা মরে গেছে না সেরে উঠেছে তা নিয়ে সে ভাবে। হাগি জানত যে বাঘটা যদি সেরে ওঠে তবে আজ হোক কাল হোক জানোয়ারটার কথা তার কানে আসবেই। ঐ জানোয়ারটাই কি তাহলে এটা?

হাগি হঠাৎ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, সেই জিনিষটা কি বাঘের মত দেখতে?

পুলিশগুলো বোকার মত হাগির দিকে তাকাল। কিন্তু হাতকড়া লাগান লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "সাহেব, ওটা বাঘই হবে। আমি আগেই বলেছি আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এবং সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ঘটে গিয়েছিল। তবে আমার সঙ্গীকে যে টেনে নিয়ে গিয়েছে মানুষের দেহের সঙ্গে তার দেহের যে কোন মিল নেই, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তার দেহটা ছিল লম্বা এবং বিরাট আকৃতির।

হাগি তখন পুলিশগুলোকে বলল, আপনারা কষ্ট করে আর হেঁটে

হতভাগ্য লোকটাকে সত্যমঙ্গলমে নিয়ে যাবেন না। কেননা লোকটা মোটেই খুনী নয়। প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল সেটা আমি অনুমান করতে পারছি।"

কিন্তু পৃথিবী ব্যাপী আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা তাদের কাজে অটল অনড় থাকে। এক্ষেত্রেও তাই দেখা গেলো। পুলিশগুলো বন্দীকে নিয়ে সত্যমঙ্গলমের দিকে এগোতে থাকল। হাগি গাড়ীতে করে তালওয়াদী চলে গেল। যখন সে প্রধান কনেষ্টবলের কাছ থেকে জানতে পারল যে, কেউই কষ্ট করে ঘটনাটার তদন্ত করেনি বা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেনি বলে বন্দী নিজে ছাড়া অন্য কেউ বলতে পারে না ঘটনাটা ঠিক কোথায় ঘটেছিল, তখন সে নিরাশ হল।

হেইলস্টোন ভাবল প্রধান কনেষ্টবলকে আহত বাঘটার কথা বলবে। কিন্তু পরক্ষণই সে মত পাল্টাল। ওর মত মেজাজের একরোখা লোক যা তা করে ফেলতে পারে। এমনকি সে হেইলস্টোনকে তালা আটকিয়ে বন্দী করে রাখতে পারে। সুতরাং আর কথা না বলে হেইলস্টোন সত্যমঙ্গলম্ অভিমুখে যাত্রা করল। মুদিয়ামুরের আনুমানিক দশ মাইল পর যে পুলিশ দুটো ও বন্দীটার সাক্ষাৎ পেল। গাড়ীতে চরবার আনন্দে লোক তিনটে ঠাসাঠাসি করে গাড়ীতে উঠে বসল এবং নব্বই মিনিটেরও কম সময়ে গোটা দলটা সাব ইনস্পেক্টরের কাছে পৌছে গেল।

সাব-ইনস্পেক্টর প্রথমে কনস্টেবলের রিপোর্ট পড়ল তারপর হাগির বক্তব্য শুনতে লাগল।

প্রধান কনেস্টবল দুর্ঘটনাস্থলটি পরিদর্শন করবার কষ্ট পর্য্যন্ত স্বীকার করেনি, হাগি একথা বলতেই ইনস্পেক্টরটি বলল-"অথচ এই লোকটা পদোন্নতি চায়, তার পদাবনতি হোক তাই আমি দেখতে চাই। অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার গাড়ীতে তালওয়াদি নিয়ে চলুন।"

তখন পাঁচজনে মিলে গাড়ীতে করে তালওয়াদি ফিরে এলেন। প্রধান কনস্টেবল তো রীতিমতো বিস্মিত। ভয়ও পেলেন তিনি। তালওয়াদিতে বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করে যেখানে জমির ভাবী ক্রেতা ও তার টাকা পয়সা উধাও হয়েছিল জমি বিক্রেতা তাদের সেখানে নিয়ে গেল। প্রধান কনস্টেবলকেও তাদের সঙ্গে যেতে বাধ্য করা হল।

এক সপ্তাহেরও বেশী পার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা নদীর পাড়ের উপর বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেলো। বোঝা গেল বাঘটা শিকার অর্থাৎ

সেই লোকটাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছে। গুটিগুটি পায়ে সে এগিয়ে এসেছিল তারও কিছু দাগ তখনও আবছা আবছা দেখা যাচ্ছিল।

হাগি রাইফেল সঙ্গে নিয়ে যায় নি। সাব-ইনস্পেক্টর ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করল বাঘটা তখনও সেখানে থাকতে পারে কিনা। হাগি বলল—"না"। তখন তারা দুজনে মিলে আশেপাশের স্থানগুলিতে মৃতব্যক্তির দেহের কোন অংশ পড়ে আছে কিনা তা খুঁজতে লাগল। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, জমি বিক্রেতাই, যার হাতে এখন আর হাতকড়া নেই, গিয়ে চেটে-পুঁছে খাওয়া হাড়গুলির উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। এদিকে দেখা গেল, ছেড়া কাপড়ের কয়েকখানা টুকরো এবং দশটাকার নোটগুলো বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। ঘাস ও ঝোপের মধ্যে সেগুলো আটকে ছিল। এ থেকে নিশ্চিত হওয়া গেল যে এই হাড়গোড়গুলি সেই ভদ্রলোকের দেহের। অতি অল্প হাড়গোড়ই অবশিষ্ট ছিল। বাঘটা খাওয়া শেষ করবার পর শকুন, শিয়াল আর হায়না এসে অধিকাংশ হাড়গোড়ই টেনে নিয়ে গিয়েছে।

একমাস যেতে না যেতেই মানুষখেকোটার হাতে আরেকজন মানুষ মারা পড়ল। ঘটনাটা ঘটল নাগালুর গ্রামে, নীলগিরি জেলাকে ঘিরে যে ময়ার নদী আছে সেই নদী আর হাগির বাসস্থানের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় এই নাগালুর গ্রাম। তৃতীয় শিকার হ'ল একটা বুড়ো লোক। তালাই-মালাই গ্রামের দু'মাইল দূর দিয়ে 'সুলতান্‌স্ ব্যাটারী রোড' নামে যে পুরানো রাস্তাটা চলে গেছে সেই রাস্তাটা দিয়ে লোকটা তার দু'ছেলের পিছন পিছন যাচ্ছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে, বাস্তবিকপক্ষে ভর দুপুরে হত্যাকাণ্ডটা ঘটে।

লোক তিনটি নাগালুরে যেখানে দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছিল, সেখানে যাবার জন্য তালাই-মালাই ছেড়ে একসঙ্গে বেড়িয়েছিল। আমি যে পুরনো রাস্তাটার নাম করেছি, সেটা বহুদিন আগে যে বিক্রমশালী মুসলমান শাসক এ অঞ্চলে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন তার সময়কার ধ্বংসাবশেষগুলোর অন্যতম। কিছুটা পথ তাদের সেই রাস্তাটার উপর দিয়ে যেতে হবে। অল্প খানিকটা চলেই তারা একটা বৃহৎ বুনো আমগাছের কাছে পৌঁছুল। বাঁদরে ডাল ঝাকিয়ে কয়েকটা পাকা আম গাছ তলায় ফেলেছিল। তারা সেগুলো খাবার জন্য থামল। আবার তারা যখন হাটতে আরম্ভ করল তখন বুড়োটা একটু পিছিয়ে পড়ে। তবে যে কাজের জন্য তারা নাগালুর চলেছে সেই কাজ সম্বন্ধে সে ছেলেদের সঙ্গে পিছন থেকেই কথা বলতে বলতে চলল।

বুড়োটা ছেলেদের মনে করিয়ে দিল যে তাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে। তারপরই তারা সকলে জোরে হাঁটতে স্বরু করল। ঠিক সেই সময়ই ছেলে দু'টো একটা চাপা চীৎকার শব্দে পিছন ফিরে তাকায় এবং দেখে যে একটা প্রকাণ্ড বাঘ তাঁদের বাবার ঘাড়টা জোরে কামড়ে ধরে রাস্তার ধারের ঘন ঝোপের মধ্যে পালিয়ে যাচ্ছে।

বাঘটা একেবারে তাদের অজ্ঞাতসারেই আবির্ভূত হয়েছিল। সে কোন রকম শব্দ করেনি, এমনকি গর্জন বা গরগরও করেনি। এটা একটু অস্বাভাবিক। কেননা সাধারণতঃ বাঘ আক্রমণ করার পূর্বমুহূর্তে তার সাহসকে বাড়িয়ে নেবার জন্য গর্জন অথবা যে কোন রকমের শব্দ করে। এক্ষেত্রে তারা শুধুমাত্র তাদের মরণোন্মুখ পিতার কণ্ঠোচ্চারিত আর্তনাদই শুনতে পেয়েছে। তারপরই আক্রমণকারী অদৃশ্য হয়েছে। আর ছেলে দুটো যত জোরে পারে দৌড়িয়ে তালাইমালাই গিয়ে উপস্থিত হয়।

গ্রামবাসীদের মধ্যে রীতিমতো ত্রাসের সঞ্চার হল। আর মানুষখেকোটাও বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে দাপিযে বেড়াতে লাগল। আক্রমণের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে সে যেন জানতে পেবেছে তার নামে ঐ এলাকায় ভীতির সঞ্চার হয়েছে। তার শিকারের এলাকা উত্তরে সত্যমঙ্গলম এবং মহীশূরের বৃহৎ শহর চামরাজ নগরের মধ্যে যোগাযোগকারী বড় রাস্তাটি পর্যন্ত বিস্তৃত হল। পূর্বে সত্যমঙ্গলম সমভূমির সামনা-সামনি খাড়া পাহাড়ের উপর অবস্থিত ডিমবাম নামক ছোট্ট গ্রাম পর্যন্ত সে তার এলাকা বিস্তারিত করেছে। দক্ষিণে ময়ার নদী পেরিয়ে নীলগিরি জেলাতেও তার উৎপাত শুরু হয়। এমনকি পশ্চিমে মহীশূর রাজ্যের বান্দীপুর এলাকাও সে দাপিয়ে বেড়াতে থাকে।

দুর্ভাগ্যক্রমে হাগি যে জীবনে কখনও উৎসাহের অভাব বোধ করেনি, ঠিক এই সময়েই হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমি জানি এই সমস্ত যা কিছু ঘটেছিল এবং ঘটছিল তার জন্য সে মনে মনে খুবই কষ্ট পাচ্ছিল। কেননা, বাঘটাকে আহত করে সে নিজেই বাঘটার মানুষখেকো জীবনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল বলে মনে করে এবং অসুস্থ হবার জন্য সে খুবই বিরক্ত বোধ করছিল। অসুস্থ না হলে সে অবশ্যই বাঘটাকে মারবার চেষ্টা করত, কিন্তু অসুস্থতা বশতঃ সে তা করতে পারছিল না। সুতরাং সে আমাকে লিখল এবং আমি সেই চিঠি পেয়েই স্টুডিবেকার গাড়ীতে চেপে ময়ার উপত্যকায় তার খামার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম।

প্রবেশ পথে সুইজা আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। হাগিকে দেখলাম বারান্দার একটা ক্যানভাসের চেয়ারে ঘুমিয়ে আছে। সে আমার গাড়ীর শব্দ শুনতে পায়নি। শেষবার আমি যখন তাকে দেখেছি তখনকার থেকে এখন তার চেহারায় ভীষণ পরিবর্তন ঘটেছে। তার এখনকার চেহারা আগের অর্দ্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে এবং তাকে উস্কখুস্ক ও খুবই অসুস্থ দেখাচ্ছে। আমাকে বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে আসবার জন্য সে ক্ষমা চাইল। তারপর আমি তার পাশে বসে চা ও তার বাগানের মুখরোচক আম খেতে লাগলাম। আর সে আমি যে কাহিনীটা ইতিমধ্যেই বলেছি সেই কাহিনীটা বলে গেল। সে নিজের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করল না। সে কথায় কথায় নিজের ওপর ধিক্কার দিচ্ছিল। তা শুধু সে বাঘটাকে আহত করেছে বলেই নয়, আহত করবার পরও সে বাঘটাকে মেরে ফেলেনি বলেও বটে।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "এ রকম ঘটে থাকে। তুমি এখন নিজেকে সারিয়ে তোল এবং আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে বাঘটাকে মার"।

সে আমার দিকে আড়চোখে তাকালো। তারপর বলল, "কেনেথ আমার শিকারের দিন চলে গেছে। আমার পরবর্তী শিকার হবে চির সুখের মৃগয়াক্ষেত্রে, যদি অবশ্য এই রকম কোন স্থান প্রকৃতই থেকে থাকে।"

বাস্তবিকই সে আর শিকার করে নি। এই কথাবার্তা হবার অল্পদিন পরেই সে ইংলণ্ড চলে যায়। সেখানে একটা সুন্দর জায়গায় সে একটা বাড়ী কিনেছিল। কিন্তু তা ভোগ করা তার ভাগ্যে হয় নি। সেখানে যাবার কিছুদিন পরেই সে সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয় এবং তার কিছুদিন পরেই হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়।

যাইহোক বাঘটাকে মারার ব্যাপারে কি করতে হবে তাই নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। এটা স্পষ্ট হ'ল যে নাগালুর, তালাই-মালাই এবং অন্য যে সমস্ত জায়গায় বাঘটা মানুষ মেরেছিল সে সমস্ত জায়গায় গিয়ে বাঘটার চাল চলন ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে লোকের কাছ থেকে খোঁজ নেওয়ার জন্য সময় নষ্ট করার দরকার হবে না। হাগি অসুস্থ হবার আগেই সে কাজটা সেরে রেখেছিল। সে যা জানতে পেরেছিল তা আমাকে বলল। প্রথমেই আমি নিশ্চিত হলাম যে, সে যে জানোয়ারটাকে আহত করেছিল সেটাই এখন এই মানুষখেকোতে পরিণত হয়েছে। যে কজন তাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পেয়েছিল, বিশেষ করে "সুলতানস্ ব্যাটারী রোড" থেকে যে বৃদ্ধ লোকটি

বাঘের কামড়ে মারা পড়েছিল তার ছেলেরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল যে তারা চকিতের জন্য বাঘটার মুখ যা' দেখেছে তাতে বোঝা গেছে যে তার মুখে একটা গুরুতর কিছু ঘটেছে। অজস্র কাঁটা দাগে এবং বেঁকে যাওয়ায় মুখটা বিকৃত রূপ ধারণ করেছে। দ্বিতীয়তঃ যারাই এর আক্রমণের প্রত্যক্ষদর্শী তারাই এর মধ্যে অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করেছে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, জানোয়ারটা একটু বিচিত্র রকমের অথবা তার স্বরযন্ত্রে কোন দোষ ঘটেছে। তাছাড়া এ জানোয়ারটাকে কোনদিন ডাকতে শুনেছে বলে কারুরই মনে পড়ে না। অবশ্য এই অঞ্চলে প্রায়ই বাঘের ডাক শোনা যায়। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা এই অঞ্চলে বাঘে রীতিমতো ভর্তি। কিন্তু যে সমস্ত জায়গায় মানুষ মারা পড়েছিল সেই সমস্ত জায়গায় বিশেষ করে মানুষ মারা পড়বার আগে বা পরে কয়েকদিনের মধ্যে বনে বাঘের ডাক শোনা যায় নি, এ কারণে গুজব রটে গিয়েছিল যে, মানুষখেকোটা বোবা।

মানুষখেকো বাঘ মারবার জন্য সাধারণতঃ যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা যেমন উত্তেজনাহীন তেমনই অসংগত। শিকারী সাধারণতঃ তিন চারটি মোষের বাচ্চা টোপ হিসেবে ব্যবহারের জন্য কিনে আনে তারপর বাছাইকরা কতকগুলি জায়গায় মাচান বাঁধবার পর ঐ টোপগুলো বেঁধে রাখে এই আশা করে যে বাঘটা হয়তো ঐ গুলোর একটাকে মারবে। তারপর শিকারী সন্ধ্যায় এসে মাচানে বসে অপেক্ষা করে বাঘটা দ্বিতীয়বার আহার করতে কাছে এলেই তাকে গুলি করে মারবে বলে।

মানুষখেকো বাঘে 'মানুষ খায় এ কথা শুনবার পর আপনি হয়তো আশ্চর্য হয়ে ভাববেন যে পশু টোপ ব্যবহার করা হয় কেন? মানুষের স্বাদ যে পেয়েছে সে কি ঐ টোপ হত্যা করতে চাইবে? উত্তরে বলব, মানুষখেকো বাঘ কেবল মানুষের মাংস খেয়েই থাকে না। তাঁরা অন্য মাংসের চেয়ে মানুষের মাংস বেশী পছন্দ করে মাত্র, তারা সম্ভবতঃ মানুষ খুঁজে পাওয়া সহজ আর মানুষকে অনুসরণ করে মারা সহজ বলেই তারা মানুষ হত্যার পথ নেয়। কিন্তু তাই বলে তো আর একটা মানুষকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করা যায় না।

হাগির আর সুইজার সাহায্যে আমি তালাই-মালাই গ্রাম থেকে চারটে টোপ কিনলাম। যে ছেলে দুটোর বাবা মারা পড়েছিল তারা স্বেচ্ছায় আমাকে টোপ ও মাচান বাঁধবার কাজে সাহায্য করতে চাইল, সুতরাং আমি

তাদের দু'জনকে এবং আরও দু'জনকে আমাকে সাহায্য করবার জন্য নিয়োগ করলাম। হাগি আর সুইজাকে নিয়ে সাতজনের একটা দল তৈরী করে আমরা কোথায় টোপ বাঁধা হবে তা আলোচনা করতে বসলাম। একটা খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো যেখানে পূর্বেই একটা হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, সেখানে টোপ বাঁধা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কেন যে এটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে তা আমি বুঝতে পারি না। একজন খুনী আসামীর মত একটা মানুষখেকো বাঘেরও অপরাধবোধ থাকতে পারে এবং সেজন্যই সে তার অপকর্মের জায়গায় আবার ফিরে আসে এ যুক্তি নিশ্চয়ই টেকে না। মানুষখেকো বাঘ তার কাজকে পাপ বলে ভাবে না। মানুষ তার খাদ্য বলেই সে মানুষ মারে।

আমি স্বীকার করি যে টোপ বাঁধার ব্যাপারে আমারও ঐ একই অভ্যাস দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখন আমি ভেবে দেখছি পদ্ধতিটা ভুল ধারণাকে ভিত্তি করে প্রচলিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একজায়গায় একটা হত্যাকাণ্ড ঘটবার পর শিগগীরই মানুষখেকোটার পক্ষে সে জায়গায় আবার ফিরে যাবার চাইতে ঐ জায়গাটা পরিহার করে চলার সম্ভাবনাই বেশী। কেননা ঘটনাটা ঘটবার পর লোকজানাজানি হয়ে সেখানে লোকের যাতায়াত এত বেড়ে যায় যে বাঘ সেটা টের পায়।

প্রকৃতপক্ষে আমাকে এক্ষেত্রে যা করতে হবে তা হলো ঐ অঞ্চলের একটা মানচিত্র পর্যালোচনা করে দেখতে হবে হত্যাকারীটার অনুসৃত গতিপথটা কি, যে যে জায়গায় মানুষ মারা পড়েছে মানচিত্রে সেই জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে হবে ও প্রত্যেকটা হত্যাকাণ্ডের দিনটা বসাতে হবে। একটা বাঘ যখন পাকা মানুষখেকোতে পরিণত হয়েছে এবং বহু হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে দুর্নাম কিনেছে তখন এই ধরনের পর্যালোচনা থেকে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বাঘটা বার বার একটা নির্দিষ্ট পথ পরিক্রমা করে চলে এবং আগে যে যে অঞ্চলে সে মানুষ হত্যা করেছে সেই সমস্ত অঞ্চলে (ঠিক ঠিক সেই জায়গাগুলোতে নয়) বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে পরে বা কয়েক মাস পরে ফিরে আসে। এক্ষেত্রে এমন হওয়াও বিচিত্র নয়। শিকারের ভাষায় এই অভ্যাস 'মানুষ খেকোর বীট' নামে অভিহিত।

সাধারণভাবে যেখানে কোন লোক বাঘের হাতে মারা পড়ে তার কাছাকাছি জায়গায় টোপ বাঁধা প্রায় নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন—এই

প্রশ্নের অবতারণা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। আমার মনে হয়, শিকারী চায় যে, টোপটা বাঘটা নিয়মিত যে পথ ধরে পরিক্রমা করে তার উপরেই থাক এবং সে আশা করে যে বাঘটা আবার ফিরে আসবে। কিন্তু বেশ কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যে তা নাও ঘটতে পারে। কেননা সব মানুষখেকো বাঘই নির্দিষ্ট পথ পরিক্রমা করে না। বাঘটা যদি পাকা মানুষখেকো হয় তবেই মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট গতিপথ পাওয়া যেতে পারে। আমি যে জানোয়ারটার পিছু নিয়েছিলাম সে খুব সম্প্রতি মানুষখেকোর জীবন আরম্ভ করেছে এবং এ পর্যন্ত নিয়ম বহির্ভূতভাবে সে এখানে ওখানে বেশ কয়েকজন মানুষকে হত্যা করেছে।

এত সব বিবেচনার পর দেখা গেল ব্যাপারটা একই জায়গায় থেকে গেছে। কোথায় টোপ বাঁধা হবে সে বিষয়ে আমরা সঠিক কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। আমাদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য দেখা দিল। ছেলে দু'টো সুলতানস্ ব্যাটারী রোডে, যেখানে তাদের বাবা বাঘের শিকার হয়েছে সেখানে টোপ বেঁধে দেখবার পক্ষে যুক্তি দেখাল। আমাকে সাহায্য করবার জন্য আমি যে দু'জন লোককে নিয়োগ করেছিলাম তারা বলল তালাইমালাই থেকে তালওয়াদি যে রাস্তাটা গেছে সেই রাস্তাটাই সব থেকে ভাল। কেননা প্রায় প্রত্যেকদিনই ঐ রাস্তায় বাঘের পায়ের ছাপ দেখা যায়। তালাইমালাই-এর দু তিন মাইল দক্ষিণে, যেখানে জমি হঠাৎ ময়ার উপত্যকায় নেমে গেছে সেখানে একটা সরল রেখায় এক মাইল পর পর টোপ চারটে বাঁধবার প্রস্তাব করল হাগি। সুইজা হাগির দেশলাই ঘাসের জমি, যার মধ্যে বাঘটাকে প্রথম আহত করা হয়েছিল, সেখানে টোপগুলো বাঁধবার কথা বলল। তার মতে বাঘটা আবার চিতল হরিণ আর বুনো শুয়োর ধরবার জন্য সেখানে ফিরে আসতে পারে।

আমি বিবেচনা করে দেখলাম প্রস্তাবগুলোর মধ্যে শেষেরটাতে সাফল্যের আশা সব থেকে কম। যেখানে সে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল সেখানে মানুষখেকোটা কখনও ফিরে আসবে না। সুতরাং আমরা ও'টা নাকচ করে দিলাম। অন্য প্রস্তাবগুলোতে সাফল্যের আশা সমান সমান। আসলে এখন বাঘটা যে কখন কোথায় দেখা দেবে সেটা সম্পূর্ণভাবেই ভাগ্যের ব্যাপার।

ফলে আমরা একটা টোপ 'সুলতান্স্ ব্যাটারী রোড'-এ, একটা টোপ তালাইমালাই থেকে তালওয়াদি যাবার রাস্তায় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ টোপ

দু'টো হাগির প্রস্তাবমত ময়ার নদীর সামনের উঁচু পাড় বরাবর দু'টো বাছাই করা জায়গায় বাঁধব বলে ঠিক করলাম। আমার মনে হল টোপ যদি মারা পড়ে, তবে শেষের দুটোয় একটা মারা পড়বে—নীলগিরি অরণ্য আর তালাইমালাইয়ের সংরক্ষিত বনভূমির মধ্যে যাতায়াতের পথে উঁচু পাড়টা পার হবার সময় বাঘের হাতে সেদুটোর একটা মারা পড়বে। তবে ঐ এলাকায় একাধিক বাঘ থাকায় মানুষখেকোটা না অন্য কোন নিরপরাধ বাঘ টোপ হত্যা করেছে তা কিন্তু আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে না। আমাদের কাছে এখন একটিমাত্র পথ খোলা রইলো তা হচ্ছে আমরা যেটাকে গুলি করার জন্য অপেক্ষা করবো সেটা আশা করা যাচ্ছে মানুষখেকোটাই হবে। নির্বাচিত অঞ্চলগুলোর ঠিক কোন কোন জায়গায় টোপগুলো বাঁধা হবে তা আমি বাছাই করব বলে ঠিক হল।

আমি আমার চার সহকারীকে পরদিন ভোরে আরও আটজন লোককে সঙ্গে করে আনতে বলে দিলাম, যাতে তারা মোট বারোজন হয়। এতে করে টোপগুলো বাঁধবার আগে আলাদা আলাদাভাবে মাচানগুলো বেঁধে ফেলবার জন্য যথেষ্ট লোক পাওয়া যাবে।

আমি ঠিক করলাম প্রথমে মাচানগুলো তৈরী করে ফেলতে হবে। তার পরে গুলি করবার উপযুক্ত জায়গা দেখে টোপবাঁধা বুদ্ধিমানের কাজ। আর মারা পড়বার পরই মাচানে বসে অপেক্ষা করার দরকার বেশী। কিন্তু তা না করে যদি টোপ মারা পড়বার পর মাচান বাঁধা হয় তাহলে দারুণ হৈ-চৈ হবে আর বাঘটা যদি সেই হট্টগোল শুনতে পায় তাহলে সে আর টোপের কাছে ফিরে আসবে না।

যে ধরনের মাচান আমি সাধারণতঃ ব্যবহার করা পছন্দ করি এবং সর্বোত্তম বলে ভাবি সেটা হবে ঠিক যেন একটা সাধারণ খাটিয়া, যার পাগুলো কেটে ছোট করে ফেলা হয়েছে। যারা খাটিয়া কি জানেন না তাদের জ্ঞাতার্থে জানাই যে খাটিয়াতে চার খণ্ড কাঠ অথবা বাঁশের তৈরী প্রায় ছ'ফুট লম্বা ও তিনফুট চওড়া একটা কাঠামো থাকে। দড়ি অথবা চওড়া ফিতে দিয়ে কাঠামোটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বুনে দেওয়া হয়। তারপর কাঠামোটার চারকোণে চারটে পায়া লাগিয়ে তৈরী শেষ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে অবশ্য লোক সাধারণতঃ মাটিতেই শোয়।

যে সমস্ত অঞ্চলে সাপ আর বিছা অস্বাভাবিকভাবে বেশী সে সমস্ত জায়গায়

লোকে এই ধরনের খাটিয়া ব্যবহার করে। এগুলো ঘরেই তৈরী করা যায় এবং দড়ির দাম ধরে তৈরীর খরচা পড়ে খুব বেশী হলে পাঁচ টাকার মত। বেশী আরামের জন্য ফিতে অথবা জাল ব্যবহার করলে দাম বড় জোর ওর দ্বিগুণ পড়ে।

আমার মাচান ছিল ফিতের তৈরী খাটিয়া। পায়াগুলো কেটে লম্বায় একফুট করে নেওয়া হয়েছিল। খাটিয়াটা কিছু দিয়ে ডালের সঙ্গে বাধবার পক্ষে পায়ার ঐ দৈর্ঘ্যই ছিল যথেষ্ট। খাটিযাটা কেটে দু'খণ্ড করে খণ্ডদুটো কব্জা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে বয়ে নিয়ে যাবার সময় খাটিয়াটা ভাঁজ করে নেওয়া যায়। এর আরও সুবিধা হলো, এর ওজন কম অথচ এর থেকে আরাম পাওয়া যায় বেশী। আব আমি যদি কোন কারণে নড়তে বাধ্য হই তবে শব্দও হবে যথা সম্ভব কম। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি মাচানে বসে থাকবার সময় কারুর কখনও নড়া চড়া করা উচিত নয়।

হাগির পছন্দ ছিল আর এক ধরনের মাচান। তা ভাজ করা যায়। সেটা আসলে একটা ক্যানভ্যাস চেযার ছাড়া আর কিছু নয়। আর পা যাতে ঝুলে না থাকে সে জন্য তাতে পা রাখবার ব্যবস্থা আছে। এরকম মাচানে বসে সব সময়ই আমার নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে হয়—মনে হয় যেন আমি এর ভিতর দিয়ে গলে পড়ে যাব নয়ত সমস্ত মাচানটা যে কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পরে যাবে। অবশ্য এ ধারণা সম্পূর্ণই অমূলক। প্রকৃত পক্ষে দুটো ভয়ের কোনটাই এতে নেই। তাই হাগি যখন আমাদের নির্বাচিত চারটে জায়গায় একটাতে তার ক্যানভাস চেয়ারটা মাচান হিসাবে ব্যবহার করতে দিতে চাইল আমি তাতে আপত্তি করলাম না বরং কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করলাম। চারটে মাচানের দুটোর সমস্যা মিটে গেছে। বাকী দুটো বন থেকে কাঠ আর বাঁশ সংগ্রহ করে তৈরী করে নিতে হবে।

পরদিন সেই বারোজন লোক তাদের ধারাল দা নিয়ে এসে উপস্থিত হতেই আমরা রওনা হয়ে পড়লাম। আমাদের যা দড়ি লাগবে তা সবই হাগি দিল। টোপের জন্য যে মোষগুলো কেনা হয়েছিল চারজন লোক তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল, আর সঙ্গে আমরা চললাম। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা তালাই-মালাই থেকে তালওয়াদি. যাবার রাস্তায় এসে পৌছুলাম। এখানেই আমরা প্রথম মাচানটা বাঁধব।

এই রাস্তা ধরে সিকিমাইল যেতে না যেতেই নরম মাটিতে পরিষ্কার বাঘের

পায়ের দাগ দেখতে পেলাম। একটা ছোট নালা থেকে সেগুলো উঠে এসেছে এবং রাস্তা পার হয়ে গিয়েছে। বাঘটা যে আজ সকালের দিকে এ দিক দিয়ে গেছে তা বোঝা গেল দাগগুলো দেখে। রাস্তার ধারের ধুলো এখনো বাঘের পায়ে তৈরী গর্তে এসে পড়ে তা বুজিয়ে দেয় নি। দাগগুলো যদি কয়েক ঘণ্টা আগের হতো তাহলে ধুলো এসে পড়ে সেগুলো বুজে যেতো।

নালাটা ধরে এগিয়ে যাবার পর যেখানে সেটা রাস্তার সঙ্গে মিশেছে তার বাঁ ও ডান দু ধারের পাড়েই বাঘের আরও বেশ কিছু পায়ের দাগ দেখতে পেলাম। তবে সেগুলো বেশ পুরানো। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেল যে, আমরা এইমাত্র যে বাঘটার পায়ের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি সেই বাঘটা অথবা এই অঞ্চলের অন্য কোন বাঘ ঐ শুকনো নালাটা দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করে থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে দাগগুলো যথেষ্ট পুরানো হওয়ায় ঐগুলো আমরা এইমাত্র রাস্তাটার উপর যে বাঘের পায়ের তাজা চিহ্নগুলি দেখেছি সেই বাঘটারই পায়ের চিহ্ন কিনা তা নির্ভুলভাবে বুঝতে পারলাম না। তবে ঐ তাজা দাগগুলো নিঃসন্দেহে একটা পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ বাঘের।

নালাটা যেখানে রাস্তাটা অতিক্রম করেছে তার একটু আগেই নালাটার অপর পাড়টায় একটা বড় গাছ ছিল। প্রথম মাচানটা বাঁধবার পক্ষে ঐ গাছটাই যে আদর্শ জায়গা সে বিষয়ে আমরা সকলে একমত হলাম। গাছটা খুবই প্রাচীন, ওর ডাল থেকে যে ঝুরিগুলো নেমেছে সেগুলো মাটির গভীরে চলে গেছে। সেগুলোর এক একটা তো ছোট খাট গুঁড়ির মত মোটা। এই শিকর আর গুড়ির জালকে সহজেই মাচান হিসাবে ব্যবহার করে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা যায়। তাই আমি ঠিক করলাম আমার খাটিয়া আর হাগির চেয়ারটা এখানে ব্যবহার না করে অন্য জায়গাগুলোর যেখানে মাচান তৈরীর জন্য প্রকৃতির এরকম সহায়তা পাওয়া যাবে না সেখানকার জন্য রেখে দেব। আমরা নব্বই মিনিটে মাচান তৈরী শেষ করলাম এবং প্রথম টোপটা একটা সুবিধামত জায়গায় বেঁধে দ্বিতীয় নির্বাচিত জায়গাটার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। দ্বিতীয় টোপ বাঁধার জায়গাটা "সুলতানস্ ব্যাটারী রোড''-এর উপর।

বৃদ্ধ লোকটা যেখানে মারা পড়েছিল তার ছেলেরা সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিল। এই জায়গাটির দুই ফার্লং-এর মধ্যে আবার একটা নালা। সেটা যেখানে রাস্তাটাকে অতিক্রম করে গেছে সেখানে আমরা দ্বিতীয় মাচানটা বাঁধলাম। এ মাচানটাও ঐ জায়গাতে গিয়ে তৈরী করতে হল। সময়ও

লাগল অনেক বেশী। ফলে দু মাইল দূরে ময়ার উপত্যকা আর নীলগিরি বনের কাছে যেখানে বাঘ সাধারণত বেশী চলাফেরা করে সেই অভিমুখে রওনা হতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল।

আমার পথ প্রদর্শকরা ঐ অঞ্চলের বহুদিনের বাসিন্দা। তারা প্রথমে একটা তারপর আরও একটা পশু চলাচলের পথের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। পথগুলো আমাদের দক্ষিণ দিকের উপত্যকা থেকে উঠে এসেছে। এই উপত্যকটার নীচের দিকেই খানিকটা দূর দিয়ে বয়ে চলেছে ময়ার নদী। নদী তীরের দুপাশের বৃহৎ বৃক্ষের ঘন বীথি দেখেই ওর গতি পথটা চেনা যায়। আমরা যে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে ময়ার নদীকে বনের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে যাওয়া একটা বৃহৎ সবুজ অজগর সাপের মত দেখাচ্ছে।

একটা সুবিধাজনক গাছ বেছে নিয়ে, তাতে প্রথমে আমার খাটিয়াটা এবং শেষে হাগির ক্যানভাস চেয়ারটা দিয়ে চতুর্থ মোষটাকে টোপ হিসাবে বাঁধবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সে দিনের মত কাজ শেষ হ'ল। আমরা যখন পুরো পাঁচ মাইল দূরে হাগির খামারের দিকে চললাম তখন পশ্চিমে বন্দীপুরের অরণ্যের ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আমরা দিনের দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু চারটে কাজ শেষ করে আমি খুবই তৃপ্তি লাভ করলাম। এখন আমার একমাত্র করণীয় কাজ হবে হঠাৎ যদি মানুষ-খেকোটার দেখা পাওয়া যায় এই আশা নিয়ে দিনের বেলায় বনের অন্যান্য দিকগুলো চলে বেড়ান এবং যতদিন না একটা টোপ মারা পড়ে ততদিন রাত্রিতে হাগির বাড়ীতে শান্তিতে ঘুমানো। অর্থাৎ আগামী দিনগুলোতে কি যে ঘটতে যাচ্ছে তার কিছুই জানিনা।

সেই বৃদ্ধের ছেলে দু'জনকে এবং আমাকে যে লোক দু'জন স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে তাদেরকে আমি পরদিন সকালে গিয়ে মোষ-গুলো দেখে আসতে বললাম। সেই সঙ্গে এও বললাম যে যতদিন পর্যন্ত না একটা টোপ মারা পড়ে ততদিন পর্যন্ত তারা প্রত্যেক দিন সকালে গিয়ে যেন মোষগুলোকে খাবার আর জল দিয়ে আসে। কথামতো তাদের প্রথমে সব থেকে দূরের অর্থাৎ পশ্চিমের পাড়াটাতে বাঁধা মোষগুলোকে দেখতে যাবার কথা। তারপর পূবের দিকে আসতে আসতে সুলতান্‌স ব্যাটারী রোডের টোপটাকে দেখে একেবারে শেষে হাগির খামারের সব থেকে কাছে তালাইমালাই থেকে তালওয়াদি যাবার রাস্তার উপরে বাঁধা মোষটার কাছে আসবার কথা।

পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় আমি শুনতে পেলাম তারা উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে বলতে মোটর যাবার রাস্তাটা দিয়ে আসছে। বুঝতে পারলাম, একটা টোপ মারা পড়েছে। কিন্তু তারা যে সংবাদ দিল তা রীতিমতো আশ্চর্যজনক। গত সন্ধ্যায় সবশেষে হাগির চেয়ার মাচানটার নিচুতে যে টোপটা বাঁধা হয়েছিল সেটা শুধু মারা পরেনি তার প্রায় অর্দ্ধেক খেয়ে ফেলেছে বাঘটা। আরেকটা টোপ মারা পড়েছে তালাইমালাই তালওয়াদি সড়কের সঙ্গে নালাটার মিলন স্থলে। সেটাও অর্ধেক খাওয়া।

একই রাত্রে পাঁচ মাইলের ব্যবধানে দুটো টোপ মারা পড়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে দুটো বাঘের কাজ এটা। এখন প্রশ্ন হলো কোন্ বাঘটা মানুষখেকো? এবং কোন্ মাচানটাতেই বা সেটির জন্য অপেক্ষা করবো?

আবার আমরা একবার আলোচনা করতে বসলাম। সবাই একমত হলাম যে, যে বাঘটা প্রথম টোপটা মেরেছে অর্থাৎ খামারের কাছের টোপটা মেরেছে সেটা মানুষখেকোটা হ'বার সম্ভাবনা বেশী। কেননা এর যাতাযাতের চিহ্ন থেকে দেখা যাচ্ছে এটা তালাইমালাই থেকে তালওয়াদি যাবার রাস্তাকে যে শুকনো নালাটা ছেদ করে গেছে সেটার ভিতরেই আনাগোনা করে থাকে। সেখানে ইতিপূর্বেই একজন মানুষ বাঘের হাতে মারা পড়েছে এবং ও পথে প্রায়ই লোক চলাচল করে থাকে। অন্য হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছে উপত্যকার ঢালটার সংযোগস্থলে যেখানে লোক চলাচল অনেক কম; এমন কি লোকের পায়ের স্পর্শ যেখানে কোন দিনই বিশেষ পড়েনি। তবে সেখান দিয়ে বাঘ সাধারণতঃ নীলগিরি জেলা থেকে আসা যাওয়া করে থাকে। সুতরাং ওখানে যে বাঘটা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সেটা খুব সম্ভবতঃ মানুষখেকোটা নয়। অতএব ঠিক হ'ল আমি নালার সঙ্গে সড়কের সংযোগস্থলটার কাছেই বসব।

এখন আমার কাজ হলো কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়া।

বেলা একটার সময় হাগির সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজে বসলাম। খাবার শেষে সে রাতের জন্য এক প্যাকেট স্যাণ্ডউইচ দিয়ে দিল। নিঃসন্দেহে এটা একটা বিশেষ বরণীয় উপহার। আড়াইটার ভিতর আমি গিয়ে মাচানে বসলাম। সকালে মড়াটাকে শকুনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমার সহকারী চারজন ডাল পালা দিয়ে ঢেকে রেখে গিয়েছিল। এখন তারা ঐ ডালপালা সরিয়ে দিল। এবং ফিরে গেলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বনজুড়ে নেমে এলো গভীর নিস্তব্ধতা। যা ধারণা করেছিলাম তাই ঠিক। কোন পথিককেই আর এই পথে দেখা গেল না।

মানুষখেকোটার আবির্ভাবে লোকে ভয়ে বিকেলের পরে এই পথটা ব্যবহার ছেড়েই দিয়েছে। বিশেষ করে এই পথে যখন মানুষখেকোটা ইতিমধ্যেই একজন মানুষ হত্যা করেছে তখনতো আর কথাই নেই। কিন্তু বিকেল পাঁচটার কিছুক্ষণ পরে আমি যখন তালাইমালাই গ্রামের দিক থেকে কতকগুলো লোককে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসতে দেখলাম তখন অবাক না হয়ে পারলাম না। কাছে আসতে যখন বুঝলাম লোকগুলো আমারই সহকারী চারজন আর তাদের সঙ্গে বন্দুক নিয়ে সুইজা আসছে তখন আমি আরও অবাক হলাম। তারা এসে জানালো যে, মানুষখেকোটার নতুন এক হত্যার খবর দিতে এসেছে। সত্যমঙ্গলম-চামরাজ নগর সড়ক থেকে সতের মাইল দূরে ডিমবাম গ্রামের কাছাকাছি একটা কুয়ো থেকে জল বয়ে নিয়ে আসার সময় একজন স্ত্রীলোক মানুষখেকোটার হাতে মারা পড়েছে। সংবাদটা দেবার জন্য হাগিই তাদের পাঠিয়েছে। কেননা, সে বুঝেছে যে আমি যে বাঘটার জন্য সারারাত্রি মাচানে বসে অপেক্ষা করবো সেটা আদপেই মানুষখেকো নয়। তাই সে সময় নষ্ট করতে না দেবার জন্যই খবর পাঠিয়েছে। হাগি নিশ্চিত যে কোন বাঘই রাত্রে একটা মোষের দেহের অর্ধেকটা খেয়ে সতের মাইল দূরে গিয়ে পরদিন সকালেই আবার একটা স্ত্রীলোককে মারতে পারে না।

হাগির মতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। তাই মাচান থেকে নেমে এলাম। নালাতে আনাগোনাকারী এই বাঘটার সন্ধান করা থেকে বিরত হয়ে আমি বাঘটাকে তার শিকারের বাকী অর্ধেকটা খাবার জন্য আহ্বান জানালাম। আমি ফিরে গেলে হাগি তখনই আমাকে ডিমবাম গিয়ে স্ত্রীলোকটা যে জায়গাটাতে মারা পড়েছে তার কাছে বাঘটাকে মারার জন্য একটা স্থান নির্বাচন করে নেবার প্রস্তাব করল। যদিও এটা ঠিক যে, স্ত্রীলোকটির আত্মীয়-স্বজন তা'র মৃতদেহটা দাহের জন্য সরিয়ে নিয়েছে তবুও মৃতদেহটার খোঁজে মানুষখেকোটার রাত্রে ফিরে আসবার ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমি হাগির কথা মেনে নিয়ে তখনই রওনা হলাম। যদি কোন দরকারে লাগে এই ভেবে আমার চারজন সহকারীকেও সঙ্গে নিলাম।

অন্ধকার হয়ে আসায় আমরা তালাইমালাই থেকে রওনা হবার সময়ই

গাড়ীর হেডলাইট জেলে দিলাম। এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটা নদী জালের মত ছড়িয়ে আছে। বছরের এ সময় অবশ্য নদীগুলো শুকনো। এক মাইলের মাথায় রাস্তাটা প্রথম নদীটার মধ্যে খাড়া নেমে গেছে। নদীর ওপারে রাস্তাটার উপরে আমাদের গাড়ীর আলোয় একদল বাইসনের একসারি চোখ জ্বলজ্বল করে উঠ্‌ল। নদীটা পার হবার জন্য গাড়ীর গীয়ার বদলাতেই তার শব্দে বিচলিত হয়ে সমস্ত দলটা দৌড়ে পালাল। দাঁড়িয়ে রইলো দলের পাণ্ডা ঘেটি সেটি। কোনরকম নড়চড় নেই। রাস্তার মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে। মাথাটা খানিকটা নিচুকরে সামনের পা দিয়ে মাটি আচরাচ্ছে সে। স্পষ্টই বুঝলাম, ভাবখানা তার সুবিধের নয়। রীতিমতো ভীতিজনক।

সাধারণতঃ বাইসন নিরীহ প্রাণী। মানুষের দেখা পাওয়া মাত্র বা কথা শোনা মাত্র এরা পালিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বাইসনটার হাবভাব অন্যরকমের। সে হয়তো ভেবে নিয়েছে বাইসনের দলটাকে বিপদে ফেলবার জন্য আমি ফাঁদ তৈরী করেছি। আবার এও হতে পারে যে সে গাড়ীর আলোগুলো দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই আলোর পিছনে যে মানুষ আছে তা হয়তো সে বুঝতে পারেনি। যাই হোক, আমি তার আক্রমণের ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। কেননা, তাকে আক্রমণ করতে দেওয়া মানেই পরিবর্তে তাকে গুলি করতে হবে। তার হাব-ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, সে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আক্রমণ করবে। আর সে যদি সফল হয় তবে আমার গাড়ী খানা এবং আমরা যারা গাড়ীর মধ্যে আছি তাঁদের সবাই নাহলেও অন্ততঃ তাদের কয়েকজন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নীলগিরি বনে টিপ্পাকাড়ু রোডের উপর একটা মাল বোঝাই ট্রাককে উল্টিয়ে ফেলতে আমি নিজের চোখেই দেখেছি। ট্রাকের ড্রাইভারটা তলায় পিষ্ট হয়ে মারা যায়। আর তার সহকারী ও ক্লীনারকে বাইসনটা গুঁতিয়ে এবং পা দিয়ে মাড়িয়ে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।

এই অপ্রীতিকর ঘটনাটির কথা তড়িতের মত গতিতে আমার মনের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল। গুলি না করে বাইসনটাকে তাড়াবার অন্য চেষ্টা করবার একটা মাত্র উপায়ই আমার সামনে খোলা আছে। সে উপায়টা নিহিত আছে স্টুডিবেকার গাড়ীটার ডানদিকে লাগানো পুরানো ক্যাক্সন হর্নটার মধ্যে। ঐ পুরানো ক্যাক্সনটার সাহায্যে আমি অনেকগুলো হাতিকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছি। এর পরিষ্কার এবং পিতলের বাসনের মত উঁচু পর্দার আওয়াজে

তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এই পুরানো হর্নটার স্প্রিং লিভারটা আমি খুব ঘন জোরে জোরে টিপতে লাগলাম। একটা ভয়ানক শব্দে জঙ্গলের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ হয়ে গেল। বাইসনটার কাছে শব্দটা নরক উজার করে দেওয়া বীভৎসতার মত ঠেকল। সে মাথা তুলল। ভয়ে তার চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। পরবর্তী মুহূর্তেই সে বাঁশের জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর আমি যেতে যেতে অনেকগুলো জীবজন্তুর সাক্ষাৎ পেলাম। রাত হবার আগেই এত সকাল সকাল এটা একটু অস্বাভাবিকই বটে। যে কোন কারণেই হোক শিকারীদের মধ্যে এটা একটা শুভ লক্ষণ বলে সংস্কার আছে। একবার চিতল হরিণ আর একবার দু'টো সম্বর রাস্তা পার হয়ে গেল। একটা ভালুক পথের ধারে মাটি খুঁড়ছিল। আমার গাড়ীর আলোয় সে বিচলিত হল। আমরা হোনাথেট্টির অরণ্যাবাসটা ছেড়ে এক ফার্লং যেতেই দেখলাম একটা চিতাবাঘ আমাদের বাঁ দিক থেকে লাফিয়ে ডান দিকে চলে গেল। সে ডিমবাম থেকে সাত মাইল দূরে দুটো ছোট পাহাড়ের মধ্যেকার উপত্যকাটার দিকে যাচ্ছে বোঝা গেল।

রাত আটটার একটু আগে আমরা গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছলাম। আমরা বেশ খানিকটা তাড়াতাড়িই পৌঁছেছিলাম। অথচ রাস্তাটা শুধু খাড়াই আর আঁকাবাঁকাই ছিল না, মাঝে মাঝে রাস্তার উপর লম্বা লম্বা ঘাস জন্মে রাস্তার চিহ্নই সম্পূর্ণ মুছে গেছে। ঐ ঘাসের ভিতর যথেষ্ট পাথরের চাঁই ঢাকা পড়ে রয়েছে। গাড়ী গিয়ে ওতে ধাক্কা লাগলেই গাড়ীর সামনের তলা বা তার যে কোন অংশ খসে যেতে পারে। এই সমস্ত জায়গাতে আমাকে মন্থর গতিতে গাড়ী চালিয়ে আসতে হয়েছে।

মহীশূর শহর থেকে চামরাজ নগর শহরটা অতিক্রম করে সমতলে অবস্থিত সত্যমঙ্গলম্ নামক বড় শহরটা পর্যন্ত যে প্রধান রাস্তাটা চলে গেছে তার উপরই ডিমবাম নামক ছোট্ট গ্রামটা অবস্থিত। সত্যমঙ্গলমেই ওই অঞ্চলের পুলিশের ও বনবিভাগের প্রধান কার্যালয়। আরও পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে গেলেই কোয়েম্বাটোর শহর।

ডিমবামে মাত্র কয়েকটা কুঁড়েঘর ও একটি চায়ের দোকান আছে। দোকানটির মালিক হলো একজন মোপলা। এই মোপলারা কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের পশ্চিম উপকূলে যে আরব ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে এসে

কয়েকজন হিন্দু মালয়ালী স্ত্রীলোককে বিবাহ করে ওখানেই থেকে গিয়েছিল তাদের বংশধর। তারা বহুবছর ধরে তীক্ষ্ণবুদ্ধির সঙ্গে তাদের ব্যবসা চালিয়ে এসেছে। এমন কোন ব্যবসা নেই যেখানে তাদের কিছু লোক প্রাধান্ত বিস্তার করেনি। ডিমবামের চায়ের দোকানটা ঐ মোপালাটা এবং তার তিনটে স্ত্রী মিলে দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই খুলে রাখত। পরিশ্রান্ত লরি-চালকেরা সত্যমঙ্গলম থেকে খাড়াই পথটা ধরে যোল মাইল উঠে আসবার পর এখানে দিনে অথবা রাত্রির যে কোন সময় বড় এক মগ ধুমায়মান চা বা কফির সঙ্গে গরম গরম ভাত তরকারী পাবার আশা করতে পারত। এই খাদ্যের সঙ্গে আরেকটা অপরিহার্য বস্তু পাওয়া যেত এবং বিনা মূল্যেই। তা হচ্ছে এই দীর্ঘ পথ উঠে আসবার পর তাদের লরিগুলো এখানে এসে যখন ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়াতে থাকৃত তখন লরির উত্তপ্ত রেডিয়েটরের জন্ত ঠাণ্ডা জল।

ভ্রমণকারীদের জন্য এখানে একটা বিশ্রাম আবাসও আছে। উপত্যকাটার সামনে বেশ কয়েক হাজার ফুট উঁচু যে খাড়া পাহাড়টি দাঁড়িয়ে আছে তারই উপর চমৎকার পরিবেশে সেটি অবস্থিত। পাহাড় থেকে উপত্যকার ভিতর কিছুদূর পর্যন্ত ঘন বন। কিন্তু তা হলেও যে রাস্তাটা বনের ভিতর দিয়ে চলে গেছে সেটা দেখা যায়। সত্যমঙ্গলম উপত্যকটার ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। আর কোয়েম্বাটোর শহর অবস্থিত উপত্যকার একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে।

আমি যে বাঘটাকে অন্য গল্পে 'রাজনগরের বিভীষিকা, নামে অভিহিত করেছি এই পাহাড়ের পাদদেশের বন সেই বাঘটার কথা বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছে। কেননা ওখানেই আমি বাঘটার সন্ধানে বেশ কয়েকটা দিন উত্তেজনার মধ্যে কাটিয়েছিলাম।

সন্ধ্যাকালে বিশ্রাম আবাস থেকে দেখলে উপত্যকটা পরীর দেশের মত মনে হয়। অপূর্ব সে শোভা। দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকারের মধ্যে বিভিন্ন বনের হাজার হাজার বৈদ্যুতিক আলো তীব্র উজ্জ্বলতা নিয়ে দীপ্যমান। স্পষ্ট দেখা যায় বহু বহু দূরে কোয়েম্বাটোর শহরের আলো। মেঘশোভিত আকাশের প্রান্তে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

আমি গাড়ি চালিয়ে মোপলাটার দোকানের উদ্দেশ্তে চললাম। কেন না যে সমস্ত খবর আমি চাইছিলাম ও'টাই ঐ সমস্ত খবরের কেন্দ্রস্থল। দোকানটার উচ্চাকাঙ্খী মালিক আবদুল কুন্নি আমাকে ভালভাবেই চিন্‌ত।

হাগির খামারে যাবার পথেই আমি এখানে নেমে এককাপ চা খেয়ে গিয়েছি এবং আমার এখানে আসার উদ্দেশ্যে কি তা তাকে বলেছি। সে উচ্চকণ্ঠে আমাকে স্বাগত জানাল এবং তার খ্যান খ্যানে গলায় উত্তেজিত ভাবে খবর উগরিয়ে দিতে লাগল।

"সাহেব বাঘটা যখন ঠিক এখানেই আছে তখন আপনি এটার খোঁজে তালাইমালাই যাচ্ছেন কেন? আজ সকালেই ঠিক এই দোকানটার পিছনের কুয়োটার কাছে সে একটা স্ত্রীলোককে মেরেছে। বাস্তবিকই এটা একটা ভয়ঙ্কর আপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চা করবার জন্য এবং একশ কি তারও বেশী লড়ির জন্য দৈনিক যথেষ্ট জল আমাদের দরকার হয়। তাই আমাদের অনেক বার করে কুয়োতে যেতে হয়। এবং বহুবালতি জল আনতে হয়। সংবাদটা শুনবার পর থেকে আমার তিনটে স্ত্রীই আর ওখানে যেতে চাইছে না। অবাধ্য নিষ্কর্ম্মা কোথাকার? তিনটেই সমান! লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব বলে আমি তাদের ভয় দেখিয়েছি। এমনকি প্রহারও করেছি, কিন্তু তারা এক জোট হয়ে আমাকেই ওখানে গিয়ে দেখতে বলছে। কেউ কি আমাকে এই দাসীগুলোর হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে না? সাহেব আপনাকেই আমি প্রশ্নটা করছি। আমার পক্ষে চায়ের দোকানটা তুলে দেওয়া কি সম্ভব? তাই আজ থেকে দৈনিক বেতনে একটা ঝি রাখতে বাধ্য হয়েছি। এতে পয়সা খরচ। আর সব ছেড়ে দিলেও সে ভীষণ কুড়ে এবং একটা নোংরা জীব বিশেষ। শুনুন সাহেব, সৎ-মুসলমান হিসাবে বাইরের লোককে ঘরের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়ার রেওয়াজ আমাদের মধ্যে নেই। তবে আপনি তো মশাই আমাদের বন্ধু। দয়া করে আমার স্ত্রীদের একটু বুঝিয়ে জল আনতে যেতে বলুন না।"

কাজটা বড়ই কঠিন। তাছাড়া আব্দুল কুদ্দির স্ত্রীদের আত্মহত্যা করতে বাধ্য করার চাইতেও বড় কাজ আমার করবার ছিল। কেননা, মানুষখেকোটা যখন কাছে পিঠেই আছে তখন তাদের পক্ষে কুয়োতে জল আনতে যাওয়া তো আত্মহত্যা করার পথেই পা দেওয়া। স্ত্রীলোকগুলো যে বেঁকে বসেছে এ জন্য আমি তাদের দোষ দিতে পারলাম না। আসলে বৃদ্ধ আব্দুল কুদ্দি স্ত্রীদের জন্য যতটা না ভাবত টাকা-পয়সার জন্য তার চাইতে বেশী ভাবত। কিন্তু আমি আর তাকে সে কথা বললাম না। তাতে সে মনে আঘাত পেত।

আমি তাই তখন তাকে বললাম, "আব্দুল কুদ্দি আমি বাঘটাকে মারতে

এসেছি। সুতরাং তুমি আমাকে সাহায্য করলেই তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর সময় নষ্ট করে দরকার নেই। আমাকে বল ঠিক কি ভাবে স্ত্রী লোকটা মারা পড়েছে।"

"সাহেব এ আর বলবার কি আছে! সে জল আনতে গিয়েছিল এবং জল নিয়ে ফিরে আসছিল। শয়তান বাঘটা ঝোপের ভিতর থেকে লাফিয়ে এসে তাকে টেনে নিয়ে বনের মধ্যে চলে যায়। সে আর্তনাদ করে উঠে। কিন্তু বাঘটা তাকে ঘাড়ে ধরে নিয়ে চলে যায়। সে সময় আর একজন স্ত্রী-লোকও জল আনতে যাচ্ছিল এবং ঘটনাটা যখন ঘটে তখন সে ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে ছিল। সে সব কিছুই দেখেছিল এবং শুনেছিল। সে-ই দৌড়ে পালিয়ে এসে আমাদের সব বলে। তখন আমার দোকানে পাঁচ-ছ'জন খদ্দের ছিল। আমরা দৌড়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম এবং প্রায় দু'ঘণ্টা আটকে পড়ে থাকলাম। অন্য ড্রাইভাররা এসে যখন সামনের দরজায় আঘাত করল তখনই প্রথম আমরা দরজা খুলি। তারপর দল বেঁধে কুয়োর কাছে যাই মেয়েটির কোন চিহ্নই সেখানে দেখতে পাইনি। তার ভাঙা জলের পাত্রটা যেখানে পড়ে গিয়েছিল সেখানেই রয়েছে। এর বেশী আর বলবার কিছু নেই।"

"আব্দুল কুন্নি, এর আগে কোনদিন এখানে বাঘ এসেছে বলে শোনা গিযেছিল কি? অন্য কেউ কি বাঘটাকে দেখেছিল? জানোয়ারটার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল কি?' পর পর দ্রুত আমি প্রশ্নগুলো ছুঁড়লাম।

বৃদ্ধ ব্যক্তিটি কেবল জোরে হেসে উঠল। তারপর বলল, একটা বাঘের কি আর বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে? সব বাঘই দেখতে এক রকম। একটা মাথা আছে, চারটে পা আছে আর একটা লেজ আছে। তা ছাড়া আপনি এ-রকম বোকার মত প্রশ্ন করছেনই বা কেন? আমি তো আগেই বলেছি যে অন্য যে স্ত্রী লোকটা কুয়োতে জল আনতে যাচ্ছিল সে ছাড়া আর কেউই বাঘটাকে দেখেনি। সে বলেছে এটা একটা বিরাটাকৃতির জানোয়ার এবং মূর্তিমান শয়তানের মত দেখতে।"

স্ত্রীলোকটার দেহাবশেষের কাছে সম্ভব হলে পরদিন মাচান বেঁধে বসা যেতে পারে এই ভেবে আমি আর একটা মাত্র প্রশ্ন করলাম—স্ত্রীলোকটির মৃতদেহ কি খুঁজে পাওয়া গেছে?"

আব্দুল কুন্নির ব্যঙ্গপূর্ণ দেঁতো হাসির মাত্রা বেড়ে গিয়ে দাঁতগুলো আরও

বেরিয়ে এল। "সাহেব কি আর ওটার খোঁজ করতে যাবে? আপনি কি ভেবেছেন আমরা পাগল? আমরা বেঁচে আছি, আর স্ত্রী লোকটা মারা গেছে। আমরা খোঁজ করতে যাই আর বাঘটা আমাদের দেখুক এবং আমাদের মেরে ফেলুক।"

মানুষখেকোটার হাতে নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ বা মৃতদেহের উচ্ছিষ্টাংশ পাওয়া গিয়েছে কিনা এ প্রশ্ন করে ইতিপূর্বে বহু বারই আমি বিভিন্ন ভাষায় ঐ একই উত্তর পেয়েছি।

এটা স্পষ্ট বোঝা গেল যে, মোপলাটা আর কোন কাজে আসবে না। আমাকেই সব কিছু করে নিতে হবে এবং একটা পরিকল্পনা খাড়া করতে হবে। সুতরাং আমি নিজের জন্য দু'মগ করে চা দিতে বললাম। তারপর আধো অন্ধকার দোকানটার একেবারে কোণের টেবিলটাতে বসব বলে ঠিক করলাম এবং সর্বোত্তম পন্থা কি হ'বে তা ভাবতে ভাবতে ধূমপান করব বলে পাইপটা বার করে নিলাম।

আমার প্রথম কাজ হ'ল আব্দুল কুপ্পি যে আবার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করা। আমি তাকে খোলাখুলিই বললাম যে, আমি এই ব্যাপারে একটা উপায় বার করবার চেষ্টা করব, সে যেন আমাকে একটু একা থাকতে দেয়।

বৃদ্ধলোকটার ব্যবহার সেদিন বিশেষ করে বিরক্তিকর মনে হচ্ছিল। একটা দুষ্টু হাসি হেসে সে বলল, "আপনি যদি বাঘটাকেই চান তবে তাকে ডাকুন না?" তারপর সে চা দিতে চলে গেল।

চারটে পথ প্রায় সোজাসুজি এসে ডিমবামে চায়ের দোকানটার সামনে মিলেছে। অবশ্য তার মধ্যে দু'টো হচ্ছে পথ। আর বাকী দু'টো গ্রামটার ভিতর দিয়ে যে প্রধান সড়কটা উত্তরে মহীশূর পর্যন্ত এবং দক্ষিণে সত্যমঙ্গলম পর্যন্ত গিয়েছে তারই অংশ। আমি ইচ্ছে করেই গ্রামের প্রধান সড়কটাকে দু'টো বলে ধরেছি। কেননা, বাঘটা রাস্তাটা অতিক্রম করে উত্তরে ডিমবামের দিকে যেতে পারে। তৃতীয় পথটা এসেছে তালাইমালাই এবং তালওয়াদি থেকে। আমি এইমাত্র সেই পথটা ধরেই এসেছি। আর চতুর্থ পথটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। পথটা বিশ্রাম আবাসের পিছন থেকে বেরিয়ে বনের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে দশ মাইল কি আরও বেশী দুর পর্যন্ত চলে গেছে। উপত্যকাটার সামনে ডিমবামের যে খাড়া পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছে,

যেটা পূর্বদিকে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী কাবেনী নদীর অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত, পথটা মোটামুটি সেটার ধার ঘেঁষে চলে গেছে।

চতুর্থ পথটার উপর দিয়ে লোক যাতায়াত কম ছিল বলে ঐ রাস্তাটার উপরই সর্বাধিক জীবজন্তু, বিশেষ করে বাইসন আর সম্বর দেখা যেত। প্রচুর ভালুকও পাহাড়টার উপর দিয়ে যাতায়াত করত। আর অত্যন্ত ঘন জঙ্গলে আর বন্ধুর পার্বত্য পথে কাবেরী নদী পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ মাইল পাড়ি দিতে গিয়ে বাঘেরা প্রায়ই গুপ্ত খাড়াই পথে এই পাহাড় অতিক্রম করে যেত। প্রায় দশ মাইল যাবার পর পথটা সরু হয়ে গিয়ে একটা পায়ে হাঁটা পথে পরিণত হয়েছে এবং পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁশগাছের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গেছে। ঐ জঙ্গলে বাঘের চাইতে হাতী, বাইসন আর সম্বরই বেশী। কেননা, ঐ অঞ্চল আঁটালুতে ভর্তি আর বাঘ কখনই আঁটালু পছন্দ করে না।

বাইরে আলকাতরার মত মিশমিশে অন্ধকার। এ রকম রাত্রিতে স্পট লাইট ফেলে জীবজন্তুর খোঁজ করতে হয়।

নিতান্ত ভাগ্যক্রমে বাঘটাকে রাস্তা পার হতে দেখা যেতে পারে এই আশা নিয়ে স্পট লাইট ফেলতে ফেলতে মহীশূরের দিকে যে রাস্তাটা গেছে সেটা ধরে মাইল পাঁচেক মোটরে করে গিয়ে ফিরে আসা সম্ভব। ঠিক একই ভাবে উল্টোদিকের সরুপথ ধরে গিয়েও ফিরে আসা যেতে পারে। তালাইমালাই থেকে যে পথে এসেছি সে পথেও খোঁজ করা যেতে পারে। কিন্তু পূর্বদিকে চতুর্থ পথটা ধরে মোটরে যাওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। ঐ রাস্তাটা ধরে যেতে হবে হেঁটে। কেননা, রাস্তাটা, মোটেই মোটর চলাচলের অনুকূল নয়। বড় বড় পাথরে এবং গর্তে যেমন রাস্তাটা ভর্তি, তেমনি সেটি ঢালু হয়ে এঁকে বেঁকে গিয়েছে। এর উপর দিয়ে মোটরে যেতে গেলে ঘন ঘন গিয়ার বদলাতে হবে এবং তার ফলে যে শব্দ হ'বে তা শুনে মানুষখেকোটা বা অন্য কোন জীবজন্তু রাস্তার কাছাকাছি থাকলে পালিয়ে যাবে এবং আমি তাদের দেখতে পাব না।

যে কোন রাস্তা ধরেই অভিযানটা শুরু হতে পারে। আমি তখনও রীতিমতো সতেজ ছিলাম। পূর্বের দিকের রাস্তাটা হেঁটে ঘুরে আসতে সময় সব থেকে বেশী লাগবে বলে ঠিক করলাম প্রথমে ঐ রাস্তাটাই ঘুরে আসব।

চা খাওয়া শেষ করে আব্দুল কুদ্দির দাম মিটিয়ে দিলাম। সেই চার জনকে বললাম যে আমি পূর্বদিকের পথটা ঘুরে আসছি ততক্ষণ তারা যেন ঘুমিয়ে নেয়। তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় বেশী দিনের নয়। তারা ভাবল আমার

বোধহয় মাথা খারাপ। আব্দুল কুদ্দির সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের আমাদের কথাবার্তা তার কানে যেতে সে বলল, "তোমরা ভাবছ উনি পাগল, না? এটা নতুন নয়। আমি ওঁকে বহুদিন যাবৎই পাগল দেখে আসছি।"

যে কোন কারণেই হোক বৃদ্ধ বদমায়েসটা ঐ দিন আমাকে কেবলই বিরক্ত করছিল। আমি পয়েন্ট ৪০৫ রাইফেলের সঙ্গে লাগানো টর্চটা পরীক্ষা করলাম। রাইফেলে লাগান টর্চটাকে অনুসন্ধানের কাজে ব্যবহার করতে গেলে রাইফেলের নলটা বার বার বেকিয়ে বেকিয়ে তা করতে হবে এবং তা হবে কষ্টকর। তাই আমি অন্য একটা পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিশ্রাম আবাসটায় গেলাম। তার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সত্যমঙ্গলমের মিটমিটে আলোগুলোকে বেশকয়েক মিনিট ধরে দেখলাম। সত্যিই বেশ সুন্দর লাগছিল আলোগুলো। তারপর বিশ্রাম আবাসটার পিছন থেকে যে রাস্তাটা পূর্বদিকে চলে গেছে ঐ রাস্তাটা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। কয়েক গজ গিয়ে প্রথম বাঁকটা ঘুরতেই চায়ের দোকানের সামনে টাঙান পেট্রোম্যাক্সের আলোর আড়ালে পড়ে গেলাম। দোকানের কথাবার্তাও আমার কানে আসা বন্ধ হয়ে গেল।

মানুষখেকোটা শিকার নিয়ে পালিয়েছে এবং কোথায় যে গেছে জানা নেই। তবে দেখা গেছে বাঘে শিকার নিয়ে কখন কখন আধমাইল বা তারও বেশী দূরে চলে যায়। অবশ্য সাধারণতঃ তারা অতটা দূর যায় না। বাঘটা স্ত্রী-লোকটাকে সকালে মেরেই মৃতদেহের খানিকটা খেয়ে নিয়েছে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়বার আহার করবার জন্য বাকী অংশটার কাছে সন্ধ্যার পর তার ফিরে আসবার কথা। এখন সন্ধ্যা সাড়ে ন'টার কিছু বেশী। সাধারণতঃ বাঘেদের যা অভ্যাস তাতে মানুষখেকোটার এতক্ষণে দ্বিতীয়বার আহার করবার জন্য ফিরে আসবার কথা। এমনও হতে পারে যে এই মুহূর্তেও হয়তো সে আহারে রত রয়েছে। আবার এও হতে পারে যে, ইতিমধ্যেই আহার শেষ হয়ে গিয়েছে।

যদি সে পেটপুরে খেয়েই থাকে তবে সে নিশ্চিতভাবেই জলের খোঁজ করবে। তিনটে জায়গায় জলের খোঁজে তার যাবার সম্ভাবনা। সবচেয়ে কাছেরটা একটা জলাশয়, যেটার পাশ দিয়ে আমি যে রাস্তাটায় চলেছি সেই রাস্তাটা গেছে এবং যেটা এখানে থেকে বড় জোর এক ফার্লং দূরে। দ্বিতীয়টা একটা ঝরণা যাতে সব সময়েই জল থাকে। সেটা মাইল

দুয়েক দূরে মহীশূরের যাবার রাস্তাটাকে অতিক্রম করে। তৃতীয়টা হচ্ছে আর একটা ঝরণা, সেটা ভিমবাম থেকে তিনমাইল দূরে ডালাইমালাই রোডের উপর। আজই সন্ধ্যায় ও'টা আমি পার হয়ে এসেছি। আমি যে জলাশয়টার দিকে চলেছি ঐ জলাশয়টা ছাড়াও ঐ ঝরণা দু'টোর যে কোন একটার যে কোন জায়গায় নেমে বাঘটা জল খেতে পারে। সুতরাং জলাশয়ের ধারে তার দেখা পাবার সম্ভাবনা খুবই কম। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে আমি জলাশয়টার দিকেই এগিয়ে চলেছিলাম। বেশ কয়েকজোড়া সবুজে নীল আলো দেখেই প্রথম বুঝতে পারলাম যে, আমি জলাশয়টার কাছে এসে গেছি। আমার টর্চের উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকিয়ে ওগুলো উঁচু নিচু হতে লাগল। চিতল হরিণ! হ্যাঁ, একদল চিতল হরিণই। হয় তারা জলাশয়টার দিকে চলেছে নয়তো সেখান থেকে ফিরে আসছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলাম এবং তাদের শান্তভাবে চলে যাবার সুযোগ দেবার জন্য আলো নিভিয়ে দিলাম। যদি ওদের কেউ আলোর পিছনে মানুষ আছে বলে বুঝতে পারে তাহলে অবশ্যই সে সতর্কতাসূচক ডাক ডেকে সঙ্গীদের সাবধান করে দেবে। বাঘটা যদি কাছে পিঠে কোথাও থাকে তবে ঐ ডাক শুনে সেও সাবধান হয়ে যাবে। কিন্তু আমি সেটা চাই না।

রাতটা ছিল আলকাতরার মত মিশমিশে কালো। চিতল হরিণগুলো একটুও ডাকল না। গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। একটা ঝিঁঝিঁও ডাকছিল না। এটা মোটেই সুবিধের নয় বরং রীতিমতো ভীতিজনক।

আমি আবার ধর্চ জ্বালালাম। জলজ্বলে চোখগুলো অন্তর্হিত হলো। অর্থাৎ হরিণগুলো নিঃশব্দেই সরে পড়ল। তারা সতর্কতাসূচক আওয়াজ না করায় ভালই হয়েছে, তারা যাতে আমার গন্ধ না পায় অথবা টর্চের আলো দেখতে না পায় সেজন্য আমি আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে তাদের যথেষ্ট দূরে সরে যাবার সময় দিলাম। তারপর নিঃশব্দে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। সামনের বাঁকটা দিয়ে বাঁয়ে ঘুরলেই আমি জলাশয়টাতে পৌছে যাব।

ঠিক এরকম সময় আমি জলের মধ্যে পড়ে পড়ে জলকাদা ছিটোনোর, গড়াগড়ি দেবার এবং জল ছুঁড়বার শব্দ শুনতে পেলাম। একটা হাতী জলাশয়টাতে আনন্দে স্নান করছে। আমি আবারও থেমে গেলাম। হাতিরা অধিকাংশ মানুষের মতো স্নান ভালবাসে। একবার তারা স্নান আরম্ভ করলে মুখ দিয়ে জল ছুঁড়ে, জল খেয়ে, স্নান করে। আর নেচেকুঁদেই সে ক্ষান্ত হয় না,

যদি কোন হাতি একা থাকে তবুও সে জলে পড়ে খেলা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জন্তুটা কখন স্বেচ্ছায় চলে যাবে সে অপেক্ষায় থেকে আমি সময় নষ্ট করতে পারছিলাম না। অপর পক্ষে আমি যদি এগিয়ে যাই এবং হাতিটা আমাকে দেখতে পায় তবে সে ভয়ে চীৎকার করে উঠবে। আর তাতেও বাঘটা কাছাকাছি থাকলে বুঝতে পারবে সচারচর দেখা যায় না এমন কোন বিচিত্র জীব বনের মধ্য দিয়ে চলেছে, যাকে দেখে হাতিটা বিচলিত হয়েছে। তাই আমার পক্ষ থেকে হাতিটাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে যাওয়া রীতিমতো বোকামি।

তখন আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আমি টর্চটা উঁচু করে গাছের মাথায় আলো ফেললাম যাতে হাতিটা ঐ আলো দেখতে পেয়ে পালিয়ে যায়। অবশ্য আমি এই সময় যথেষ্ট দূরে ছিলাম। তারপর বাঁকটার মুখ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে আবার গাছের মাথায় আলো ফেললাম। এবার আমি সফল হলাম। স্নানের আনন্দ উপভোগের এত কোলাহল সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল।

হাতিটা বিরাট দেহটা কাদার ভিতর থেকে তুলে দাঁড়ানোর শব্দ পেলাম এবং সে তালে তালে ভারী পাগুলো থপ্ থপ্ করে কাদার মধ্যে ফেলে ধীর গতিতে পাড়ের দিকে উঠে গেল। তারপর বাষ্পনির্গত হ'বার মত হিস্হিস শব্দ হতে লাগল।

আমার টর্চ থেকে নিক্ষিপ্ত আলোতে হাতিটা বিচলিত হলেও স্নানের শেষ বিলাস বালুকাস্নান থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবার ইচ্ছা তার ছিল না, এই মুহূর্তে সে বালুকা স্নানই করছিল, সে নিজের দেহের উপর বালি ছিটিয়ে দিচ্ছিল।

আমি তাকে সময় দিলাম এবং তাকে আরও বিচলিত করবার জন্য একগাছ থেকে আরেক গাছে টর্চের আলো ফেলে চল্লাম, হিস্ হিস্ শব্দ সত্যিই থেমে গেল। একটু পরেই জলাশয়ের পাশের ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে অলস গতিতে মৃদু চড় চড় শব্দ তুলে হাতিটা চলতে লাগল। আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। হাতিটা চলে গেছে, ঠিক এই সময় আমি গাছের ডাল ভাঙবার জোরে আওয়াজ পেয়ে বুঝতে পারলাম হাতিটা খাবার জন্য থেমেছে কিন্তু সে তখন অনেকটা দূরে তাই আমার চলার শব্দে তার ভয় পাওয়ার আশংকা নেই।

আমি দু'চার পা হেঁটে বাঁকটা পার হয়ে জলাশয়টার ধারে গিয়ে পেঁাছুলাম

আমার সামনেই অন্ধকারাচ্ছন্ন স্বচ্ছ জলাশয়টা রাত্রের বাতাসে শীতল হতে আরম্ভ করেছে। ইতিমধ্যেই জলাশয়ের উষ্ণ বক্ষ থেকে বাষ্প উঠে শীতল বায়ুতে মিশতে আরম্ভ করেছে. আমার টর্চের আলোয় শত শত উজ্জল লাল আলোর কণিকা জলের মধ্যে এখানে ওখানে মরকতমণির মত ঝলমলিয়ে উঠল। জলের একদিকটার কোণ থেকে ব্যাঙের মিলিত কণ্ঠের ডাক ভেসে এল। আমি এগিয়ে যেতেই দলে দলে ব্যাঙ কুল থেকে জলের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ল। পিছনের পা দিয়ে জোরে লাফাতে লাফাতে তারা জলাশয়টার মাঝখানে যেয়ে উপস্থিত হয়ে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। তাদের ক্ষুদ্র চোখগুলো হাজার হাজার মরকত মণির মত জ্বল্‌তে জ্বলতে আলো বিচ্ছুরিত করতে লাগল।

হাতিটা যাতে আমার আগমনে সতর্কতা সূচক চীৎকার না করতে পারে সে জন্য আমি এত কষ্ট করেছি, অথচ আমাকে কিনা ব্যাঙগুলোর মতো নগণ্য জীবের হাতে পরাজয় স্বীকার করতে হলো। দৈবক্রমে বাঘটা তখন ওখানেই ছিল। ব্যাঙগুলোর চলার শব্দ সে নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছিল সম্ভবতঃ আমাকে ও আমার টর্চের আলোও সে দেখতে পেয়েছে।

আমার ভাগ্য ভাল যে বাঘটা রাস্তাটার উপর ছিল না। সে ছিল জলাশয়ের ওপরে। সে ওখানে জল খেতে এসেছিল, নতুবা ব্যাপার অন্যরকম ঘটে যেত। এরকম অবস্থায় কোন সাধারণ বাঘ নিঃশব্দে সরে পড়ত এবং আমি তার উপস্থিতির কথা জানতেই পারতাম না। কিন্তু এ বাঘটা গর্জন করতে লাগল, কেবলই গর্জন করতে লাগল, জলাশয়ের ওপারের অন্ধকারের ভিতর থেকে তার ভীতিকর গর্জনের শব্দ জলাশয় পার হয়ে আমার কানে এসে পেঁছুতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলাম। থেমে গেলাম অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য।

এই ভীতিকর শব্দের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য যে ব্যাঙগুলো ভাসছিল তারা ডুব দিতেই তাদের ছোট ছোট মরকতমণির মত লাল চোখগুলো মুহুর্তে হারিয়ে গেল। যেন সুইচ টিপে আলোগুলোকে কে যেন নিভিয়ে দিল। যে দিক থেকে বাঘটা গর্জন করছিল সেই দিকে জলের ধারে ঠাণ্ডা বালির উপরে যে অসংখ্য ব্যাঙ্ শুয়ে ছিল তারা নিরাপদ হবার জন্য যথেষ্ট শব্দের সৃষ্টি করে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল এবং জলের মধ্যে তারা তাদের ছোট ছোট পাগুলো এলোমেলো ভাবে চালিয়ে পাগলের মত জলাশয়টার মাঝখানটাতে চলে গেল।

গর্জন যেমন হঠাৎ আরম্ভ হয়েছিল তেমন হঠাৎই আবার থেমে গেল। ব্যাঙগুলোও একেবারে চুপ করে গেল। জলাশয়টার বিপরীত পাড়ে জলের ধার পর্যন্ত যে ঝোপজঙ্গলগুলো গজিয়ে ছিল আমি টর্চটা ঘুরিয়ে সেগুলোর উপর ফেলতে লাগলাম এই আশা নিয়ে যে বাঘটার চোখগুলো হয়তো আলোতে জলতে দেখব। কিন্তু আমি তেমন কিছুই দেখতে বা শুনতে পেলাম না। আলোতে শুধু জঙ্গলগুলোই দেখা গেল। মনে হলো যেন মৃত্যুকালীন নিস্তব্ধতা সব কিছুকে গ্রাস করেছে।

বাঘটা অদৃশ্য হয়েছে, সে কি পালিয়ে গেছে? সাধারণ বাঘ হলে তাই করত, কিন্তু বাঘটা সাধারণ বাঘ হলে টর্চের আলো দেখে গর্জন করত না। এ জানোয়ারটা একেবারেই সাধারণ নয় কেননা মানুষের আগমনে সে রেগে গিয়েছিল এবং একেবারেই ভয় পায়নি। তবে ঐটাই কি মানুষ-খেকোটা?

আমি ভীতভাবে চারদিকে তাকাতে লাগলাম সামনের দিক থেকে আমি নিরাপদ। ওদিক থেকে আক্রমণ করতে হলে বাঘটাকে জলের ভিতর দিয়ে এসে তা করতে হবে এবং আমি জানি তার পক্ষে সেটা করা খুবই অসম্ভব। তবে জলাশয়টার পাশ দিয়ে ঘুরে এসে আমাকে যে কোন পাশ থেকে অথবা পিছন থেকে আক্রমণ করা তার পক্ষে বিচিত্র নয়। আর সেটা যদি করে তবে আমি নিরুপায়। আমার তখন করার কিছুই থাকবে না।

কেবল একটা উপায়ই আছে। তাড়াতাড়ি সেই উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করলাম। আমি নিচু হয়ে পুকুরের ঢালু পাড়টা দিয়ে জলের মধ্যে নেমে গেলাম এবং পা দিয়ে মাটি স্পর্শ করে দেখে দেখে পা ফেলতে ফেলতে যতটা তাড়াতাড়ি পারি জলাশয়টার মাঝখানে এগিয়ে চললাম। আমি জানতাম জলাশয়টা খুব গভীর নয় এবং যে দিক থেকেই আক্রমণ আসুক না কেন আমি ওখানে নিরাপদ থাকব। কোন বাঘ এমন কি মানুষ খেকো বাঘও জলের ভিতর দিয়ে এসে আক্রমণ করবে না। অন্ততঃ আমার যতদূর অভিজ্ঞতা তাতে আমি এটাই জানি। আর যদি সে জলের ভিতর দিয়ে এসে আক্রমণ করেই তবে অবস্থা আমার সম্পূর্ণ অনুকূলে এসে যাবে। বাঘটা আমার কাছে এসে পেঁছুনোর অনেক আগেই আমি তাকে খোলা জায়গায় পেয়ে যাব এবং সে আমার সম্পূর্ণ আয়ত্বের মধ্যে এসে যাবে।

জল আমার হাঁটুর একটু উপরে পেঁছেছে এমন সময় বাঘটা আবার গোঁ-গোঁ করে উঠল। এবার সে বেশ জোরে জোরেই গোঁ-গোঁ করতে লাগল, প্রায়

গর্জনই করতে লাগল বলা চলে। পথটার পাশের জঙ্গলটা থেকে ডাকটা আসছিল। আমি যদি সময় মত জলাশয়টার মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ না করতাম তবে সে ঠিক আমার উপর এসে পড়ত। আমি এখন তার আয়ত্বের বাইরে চলে গেছি দেখে সে রাগে গরগর করছিল। কিন্তু প্রকৃতই কি আমি তার আয়ত্বের বাইরে গেছি? পরবর্তী কয়েক মুহূর্তেই এর উত্তর পাওয়া যাবে। একটা ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ হলাম, যে বাঘটার সঙ্গে আমার বর্তমানে বোঝা পড়া চলছে সেটা কোন সাধারণ বাঘ না, সেটা মানুষ-খেকোটাই। কেন না এটির ব্যবহারের মধ্যে যে বিদ্বেষ প্রকাশ পাচ্ছিল তা থেকেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। হাগির বুলেটের আঘাতে জানোয়ারটা শয়তানে পরিণত হয়েছে।

আমার অপেক্ষা করা বৃথাই গেল, বাঘটা আর বেরিয়ে এলো না। বাঘটা যেমন অপ্রত্যাশিত ভাবে গরগর করতে আরম্ভ করেছিল, তেমন অপ্রত্যাশিত ভাবেই সে থেমে গেল। চারপাশের অন্ধকারের সমুদ্রের মাঝখানে নৈঃশব্দ এসে আমাকে গ্রাস করল। আমি একটু একটু করে ঘুরতে ঘুরতে চারদিকে টর্চের আলো ফেলতে লাগলাম। আশা ছিল যে টর্চের আলোয় হয় জানোয়াটার চোখগুলো জ্বলতে দেখা যাবে নয়ত বাঘটার ডোরাকাটা দেহটাকে এক ঝোপ থেকে আর এক ঝোপে চুপিসাড়ে যেতে দেখা যাবে। কিন্তু আমি বাঘটার কিছুই দেখতে বা শুনতে পেলাম না।

সে রাত্রে যে অসংখ্য ব্যাঙ প্রথমে হাতিটার আগমনে তারপর আমি এবং সবশেষে বাঘটার আবির্ভাবে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিল তারা আমি জলের মধ্যে হাঁটতে আরম্ভ করতেই একে একে দূর জলের তলায় চলে গেল। কিন্তু তারা বেশীক্ষণ জলের তলায় ডুবে থাকতে পারল না, শ্বাস নেবার জন্য জলে ভেসে উঠতে হ'ল।

প্রাণভয়ে নিঃশ্বাস নেবার জন্য তা'রা একে একে নিঃশব্দে জলের উপর ভেসে উঠতে লাগল। আমার টর্চের আলো জলের উপর যে জায়গাটার পড়েছিল সেখানেই আবার দেখা গেল শত শত রক্তিম বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখ ভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

মনে হলো যেন চায়ের দোকানটা ছেড়ে আসবার পর অনেক সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম মাত্র সাড়ে দশটা

বেজেছে। বাঘটার চলবার অপেক্ষায় আমাকে আর কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে। অবশ্য সে আদৌ চলবে কি না তারও ঠিক নেই।

আমি আর জলের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। ক্রমশঃ ঠাণ্ডা করছিল এবং জলের উপর থেকে বাষ্পের কুণ্ডলী ঠিকমত ভেদ করে যেতে পারছিল না। আবার আমি এও বুঝতে পারলাম যে যদি পথটাতে ফিরে যাই এবং মানুষখেকোটা পথে কোন জায়গায় আমার অপেক্ষায় লুকিয়ে থাকে তবে আমি তার খপ্পরে গিয়ে পড়ব। আমি নিশ্চিত বুঝেছিলাম যে সে চলে যায়নি, আমি কখন জল থেকে উঠে যাব সে সেই সুযোগের প্রতীক্ষা করছে।

মাঝরাত্রি এসে গেল, ঠাণ্ডা কাঁটার মত গায়ে বিঁধতে লাগল। এতক্ষণে আমার মনে হল একাদিক্রমে টর্চ জ্বালিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। কেননা পাঁচটা ব্যাটারী ফুরিয়ে যেতে পারে। আর আমার রাইফেলের সঙ্গে অন্য যে টর্চটা আটা আছে কোন অবস্থাতেই তার ব্যাটারীগুলো ব্যবহারের ঝুঁকি নেওয়া যায় না। কেন না গুলি করবার সময় আমার নিশানার নির্ভুলতা নির্ভর করছে ঐ ব্যাটারীগুলোর উপর সুতরাং আমি সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো নিভিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গভীর অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেলাম। আর তখনই আমার নজরে পড়ল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না।

যাইহোক আমি জলে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ কোন বিপদের ভয় নেই। কোন জানোয়ার এলে আমি অন্ততঃ তার আসবার শব্দ শুনে সাবধান হতে পারব।

খুব শীঘ্রই তাই ঘটল, দেখা গেল একটা হাতি এগিয়ে আসছে। এটা সম্ভবতঃ সেই হাতিটা খানিক আগে যেটির স্নানে আমি বিঘ্ন ঘটিয়েছি আবার অন্য হাতিও হতে পারে। আমি স্থির ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম, সে আমাকে দেখতে পায়নি এবং আমার কোন আওয়াজও পায়নি। বাতাস তার দিক থেকে আমার দিকে বইছিল। সুতরাং সে আমার গন্ধও পায়নি, আমার মনে হল আমি নিরাপদ, কেননা আর যাইহোক তার দৃষ্টি শক্তি এত ক্ষীণ যে সমস্ত জলাশয়টার উপর পুরু বাঁধের মত যে ঘন কুয়াশা জমে ছিল তার দৃষ্টি তা ভেদ করে যেতে পারবে না এবং সে আমাকে দেখতেও পাবে না।

আমি শুনতে পেলাম সে খুব জোরে জোরে ভুস্ ভুস্ করে শুঁড় দিয়ে বাতাস ছাড়ছে। এর পর তার শুঁড় দিয়ে খুব জোরে জল টেনে নেওয়ার এবং সেই

জল মুখের মধ্যে এবং গায়ে ছিটিয়ে দেওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। সে কেবলই জল খেয়ে চলল। মনে হ'ল সে যেন গ্যালন গ্যালন জল খেয়ে ফেলল।

শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করলো যে স্নান করবে। পরে তাই বিরাট বিরাট পা দিয়ে থপ্ থপ্ আওয়াজ তুলে সে জলের ভিতর দিয়ে জলাশয়টার মধ্যস্থল লক্ষ্য করে আমার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। আমি ভেবে দেখলাম, সেটা ঘটতে দেওয়া উচিত নয়, তাই সোজাসুজি তার চোখে টর্চের আলো ফেললাম।

ঐ রাত্রিতে বিচিত্র আচার ব্যবহারের জীব জন্তুর সঙ্গে দেখা হওয়াই যেন আমার ভাগ্যে লেখা ছিল। জীবজগতের নিয়মানুসারে হাতিটার উচিত ছিল টর্চের উজ্জ্বল আলো দেখে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাওয়া, কিন্তু সে রকম কিছুই সে করল না। বরং সে তীব্র আওয়াজ করে এবং শুঁড়টা গুটিয়ে নিয়ে আমাকে তেড়ে এলো।

হতভম্ব হয়ে আমি পাঁচ ব্যাটারীর টর্চটা আমার বাঁ দিকের বেল্টের ফাঁকে রাখতে গেলাম, যাতে দুটো হাত দিয়ে রাইফেলটা ভাল করে ধরতে পারি। কিন্তু রাখতে গিয়ে সেটা পড়ে গেল জলে।

ওটার খোঁজ করার আর সময় ছিল না। কেন না, হাতিটা বিপজ্জনক ভাবে কাছে এসে পড়েছে। আমি '৪০৫ রাইফেলটা কাঁধে তুলে ওর নলের সঙ্গে যেন ছোট টর্চটা লাগান ছিল বাঁ হাত দিয়ে বোতাম টিপে সেটা জালিয়ে দিলাম। অন্ধকারের বুক চিরে টর্চের আলো পড়তেই আমি হাতিটার আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য হাতিটার মাথার একফুট উপর দিয়ে গুলি ছুঁড়লাম।

বন বিভাগ থেকে মত্তহাতির কথা ঘোষণা করা হয়নি সুতরাং যতক্ষণ পারা যায় তাকে হত্যা না করে আমায় সেটিকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে। আমি তাকে খুব বেশী কাছে আসতে দিয়ে ভুল করেছি এবং সোজাসুজি তার চোখে টর্চের আলো ফেলাও উচিত হয়নি।

এই চিন্তাগুলো মনের মধ্যে খেলে যেতেই আমি ফাঁকা আওয়াজটার ফলাফলের অপেক্ষা করতে লাগলাম। এখনও যদি সে এগোতে থাকে আমাকে বাধ্য হয়েই দ্বিতীয় গুলিতে আঘাত হেনে তাকে থামাতে হবে। নতুবা সে আমাকে মেরে ফেলবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সৌভাগ্যক্রমে ঐ একটা গুলিতেই কাজ হল। বৃহৎ জানোয়ারটা চারখানা পা-ই মাটির মধ্যে দৃঢ় ভাবে গেঁথে দিয়ে থামবার চেষ্টা করল। কিন্তু পূর্বগতির

টাল সামলাতে না পেরে সে সামনের দিক এগিয়ে এসে হাস্তকর ভাবে পিছলিয়ে পড়ল। তারপরে সার্কাসের হাতির মত পিছন দিকে ভর দিয়ে বসে সে সম্পূর্ণ থেমে গেল।

সে ভয় পেয়েছে দেখে আমি সাহস পেলাম। আবার তার মাথার একটু উপর দিয়ে একটা গুলি ছুড়লাম। হাতিটা ফিরে দাঁড়িয়ে পালাল।

এই গোলমাল থেমে যেতেই আমি বিরক্তি বোধ করতে লাগলাম। আবার আশ্বস্তও হলাম। দু'টো গুলির শব্দে মানুষখেকোটা নিশ্চয়ই পালিয়েছে। সুযোগ পাবার আশা আর নেই। আর এখন আমি বিপদ মুক্ত। তাই শেষ পর্যন্ত আমি জল থেকে উঠে এলাম।

ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ডিমবামে ফিরে চললাম। আমি জানতাম আমাকে অতি অল্প রাস্তা যেতে হবে। কিন্তু সারা রাস্তাটা আমাকে চলতে হবে মানুষখেকোটার ভয়ে। গুলির শব্দে জলাশয়টার কাছ থেকে সরে গেলেও সে পথটার কোন জায়গায় হয়ত আমার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে।

অবশেষে নিচুতে উপত্যকাটার চারিদিকের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সত্যমঙ্গলমের আলোগুলোকে টিপ্ টিপ্ করে জ্বলতে দেখে আমার মানসিক উত্তেজনা প্রশমিত হল। বিশ্রাম গৃহে প্রবেশ করে আমি ভিজে প্যাণ্ট ছেড়ে ফেললাম, সঙ্গে অন্য কোন প্যাণ্ট না আনায় এক রকম বিনা কপড়েই শুতে হলো।

হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়তেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। সব জানালাগুলো বন্ধ করে শুয়েছিলাম বলে ঘরের ভিতরটা অন্ধকার ছিল। কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম সাড়ে ন'টা বাজে।

আমি তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে প্যাণ্টটা পড়ে নিলাম। তখনও প্যাণ্টটা ভিজে ছিল। দরজায় আবার ধাক্কা পড়ল। ধাক্কার মধ্যে তাগিদের মাত্রা এবার বেশী এবং বারান্দায় বহুকণ্ঠের গুনগুন শুনতে পেলাম।

এগিয়ে গিয়ে সামনের দরজাটা খুলে দিলাম। আমার সামনেই আব্দুল কুদ্দি, তার তিনটে স্ত্রী এবং আরও চার পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে। সকলেরই চোখে মুখে দারুণ উত্তেজনা। বোঝা গেল চায়ের দোকানটা বন্ধ। অবশ্যই সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে।

সাহেব, শীগগির আসুন। আমরা জল আনার যে মেয়েটা রেখেছিল তাকে এইমাত্র বাঘে নিয়ে গেছে, সকলের কণ্ঠে উত্তেজনা।

আমি কথাটা শুনে তাড়াতাড়ি রাইফেলটা কাঁধে নিলাম। সঙ্গে কিছু কার্তুজ নিয়ে দলটার সঙ্গে দ্রুতগতিতে চায়ের দোকানে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে সে বিস্তারিতভাবে ঘটনাটা বললো। খুব জোর আধ ঘণ্টা আগে মেয়েটা একগাদা রান্নার বাসন চায়ের দোকানের পেছনের কুয়োতে ধুতে নিয়ে যায়। বাসন ধুতে গিয়ে সে যাতে সময় নষ্ট না করে সেজন্য আব্দুল কুদ্দির স্ত্রীদের একজন পেছনের দরজা থেকে তার ওপর নজর রাখছিল। আঠার বছরের যুবতী মেয়েটি একমনে ঝুঁকে পড়ে বাসন মাজছিল।

দোকানের পেছন দরজা থেকে যে স্ত্রীলোকটি তার ওপর নজর রেখেছিল সে হঠাৎ দেখতে পেল মেয়েটার পেছনে কি যেন একটা নড়ছে। স্ত্রীলোকটি সেদিকে তাকিয়েই দেখে, একটা বাঘ চুপি চুপি পেটের ওপর ভর দিয়ে মেয়েটার দিকেই এগিয়ে আসছে। কিন্তু মেয়েটার সেদিকে খেয়াল নেই। স্ত্রীলোকটি আর্তনাদ করে চেঁচিয়ে মেয়েটাকে সতর্ক করে দিল। মেয়েটি সেই আওয়াজ শুনতে পেয়ে উঠে দাঁড়াতেই বাঘটা এসে পড়ে তার ঘাড়ের উপর। মুহূর্তে মেয়েটাকে কামড়ে ধরে এক লাফে ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে যায়। বাঘটা তার শিকার নিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে হতভাগিনীর আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল একবার।

স্ত্রীর জোরালো চেঁচামেচিতে আব্দুল কুদ্দি ও তার পরিবারের অন্যান্য লোকেরা চিৎকারের কারণ কি জানবার জন্য বাড়ির পেছনের দরজায় ছুটে গেল। তারপরেই তারা দলবেঁধে গিয়ে হাজির হয়েছে বিশ্রামাবাসে। আশ্চর্য তো মানুষ খেকোটা সকাল ন'টার সময় যে জায়গাটায় সে একটা মানুষ মেরেছে ঠিক সেখানেই কয়েক ঘণ্টা আগে আবার আর একজনকে হত্যা করেছে! মানুষ খেকোদের ইতিহাসে এধরনের ঘটনা বিরল।

আমি সবাইকে ঘরের মধ্যে থাকতে বলে কুয়োর কাছে এগিয়ে গেলাম। কিছু ধোয়া আর কিছু আ-ধোয়া বাসন এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। বোঝা গেল যে, মেয়েটা যখন মন দিয়ে কাজ করছিল ঠিক সেই সময় বাঘটা তাকে অতর্কিত আক্রমণ করে। যেখানে বসে মেয়েটা বাসন মাজছিল বাঘটা দৌড়ে এসে সেখানে থামতেই সেখানকার ভিজে মাটিতে তার পা পিছলে গিয়েছিল এবং সেখানেই বাঘটার থাবার একটা টানা দাগ পড়েছে।

আশেপাশের জমি শুকনো থাকায় অন্য কোথাও বাঘের পায়ের কোন দাগ

দেখা গেল না। আর বাঘটা খুব তাড়াতাড়ি তার শিকারকে নিয়ে যাওয়ার কোন রক্তের দাগই পড়েনি।

আব্দুল কুন্নির দ্বিতীয় স্ত্রী অর্থাৎ যে বাঘটাকে দেখেছিল সে আমায় দেখিয়ে দিল, বাঘটা কোনদিকে গেছে। আমি সেই দিক লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম। কুয়োর ঠিক পরেই জমিটা হঠাৎ শেষ হয়ে ল্যাণ্টানার শক্ত ঝোপ শুরু হয়েছে এবং তারপরেই জঙ্গল। কোন বাঘের পক্ষে শিকার মুখে নিয়ে ঐ কঠিন বাধা পেরিয়ে যাওয়ার কথা কল্পনাযও আনা যায় না। কোন জানোয়ারের পক্ষেই এই বাধা ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই অন্য কোন পথ আছে। আমি তাই সেই পথটা সন্ধান করতে লাগলাম। সত্যিই একটা সরু পথ দেখা গেল। পথটা মাটির ফুটচারেক ওপর দিয়ে একটা ল্যাণ্টানার ডালের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে। বর্ষাকালে কুয়োটার চারপাশে যে জলার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে শিকড় খুঁজে খেতে এসে শুয়োরের দল এই পথটা তৈরী করেছে। বাঘটা মৃতদেহটাকে টানতে টানতে নিশ্চয়ই এই সুরঙ্গ পথ দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে আমিও ঐ একই পথ দিয়ে, কোন সময় হামাগুড়ি দিয়ে আবার কোন সময় নীচু হয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

কয়েক গজ এগোতেই সেই মর্মন্তুদ ঘটনার প্রথম প্রমাণ চোখে পড়ল। সরু পথটার দুধার দিয়ে যে ল্যাণ্টানার ঝোপ গেছে তাতে শাড়ীর কতকগুলো ছেঁড়া সুতো এবং রক্ত দেখা গেল। খুব সম্ভব মেয়েটা এখানে এসে বাঘের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছিল এবং বাঘটা তখনই তাকে একেবারে মেরে ফেলে।

এরপর একনাগাড়ে রক্তের দাগ দেখতে পেলাম। এবং শাড়ীর টুকরাও ল্যাণ্টানার ঝোপে আটকে থাকতে দেখলাম। সুড়ঙ্গটা একজায়গায় মোড় নিয়েছে। ঐখানে শাড়ীর বাকী অংশটা একটা কাঁটা ঝোপে বিঁধে গিয়েছিল। মনে হয় বাঘটা ক্ষেপে গিয়ে তার শিকারকে এমন টান মেরেছে ফলে শাড়ীর আর শায়ার টুকরো ছিঁড়ে গিয়ে গাছের কাঁটার সঙ্গে ঝুলছে। গায়ের আবরণ যখন সম্পূর্ণ এদিক ওদিক ছিটকে বেরিয়ে গেছে তখন কেবল মাটিতে রক্ত পড়তে পড়তে চলে গেছে। এবং সুড়ঙ্গটা বরাবর বীভৎস লাল দাগ রেখে গেছে।

আমি অনুমান করতে পারলাম না, শিকারকে নিয়ে বাঘটা কতদূর গেছে। খুব সম্ভব দোকান থেকে চীৎকার আর আর্তনাদ শুনতে পেয়ে সে

কোন নির্জনতর জায়গায় শিকারকে নিয়ে গিয়েছে। অন্ততঃ আমার অনুমান তাই। যদি সে কাছাকাছি কোথাও থেকে থাকে এবং আমাকে যে কোনদিক থেকে বিশেষ করে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে তবে এই মরণ ফাঁদ স্বরূপ সুড়ঙ্গটার মধ্যে আমি একেবারে তার খপ্পরে পড়ে যাব।

এই মনে করে আমি বাঘটার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় কিনা শুনবার জন্য বার বার থামতে লাগলাম। বাঘের পিছু নিলেই বাঘ গরগর করে জানিয়ে দেয় সে কোথায় আছে। ওটা করার কারণ হচ্ছে সে রেগে যায় বলে, কিছুটা আবার অনুসন্ধানকারীকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবার জন্য। অবশ্য আরও একটা কারণও আছে। সে এইভাবে গরগর করে নিজের সাহসটাও বাড়িয়ে তোলে। বাঘ চিরকাল শিকারের পিছু পিছু অনুসরণ করে এসেছে। তাই অন্যে তার পেছন নিয়েছে একথা চিন্তা করা বাঘের পক্ষে অশোভন এবং ভীতিকর অভিজ্ঞতা। আমি একটুও শব্দ শুনতে পেলাম না। বক্রগতিতে এগিয়ে যাওয়া সুড়ঙ্গটার ভেতর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

একসময়ে ল্যান্টানার ঝোপ শেষ হয়ে বন শুরু হল। সুড়ঙ্গটাও শেষ, আমি তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলাম। রক্তের ছাপটা ঘাসের ওপর দিয়ে গিয়ে বকুল আর বাক্সফুলের বাগানের মধ্যে চলে গেছে। বাঘটা যদি আমার উপস্থিতি টের না পেয়ে থাকে এবং আমি যে তাকে অনুসরণ করেছি তা বুঝতে না পেরে থাকে তাহলে সে এতক্ষণে নিশ্চয়ই তার ভোজন শুরু করেছে। আর যদি আমার অস্তিত্ব বুঝতে পারে তাহলে সে কেটে পড়বে নতুবা মৃতদেহটার আশেপাশে আমার অপেক্ষায় ওৎ পেতে থাকবে। এমনকি সে সামনের থেকে লাফিয়ে এসে আমাকে বাধা দিতে পারে অথবা যে কোন পাশ থেকে বা পেছন থেকে আমার পেছু নেবে।

হঠাৎ কিছুদূরে একটা কাককে ডেকে উঠতে শুনলাম। কাকটা এক নাগাড়ে ডেকে চলেছে। আমার বুঝতে বেশী অসুবিধা হল না। কাকটা বাঘ আর মৃতদেহটাকে লক্ষ্য করছিল এবং শীগগিরই যে ভোজটা পাওয়া যাবে সেটা উপভোগ করার জন্য দল ভারী করার জন্য উত্তেজিত স্বরে চেঁচাচ্ছিল।

বনের দিক থেকে নির্ভুল ভাবে শব্দের দিক ঠিক করা এবং দূরত্ব অনুমান করা জটিল ব্যাপার। বায়ুপ্রবাহ বনের ঘনত্ব এবং ভূমির বন্ধুরতা মিলে অসুবিধার সৃষ্টি করে। সমতল জমিতে অবস্থা এত খারাপ হয় না, কিন্তু এ রকম পাহাড়ী জায়গায় শব্দের দিক এবং দূরত্ব প্রায়ই ঠিক করা যায় না।

আমি অনুমান করলাম, কাকটা প্রায় ষাট সত্তর গজ দূরে আছে। শুকনো পাতার উপর পা পড়ে যাতে আওয়াজ না হয় সেদিকে সতর্ক হয়ে এক পা এক পা করে চুপি চুপি এগোতে লাগলাম। কতদূর এগিয়ে ছিলাম বুঝিনি। হঠাৎ বাঘটার খাওয়ার আওয়াজ পেলাম। প্রথমে হাড় ভাঙবার জোর আওয়াজ তারপর হাড় চিবানোর এবং মাংস ছিঁড়বার আওয়াজ পেলাম।

কাকটা তখনও একটানা কর্কশ স্বরে ডেকে চলেছে। আমার ধারণা হল, আমি বাঘটা থেকে ত্রিশ গজ কি তারও কম দূরত্বে আছে। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম।

এই সময়ে বাঘটার থেকে কাকটাকে নিয়েই অসুবিধা বেশী। কারণ কাকটা গাছের ডালে বসে ডেকে যাচ্ছে। আমাকে সে যেই দেখতে পাবে অমনি ডাকা বন্ধ করে দেবে। আবার উড়েও চলে যেতে পারে। কিন্তু মানুষ খেকোটা কাকের ডাকা বন্ধ হয়ে গেলেই বুঝতে পারবে যে, কাকটা নিশ্চয়ই কিছু একটা দেখে ভীত হয়েছে। তখন সে তার নিজের বিপদ সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠবে। কারণ কাক অন্য পাখীকে ভয় করে না এবং অন্য জীবজন্তুর উপস্থিতিকেও ভ্রূক্ষেপ করে না। একমাত্র মানুষকেই তারা ভয় করে।

আমি এখনও কাউকে ভয় পাইয়ে দিই নি। শ্লথ গতিতে ভীষণ সতর্কতার সঙ্গে নীচু হয়ে কখনও এদিক ওদিক দেখে, থেমে গিয়ে, পা ফেলবার আগে সামনের মাটি ভাল করে লক্ষ্য করে, এমন কি বাঘটার হাড় চিবানো ও মাংস ছেঁড়ার শব্দ মুহূর্তের জন্যও থেমে গেলে পেছন দিকটা দেখে এগোতে লাগলাম, আমি যতক্ষণ শব্দ শুনতে পাব ততক্ষণ বুঝতে পারবো বাঘটা কোথায় আছে। আর থেমে গেলেই বাঘটা কোথায় আছে তা অনুমান করা কঠিন হয়ে পড়বে। তখন বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

হঠাৎ গোটা অরণ্যে নেমে এল অস্বাভাবিক মৌনতা। প্রথমে কারণটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে নিমেষের মধ্যে রহস্যটা বুঝতে পারলাম। কাকটা ডাক থামিয়ে দিয়েছে। বাঘটাও হাড় চিবানো ও মাংস ছেঁড়া বন্ধ করেছে! নিঃসন্দেহে কোন জানোয়ার যাচ্ছে। এরপর আমি কাকটাকে দেখতে পেলাম। কিন্তু এবার আর সময় নেই। সে আমাকে দেখে ফেলেছে এবং ডানা পটপটিয়ে সে আর একটা গাছে চড়ে গেছে।

আমার আন্দাজ ঠিকই, শয়তানটা চলতে শুরু করেছে। সে কি আমার

কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না আমার দিকেই এগিয়ে আসছে? সে কি আমাকে আক্রমণ করতে আসছে না পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে? এই প্রশ্নগুলো দ্রুত আমার মনের মধ্যে পাক খেতে লাগল। আমি আড় চোখে লক্ষ্য করলাম কাকটা আবার উড়ে একেবারে আমার চোখের আড়ালে চলে গেল।

আমি পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম রাস্তায়। হঠাৎ দেখলাম চালাক কাকটা আবার ফিরে এসেছে এবং যেখানে প্রথমে বসেছিল সেখানে গিয়েই বসেছে। সে আমাকে ভাল করে দেখবার আশায় মাথাটা পাশে ঘুরিয়ে ডেকে উঠল। আমি যে বিপদজ্জনক সেটা বুঝতে পেরে আবার উড়ে গিয়ে আর একটা গাছে বসল এবং আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো।

আমি এইবার চারিদিকে তাকাতে লাগলাম। ঘাড়ে একটা ক্ষীণ ব্যাথা অনুভব করলাম। আমার দেহের সব কটি কোষ সতর্ক করে দিল যে, আমি দারুণ বিপদের মধ্যে রয়েছি। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, মানুষ খেকোটা আমাকে আক্রমণ করার জন্য তৈরী হচ্ছে কিন্তু আমি সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে আশে পাশের ঝোপ ঝাড়গুলো ভালো করে লক্ষ্য করেও বাঘটাকে দেখতে পেলাম না। জঙ্গল ভয়ানক নিস্তব্ধ। একটাও পাতা নড়ছে না। পাখী পোকামাকড় এবং লম্বা লম্বা ঘাসগুলো পর্যন্ত চুপচাপ। আমি বৃথাই তাকিয়ে থাকলাম। কোথাও কোন শব্দ নেই। বুঝতে কষ্ট হলো না যে, বাঘটা সম্পূর্ণ আচমকা চরম আঘাত হানার জন্য তৈরী হচ্ছে।

ঠিক এই সময়ে বহুবছর আগে একটা ঘটনার ছবি মনে ভেসে উঠলো। ঘটনাটি একটি গভীর জঙ্গলের মাঝে একটা জলাশয়ের ধারে ঘটেছিল। রাতটি ছিল জ্যোৎস্নারাত। একটা স্ত্রী সম্বর খুব সতর্কতার সঙ্গে জলাশয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সেটি চিৎকার করে মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে লাগল। বাঘটা সম্বরটার অপেক্ষায় কয়েক গজ সামনে ওৎ পেতে বসেছিল। সে মুহূর্তের মধ্যে তার বুদ্ধি হারিয়ে ফেললে। সে ভাবলো তার শিকার পালাচ্ছে, সে তাই লাফিয়ে সম্বরটাকে অনুসরণ করল। কিন্তু সম্বরটা প্রথম ছুটেই অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল ফলে সে পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

আমিই ঐ একই কাজ করলাম। কিন্তু আমি বেশীদূর দৌড়ুতে পারলাম না। কারণ তার আগেই বুঝতে পেরে গিয়েছি বাঘটা এখানেই রয়েছে। আমি খুব জোরে হাততালি দিয়ে কোনাকুনি ভাবে মাত্র চার পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বহুবছর আগে ঐ জ্যোৎস্নার রাতে যেমন কাজ হয়েছিল এবারও ওতে কাজ হল। মানুষখেকোটা আমার পেছন দিকে লাফিয়ে পড়ল। সে দুটো লম্বা লাফ দিয়েই থেমে গেল। ওৎ পেতে ভালো করে লক্ষ্য করতেই অবাক হয়ে গেল। তার সামনে এই অদ্ভুত ধরনের লোকটা পালাচ্ছে না। বরং ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বাঘটা যখন হতভম্ব হয়ে আমাকে দেখছে আমি তখন রাইফেল বাগিয়ে গুলি ছুঁড়লাম। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ।

গুলি খেয়ে বাঘটার আর নড়বার ক্ষমতা ছিল না। বাঘটার আর কিছু জানারও ক্ষমতা ছিল না। তবে আমি যদি বাঘটা আমার পেছনে রয়েছে এটা না জেনে সামনে না গিয়ে পেছন দিকে দৌড়ুতাম, তাহলে আজ আর আমাকে এই গল্প বলতে হতো না। কেননা, পেছন দিকে যাওয়া মানেই ছিল বাঘের মুখে পড়া। তখন মৃত্যু ছিল অবধারিত।

———

ওয়াইনাদের আতঙ্ক

৫

মহীশূর শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে কাঁকনকোটের ঘন অরণ্য অঞ্চল অবস্থিত। যুগ যুগ ধরে এই জঙ্গলে বুনো হাতির বাসস্থল। এই জেলায় যে ধরনের জঙ্গল তার প্রতি হাতিগুলোর একটা বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। এখানে বৃষ্টি প্রচুর হয়। ফলে গাছও জন্মায় বাধাহীনভাবে। বড়জাতের বাঁশগাছ, বড় বড় ঘাস আর বড় বড় গাছ একসঙ্গে মিলে এই ঘন জঙ্গলের সৃষ্টি করেছে। হাতি ও বাইসন ছাড়া অন্যকারও পক্ষে এই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবে জঙ্গলের হাল্কা এলাকায় সম্বর ও গর্জনকারী হরিণের কিছু কিছু দেখা যায়। যতই দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এগোন যায় ততই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও অরণ্যের ঘনত্ব পরস্পরের সঙ্গে তাল রেখে বাড়তে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই ঐ ঘন জঙ্গলের একচ্ছত্র অধিপতি হাতি ও বাইসন। বনের মধ্যে যে সরু রাস্তাটা গেছে মনে হয় যেন সেটা বহু প্রাচীন। এই বনে মানুষের পায়ের ছাপ পড়েছে বলেই মনে হয় না।

আরও এগিয়ে গেলে কাবেরী নদী। নদীটি উত্তর পূর্বে মহীশূর রাজ্য এবং দক্ষিণ পশ্চিমে কেরালা রাজ্যের মধ্যে স্বাভাবিক সীমান্তরেখা নির্দেশ করছে। আমার তো মনে হয়, ভারতীয় উপমহাদেশের একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিমে যে কেরল রাজ্য তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হিমালয়ের পরেই। যদিও দুই-এর মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। কেরালা হচ্ছে সমুদ্রের ধারে অবস্থিত ঘন অরণ্যের দেশ। এখানে চা কফি, দারুচিনি হয় প্রচুর। এই রাজ্যে অসংখ্য খালা ও ধীর গতির নদীও রয়েছে। লম্বা লম্বা নারকেল গাছগুলো ফলে ভর্তি। নদী দিয়ে নৌকাগুলো যখন বয়ে যায় তখন তার উপর পরে লম্বা নারকেল গাছের স্নিগ্ধ ছায়া। কেরলের সমুদ্রতীরও অতুলনীয় যা একেবারে দক্ষিণে গিয়ে শেষ হয়েছে কন্যা কুমারিকায়।

এইমাত্র যে সীমান্তরেখার কথা বললাম তারই যেদিকে কেরালা রাজ্য

সেই দিকটাতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ওপর মানানটোড্ডি শহর। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার শুরু সেই বোম্বাই থেকে এবং পশ্চিম উপকূল বরাবর দক্ষিণে বিস্তৃত। এই পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা প্রায় চার হাজার ফুট। মানানটোড্ডি শহর যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই জেলাটার নামই ওয়াইনাদ। এই ওয়াইনাদের দক্ষিণে কয়েক মাইল দূরেই হলো নীলগিরি পর্বতমালা। দক্ষিণে এছ'টি পরিচিত নীলগিরি এবং ওয়াইনাদ হিসেবেই। এই দু'জায়গাতেই বৃষ্টিপাত হয় প্রচুর, জমিও উর্বর। ফলে সব ধরনের গাছই এখানে জন্মায়। সমস্তরকম ফসলের চাষেরও উপযুক্ত জায়গা।

সব দিক থেকে এই দু'টি অঞ্চল আরামপ্রদ হলেও এখানে জোঁকের সংখ্যা বেশী। বর্ষাকালে তো এদের সংখ্যা বেড়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে। তাছাড়া জঙ্গলী আঁটালুও এই জঙ্গলের অভ্যন্তরে সবচেয়ে বেশী। এই আঁটালুগুলি গায়ের যে কোন জায়গায় কামড়াতে পারে। আর একবার যদি সে সুযোগ পায় তবে কামড়াতে কামড়াতে যে কোন লোকের দেহকে বিষাক্ত করে তুলবে। সর্বাঙ্গ ভর্তি হয়ে যাবে চুলকানিতে। দিনরাত্রি সবসময় চুলকিয়েও শান্তি পাওয়া যায় না।

জোঁক আর আঁটালু যে শুধু মানুষের রক্ত শুষে খায় তাই নয়। ওরা অন্যান্য প্রাণীর রক্তও শুষে নেয়। বাইসনেরও রেহাই নেই। বাঘ, চিতাবাঘ আর হরিণের শরীর তো এরা ঢেকে ফেলে। বিশেষ করে আঁটালুগুলো তো রক্ত খেয়ে খেয়ে এই সব প্রাণীর শরীরের নরম অংশে এমনভাবে ঝুলতে থাকে যে মনে হয় যেন আঙুরের থোকা ঝুলছে।

এই কারণেই ওয়াইনাদের জঙ্গলে মাংসাশী প্রাণী ও হরিণের সংখ্যা খুব কম। গরমের দিনগুলোতে তবু মাঝে মধ্যে বাঘ, চিতাবাঘ আর হরিণের দল এই সব অসুবিধাগুলো উপেক্ষা করেও জঙ্গলে থাকে, কিন্তু বর্ষা শুরু হলেই তারা ঝোঁক আর আঠালুর হাত থেকে বাঁচতে পশ্চিমঘাট পর্বতের আরও উঁচুতে গিয়ে হাজির হয় নয়তো পূর্ব কাঁকনকোটের শুষ্ক জায়গায় চলে যায়। যতদিন না শীত আসে ততদিন সেখানেই থাকে।

এই কারণেই একদিন যখন কাঁকনকোট থেকে মানানটোড্ডি যাবার পথে একজন পথিক বাঘের হাতে নিহত হলো তখন সকলেই সেটিকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করলো। এই অঞ্চলে বাঘ যে দু'চারটে দেখা যায় নি তা নয়, কিন্তু ব্যাপক সংখ্যায় তাদের দেখা কখনোই মেলে নি।

আর এই বাঘের হাতে কারও কোন ক্ষতি হয়েছে বলেও কারও কিছু মনে পড়ে না। তাই এবারের মানুষ খুনের ঘটনাটি কিছুদিনের মধ্যেই সকলে ভুলে গেল এবং বেশ কয়েকমাস কেটে গেল।

একদিন সীমানার ওপারে মহীশূর রাজ্যে বুনো হাতি ধরবার জন্য খেদা অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হলো। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ঘেরাও করার জন্য শ'য়ে শ'য়ে কুলি নিয়োগ করা হলো। এই ঘেরা দেওয়া জায়গার মধ্যেই হাতি গুলোকে খেদিয়ে নিয়ে আসা হবে এবং তারপরই গেট আটকে দিয়ে তাদের ধরা হবে। এজন্য অবশ্য প্রাথমিকভাবে অনেক কাজ করতে হল। গাছ কাটতে হল জঙ্গল পরিষ্কার করতে হল, বাঁশ যোগাড় করতে হল এবং তারপর জায়গা ঠিক করে তৈরী করতে হলো ফাঁদ। এই কাজের জন্য শুধু যে পরিশ্রমই প্রয়োজন তাই নয়, প্রয়োজন অভিজ্ঞ কর্মীরও। জঙ্গলের আদিবাসী কাকথা ও শোলাগা উপজাতি থেকেই অধিকাংশ লোককে সংগ্রহ করা হয়। এরা শুধু যে গাছ কাটা বাঁশ বাঁধাতেই অভিজ্ঞ তাই নয়, হাতিকে খেদিয়ে এনে বন্দী করার কাজেও এরা খুব ওস্তাদ।

হাতি ধরার এই ফাঁদ তৈরীর সময়ই বাঘটা দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার আক্রমণ ঘটালো। আর তখনই সকলে বুঝলো যে, একটা মানুষ খেকোর আবির্ভাব ঘটেছে।

তিন দিনের মধ্যেই পরপর দু'জন কাকথা উধাও হয়ে গেল। প্রথম জনের দেহের আধা খাওয়া অংশ যদিওবা পাওয়া গেল, কিন্তু দ্বিতীয় জনের কোন হদিসই পাওয়া গেল না। তবে সেই আধা-খাওয়া দেহটিকে দেখে বোঝা গেল যে সেটিকে বাঘেই খেয়েছে।

মহীশূর শহর থেকে মানানটোড্ডি যাবার আরও একটি রাস্তা রয়েছে। সেটি ভায়া কুর্গ। বহু বছর এই কুর্গ আলাদা স্বাধীন রাজ্য ছিল, তবে কিছুদিন হলো এটা মহীশূরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যদিও এই রাস্তাটি ধরে গেলে সময় কিছু বেশী লাগে কিন্তু এর দু'পাশের সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো। কাঁকনকোট রোডের মতো এটিও বাইসন ও হাতি অধ্যুষিত ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এই জঙ্গলে বাঘের তেমন দেখা মেলে না এবং এর কারণটা কি সেটা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি।

কুর্গ অঞ্চলের মানুষেরা সাধারণতঃ কুর্গী বলেই পরিচিত। এরা খুবই কর্মঠ এবং সবসময়ই আনন্দোচ্ছল। অতীতে বৃটিশের কাছ থেকে এই

কুর্গের অধিবাসীরা একটা বিশেষ সম্মান লাভ করেছিল, যা ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চলের মানুষ পায়নি। কুর্গীরা তাদের নিজেদের মধ্যে প্রত্যেকে যতখুশী অস্ত্র রাখতে পারতো, সেজন্য কোন লাইসেন্সের দরকার ছিল না। এই বিশেষ সুবিধাটি কুর্গীরা এখনও উপভোগ করে আসছে। ভারত সরকার পুরানো রীতিটিকে মেনে নিয়েছেন। এই বিশেষ সুবিধা দানের যেমন একটা ভালো দিক রয়েছে তেমনি একটা খারাপ দিকও রয়েছে। কুর্গীরা কখনই এই অস্ত্র নিজেদের মধ্যে বা অপর কোন জাতের মানুষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে সুযোগের অপব্যবহার করেনি ঠিকই, কিন্তু বন্যপ্রাণী বিশেষ করে হরিণের বিরুদ্ধে তারা অস্ত্র এত ব্যপকভাবে প্রয়োগ করেছে যে সেই অঞ্চলে আর কোন হরিণের অস্তিত্ব নেই।

আমি বেশকিছু কুর্গী পরিবারকে জানি, যাদের অধিকাংশই কফি চাষ করে। এদের যে বিশাল জমি জায়গা রয়েছে তাতে কফি ছাড়াও কমলালেবুরও চাষ হয়। আমি এদেঃই এক পরিবারে অতিথি হয়ে বেশ কিছুদিন ছিলাম এবং সেই সময়ই মানুষখেকোটার কথা আমার কানে আসে প্রথম।

আমি যে খামার বাড়ীটিতে ছিলাম সেটির অবস্থান সিঙ্গাপুর ও বিরাজকোট শহরের মাঝামাঝি জায়গায় এবং যে মানানটোড্ডি ও কাঁকনকোটে তিনজন নিহত হয়েছে সেই অঞ্চল দু'টি খামার বাড়ীটি থেকে বেশ খানিকটা দূরে। তাছাড়া আমি যে ধরনের শিকার পছন্দ করি কুর্গে তার কোন সুযোগ সুবিধে নেই দেখে আমি সঙ্গে করে রাইফেলটাও আনিনি। তাই সকালে খাবার টেবিলে আমার বন্ধু যখন প্রথম মানুষখেকোটার সংবাদ দিলেন তখন আমি কোন রকম উৎসাহ না দেখিয়ে কেবল শুনে গেলাম। তবে আমার বন্ধুর মতো আমি ও বিস্ময় প্রকাশ করলাম যে, যেখানে বাঘ বা চিতাবাঘ কারুরই কোন অস্তিত্ব নেই সেখানে মানুষখেকো বাঘ এলো কিভাবে। আমার বন্ধুটি ছাড়বার পাত্র নয়। সে প্রস্তাব করলো যে আমরা বাঘটার সন্ধানে বেরুবো এবং সেটিকে মারবো।

আমি তাকে এই ধরনের প্রস্তাবে রাজী না হওযার কথাই বললাম। আমার মতে, প্রাণীটি মোটেই পুরোপুরি মানুষখেকো নয়। সম্ভবতঃ এটি কোন অসুস্থ বা আহত বাঘ। অথবা এ হতে পারে এটি সার্কাসের কোন বাঘ পালিয়ে এসেছে এবং ঘুরতে ঘুরতে এই ঘন জঙ্গল দেখে এতে ঢুকে পড়েছে। আমার ধারণা ছিল, বাঘটা অসুস্থতার জন্য নয়তো ক্ষতের জন্য

অল্পদিনের মধ্যেই মারা যাবে। অথবা জায়গাটা সুবিধের নয় বুঝে এখান থেকে সরে পড়বে। আর অন্যত্র প্রচুর খাবার পেলে সে মানুষ মারাও ছেড়ে দেবে। এই সব কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুটিকে এও স্মরণ করিয়ে দিলাম যে আমি সঙ্গে করে কোন রাইফেল আনিনি।

আমি যার বাড়ীতে অতিথি তার নাম তিমায়া। তিনি তো আমার ধারণা যে ভুল তা নিয়ে বাজী ধরে বসলেন। তিনি বললেন যে বাঘটি যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। আর রাইফেল তার পাঁচ পাঁচটি রাইফেল রয়েছে, সেগুলির একটি নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।

আমি তখন বন্ধুটিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম যে এটা করা খুবই অন্যায় হবে, বেআইনীও। তাছাড়া তার রাইফেলের কোন লাইসেন্স নেই। আর তাঁকে লাইসেন্সহীন অস্ত্র রাখতে দেবার মানে এই নয় যে সে অ-কুর্গী যে কোন, ব্যক্তিকে তা ধার দিতে পারবে। তাছাড়া যে কোন লোকের পক্ষে, বিশেষ করে আমার মতো লোকের পক্ষে অন্যের বন্দুক ধার করে শিকার করা রীতিমতো বিরুদ্ধ কাজও।

আমার কথা শুনে তিমায়া হেসে উঠলেন এবং বললেন, "কি বুড়োদের মতো কথা বলছেন? তারপর জোরের সঙ্গে দশটাকা বাজী ধরে তিনি বললেন যে, একসপ্তাহ কাটবার আগেই বাঘটা আরেকটি মানুষ হত্যা করবে।" আমি তার কথায় রেগে গিয়ে বাজী গ্রহণ করলাম।

তিমায়াই বাজী জিতলেন। তিনদিনের মাথায় আমরা শুনতে পেলাম যে, বাঘটি আরেকজন মানুষকে হত্যা করেছে। এবারে যিনি মারা পড়েছেন তিনি একজন মহিলা। মহিলাটি কাবেরী নদীর অন্য পাড়ে কেরালা রাজ্যের সীমানার মধ্যে বসে কাপড় কাচছিল। তখনই বাঘটা আক্রমণ করে। কিন্তু কাল হলো, তিমায়ার বিনা লাইসেন্সের অস্ত্র কেরালা রাজ্যে ব্যবহার করা চলবে না।

আমার বন্ধুটি বাঘটিকে হত্যা করার জন্য তাঁর মনকে সম্পূর্ণভাবে তৈরী করে নিয়েছেন। আমার ধারণা বন্ধুটি সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির লোক। তাঁর ধারণা, বাঘটিকে মারার কাজটি তাঁকেই করতে হবে। আর তিনি আমায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, শিকারীদলের আমিও একজন।

সত্যি কথা বলতে কি আমি এ ব্যাপারে এতটুকু আগ্রহী ছিলাম না। কিন্তু ক্রমাগত তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করলে আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা তিক্ত হবে।

তিমিয়াকে আমি স্কুলজীবন থেকে চিনি। সে আমার সহপাঠি ছিল একসময়। জেদটা তাঁর আগাগোড়াই। যেমন, যখন তিনি এই জমিটা সস্তায় কেনেন তখন প্রতিবেশীদের অনেকেই বলেছিলেন এটা একেবারে অনুর্বর জমি, এখানে ফসল ভাল হয় না। কিন্তু তিমায়া প্রচুর পরিশ্রম করে জমিটাকে উর্বর করে তোলেন।

আমি এক শর্তে রাজী হলাম। শর্তটা হলো, আমি ব্যাঙ্গালোরে ফিরে গিয়ে আমার পয়েন্ট ৪০৫ রাইফেলটা নিয়ে আসবো এবং অতিরিক্ত হিসেবে আরেকটা রাইফেল সঙ্গে আনবো। আর এগুলো আনতে আমার সঙ্গে তিমায়াকেও যেতে হবে। এরপর আমরা মহীশূর শহরে ফিরে এসে গাড়ীতে করে সোজা কাঁকনকোট হয়ে কেরল সীমান্তে যাবো। আমি খানিকটা জোরের সঙ্গে বললাম, অস্ত্রের লাইসেন্স নিয়ে দুই রাজ্যের পুলিশের সঙ্গে বচসা হবার চেয়ে অতিরিক্ত ২৪০ মাইল যাতায়াতের মোটর খরচ বহন করা অনেক ভাল।

আমার প্রস্তাবে তিমায়া আপত্তি করলেন না। আমরা সেই রাতেই ব্যাঙ্গালোর গেলাম। জঙ্গলে কম করে ১৫ দিন তাঁবু পেতে থাকতে হবে বলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে আমাদের পরের দিনটা কেটে গেল। খাওয়া দাওয়ার জিনিষ জঙ্গলে তেমন মিলবে না। তাই খাবার কিনতে হলো প্রথমে। এছাড়াও শিকারের আনুষঙ্গিক আরও কতকগুলো জিনিস কিনতে হলো। যেমন টর্চের ব্যাটারী, জোঁক ও আটালুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য ডিডিটি, মশারী প্রভৃতি।

এদিকে তিমায়া হঠাৎ শুনালেন একটা অদ্ভুত কথা। তিনি বললেন, শিকারে তাঁর মন চাইছে না, তবে তিনি শিকারের তামাসাটা উপভোগ করতে সঙ্গে থাকবেন। আমি তিমায়ার কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে করলাম না।

ব্যাঙ্গালোর থেকে দ্বিতীয় দিনেই আমরা কাঁকনকোটে ফিরে এলাম। তারপরেই বাঘটা সম্পর্কে খবর যোগাড়ের জন্য গাড়ীতে করে কুলীরা যেখানে কাজ করছিল সেই জায়গাটাতে গেলাম। আমার ধারণাই ঠিক হল, খবর খুব কমই পাওয়া গেল। কুলীরা সেখানে এত সংখ্যায় কাজ করছে যে, কেউই সঠিকভাবে বলতে পারলো না বাঘটি কোথা থেকে এবং কখন দু'জন মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু একটা আতঙ্ক যে তাদের মধ্যে বিরাজ করছে সেটা ভাল করেই বুঝলাম। যে লোকদুটো হারিয়ে গিয়েছিল তাদের

কথা দিন দুয়েক কেউই লক্ষ্য করেনি। কয়েকজন পথচলতি লোক যখন দিন দুয়েক পরে কাঁচা মাংসের গন্ধ পেয়ে ব্যাপারটা কি খোঁজ করতে যায় এবং মৃতদেহগুলির অবশিষ্ট অংশ নজরে পড়ে তখনই জানা যায় যে দু'জন কুলীই বাঘের হাতে মারা পড়েছে।

এই অঞ্চলে একটা মানুষখেকো এসে আস্তানা পেতেছে সেটা অনেকেই বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু কেউই তাঁকে চোখে দেখেনি। তাদের বক্তব্য, একটা অশুভ আত্মা বাঘের বেশে এখানে হানা দিয়েছে। কুলীদের মনে ভয় এত বেড়ে গেল যে, আর একজন কুলী যদি বাঘের পেটে যায় তবে তারা কাজকর্ম ফেলে পালাবে। ফলে হাতী ধরার ফাঁদ তৈরীর কাজ যাবে বন্ধ হয়ে। এতে সরকারেও ক্ষতি হবে। কেননা বেশ কিছু উচ্চপদস্থ বিদেশীকে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন হাতি ধরা দেখাবেন বলে।

পরের দিন সকালেই আমরা কেরল সীমান্তে গিয়ে পৌছুলাম। প্রথমেই কাবেরী নদীর ওপারে যেখানে বাঘটি শেষ শিকার করেছিল সেখানে গেলাম। সেখানেও কেউ বাঘটিকে দেখেনি। তবে নদীর তীরে বাঘের পায়ের ছাপ, শিকারকে হ্যাঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ ও কয়েক ফোটা রক্তের দাগ দেখে বোঝা গিয়েছিল যে মানুষ খেকোরই আর্বিভাব ঘটেছে।

এরপর আমরা মানানটোড্ডিতে ফিরে এসে বাঘের খোঁজ করলাম। জানা গেল, প্রথম শিকার হয়েছিলেন যিনি তিনি একজন পথিক। এখানেও সেই একই কথা। একজন বনরক্ষী রেঞ্জ অফিসের কাজে নিজের ঘরে ফেরার সময় পথের পাশে চটির একটা পাটি পড়ে থাকতে দেখে। চটিটা দেখে মনে হয় না যে সেটা কেউ ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছে। তাই সে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ধরে দেখতে লাগল। এমন সময় সে নদীর ঢালু জায়গায় চটির আরেকটা পাটিও দেখতে পেল। সেটাকে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য নদীর তীর বেয়ে নেমে যেতেই দেখলো খানিকটা দূরে একটা পাগড়ী পড়ে আছে। তখন সে মাটির দিকে লক্ষ্য করল এবং কাদার ওপর বাঘের পায়ের চিহ্ন পরিষ্কার দেখতে পেল। কাদার ওপর পায়ের দাগ এত গভীর ভাবে পড়েছিল যে মনে হল বাঘটা নিজের দেহের ভার ছাড়াও অন্য ভারী কিছু টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। পাশের ঝোপের গায়ে রক্তের দাগ দেখে বোঝা গেল যে, বাঘেরই কীর্তি।

আমরা বনের রক্ষীর সঙ্গে দেখা করে তার নিজের মুখ থেকে ঘটনাটা শুনলাম। তার মুখেই সব কিছু শুনলাম। কিন্তু কোথা থেকে বাঘের

খোঁজে অভিযান শুরু করবো সেটাই ভেবে পেলাম না। তিমায়া বললেন, আমাকে এই অর্থহীন অনুসন্ধান কাজের মধ্যে ঠেলে দিয়ে তিনি খুবই দুঃখিত।

জায়গা হিসেবে মানানটোড্ডি খুবই সুন্দর। রাতটা মানানটোড্ডির ইনস্পেকসন বাংলোতেই কাটিয়ে দিলাম। আমাদের ভাগ্য ভালো যে, বাংলোটা খালি ছিল। আর বাংলোটাও বেশ সুন্দর। এটিতে রয়েছে গদিয়লা বিছানা, রীতিমতো আরাম করে থাকার মতো জায়গা। একজন ইংরেজের একটা পুরানো বাড়ীর ঠিক উল্টোদিকে পাহাড়ের উপর এই বাংলোটি অবস্থিত।

এই অঞ্চলটাকে জোনাকিদের এলাকা বলা যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার হওয়া মাত্রই হাজারে হাজারে জোনাকি আলো জ্বালিয়ে ভিড় করে। আর এদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ওয়াইনাদের ব্যাঙগুলি টক্ টক্ করে ডেকে চলে সন্ধ্যা থেকেই। জোনাকির আলো আর 'টক্-টক্' ব্যাঙের ডাক যে পরিবেশ রচনা করে তা সত্যিই মনের মধ্যে দাগ কাটে। সহজে ভোলা যায় না সেই দৃশ্যকে। আমরা বাংলোতে বসে ব্যাঙের ডাক শুনতে শুনতে ধূমপান করতে লাগলাম। এবং একসময় ঘুমিয়েও পড়লাম।

পরদিন সকালে মোটরে করে সোজা পায়ে কুর্গ রাজ্যের বিরাজকোট-এ এসে হাজির হলাম। উদ্দেশ্য সেখানে তিমায়াকে তার খামারের কাছে নামিয়ে দেব, আর আমি একদিন সেখানে থেকে পরদিন ব্যাঙ্গালোরের পথে পা বাড়াবো।

মানানটোড্ডি থেকে দশমাইল যাওয়ার পর আমরা গিয়ে পেঁছিলাম কাবেরী নদীর কেরালার দিককার তীরে। এই তীর ধরে ঘন বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ আমাদের নজরে এলো যে, কিছুলোক একটি ডুলি কাঁধে আমাদের দিকেই ছুটে আসছে। সেই ডুলিতে শুয়ে একজন লোক। তার ছেঁড়া জামাকাপড় রক্তে ভেজা।

লোকগুলো আমাদের জানালো যে, তাঁরা বনে বাঁশ গাছ কাটার কাজ করে। এখান থেকে মাইলখানেক দূরে নদীর তীরে চুক্তিতে তারা গাছ কাটছিল। ভোর হবার ঠিক পরে সকালের দিকে হঠাৎ একটি বাঘ এসে হাজির। সরাসরি বাঘটি ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'জনের ওপর। এবং একজনকে ঘাড়ের উপর কামড়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে থাকে।

বাঘটি যে দু'জনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সম্পর্কে তারা ছিল দু'ভাই।

যে ভাইকে বাঘটি ছেড়ে দিয়েছিল সে ছিল দারুণ সাহসী। সহজে সে দমবার পাত্র নয়। ফলে সে তখন ভাইকে বাঁচাতে বাঁশ কাটার হেঁসোটি দিয়ে বাঘটাকে তাড়া করে।

বাঘটা যখন দেখল যে তার পেছনে একজন ছুটে আসছে তখন সে শিকার মুখে বড় বড় লাফে এগিয়ে যেতে লাগল। লোকটিও যখন দেখল যে ভাইকে বাঘের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা সম্ভব নয় তখন সে নিরুপায় হয়ে হাতের হেঁসোটা ছুঁড়ে মারল বাঘটার দিকে। লোকটার ভাগ্য ভাল। ভারী হেঁসোটা গিয়ে লাগলো বাঘটার শরীরের একপাশে। ফলে বাঘটা যন্ত্রনায় হোক আর ভয়েই হোক শিকারটা ফেলে দ্রুত পালিয়ে যায় জঙ্গলে।

ডুলিবাহকদের একজন এই ঘটনার নায়ক। বাঘটা পালিয়ে যাবার পর সবাই মিলে লোকটিকে মানানটোড্ডির কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য একটা ডুলিতে করে রওনা হলো।

আমরা সময় নষ্ট না করে দ্রুত কাজে হাত লাগালাম। আহত লোকটিকে এবং আরও দু'একজনকে গাড়ীতে তুলে নিলাম। তিমায়াকে বললাম, সে যেন দ্রুত গাড়ী চালিয়ে লোকটিকে হাসপাতালে পেঁাছে দেয়। এবং তাড়াতাড়ি বাঁশ কাটার লোকগুলো যেখানে থাকে সেই ক্যাম্পে যেন ফিরে আসে।

তিমায়া গাড়ী স্টার্ট দিয়ে রওনা রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ক্যাম্পের দিকে বড় বড় পা ফেলে রওনা হলাম। আমার পাশে পাশে চলেছে সেই সাহসী ভাইটি। তার নাম ইয়েগা। আর আমাদের পিছন পিছন আসতে লাগলো বাকী লোকগুলো। আমরা সময় যদিও বেশী নষ্ট করিনি, কিন্তু এই সময় বাঘটা নিশ্চিত কয়েকমাইল দূরে চলে গিয়েছে। তবে এমন একটা সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে যে বাঘটা কাছাকাছিই রয়েছে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ক্যাম্পে এসে পেঁাছুলাম। কিন্তু বাঘটা যেখানে শিকারটা ফেলে রেখে পালিয়েছিল সেখানে না পেঁাছানো পর্যন্ত আমরা একই গতিতে এগুতে লাগলাম। মাটি ঘন ঝোপে ঢাকা ছিল বলে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছিল না। তবে ঝোপের সবুজ পাতার উপর রক্তের ফোঁটা দেখতে পেলাম। তখনও রক্ত শুকোয়নি। তবে রক্তটা কার দেহের, ইয়েগার আহত ভাইয়ের না আহত বাঘের ক্ষতের রক্ত তা আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম না।

আমাদের পিছন পিছন যারা আসছিল তাদেরকে তাঁবুতে ফিরে যেতে বললাম। আমরা দু'জন রইলাম বাঘটার খোঁজ করার জন্য। কেননা, বাঘটা যদি আশেপাশে কোথাও থেকে থাকে তাহলে অনেক লোকের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যেতে পারে।

যে কোন মুহূর্তে, যে কোন দিক থেকে, বিশেষ করে পেছন দিক থেকে বাঘটা হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে, সেই ভেবে আমি সতর্ক হয়ে ইয়েগার পেছন পেছন হাঁটছিলাম। ইয়েগা ঘন ঝোপের ঝাড় সরিয়ে মাটি ভালো করে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল।

সে খুঁজছিল তার হেঁসোটা। হেঁসোটা সত্যি সত্যিই বাঘটাকে জখম করেছে কিনা সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে চাইছিলাম। অবশ্য বাঘটা যদি আহত হতো তাহলে রাগে গজরানোই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। আর সে যদি আহত না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের কাছাকাছি পেলেই সে হানা দেবে আমাদেব উপর নয়তো সরে পড়বে।

এখন আমাদের কাজ হলো বাঘটা যাতে হঠাৎ আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য সতর্ক হওয়ার। চারদিক ভালো করে দেখে তবেই এগিয়ে যেতে হবে।

খানিকটা এগুতেই হেঁসোটা দেখতে পেলাম। না, সেটিতে কোন রক্তের দাগ লেগে নেই। তাহলে বাঘটা অক্ষতই রয়েছে। আমরা আসবার পথে গাছের পাতায় যে রক্ত দেখেছি তা হলো আহত লোকটির।

আমরা নীচু হয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ইয়েগা আস্তে আস্তে মাথা ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখতে লাগলো। বাঘটাও দৌড় বন্ধ করেছে।

আমরা আরও এক ফার্লং মতো এগিয়ে গেলাম। তারপরই বাঘটার আর কোন পায়ের ছাপ দেখলাম না। এখানে এসে মানুষখেকোটা লেবু ঘাসের জঙ্গলের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। এই গাছের ডালপালাগুলো সহজে ভাঙ্গে না। তাই শয়তানটা যখন এগুলির উপর দিয়ে গিয়েছিল তখন সেগুলো শুয়ে পড়েছিল মাত্র, এবং বাঘটা চলে যাওয়ার পর আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে মানুষখেকোটা ঠিক কোন দিকে গিয়েছে তা অনুমান করা যাচ্ছিল না।

আমরা আমাদের হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। সোজা ঘাসের জঙ্গলটার ভেতর দিয়ে আবার যেখানে বন শুরু হয়েছে সেখানে গিয়ে পড়লাম। কিন্তু

বাঘের পায়ের কোন ছাপই দেখতে পেলাম না। তখন আমি সিদ্ধান্তে এলাম যে, বাঘটাকে হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু ঐ সাহসী লোকটা হার মানার পাত্র নয়। সে শুধু দুঃসাহসীই ছিল না, তার মধ্যে একাগ্রতাও ছিল। সে নীচু স্বরে বলল, বাঘটাকে না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আমি তার আগ্রহে মুগ্ধ হয়ে বাঘটাকে অনুসরণের কাজে মন দেওয়াই ঠিক করলাম। শুরু করলাম বাঘের খোঁজ। বেশ কয়েকমাইল রাস্তা এগিয়ে গেলাম। এবং দিনের বেশীর ভাগ সময়ই এই কাজে লেগে গেল।

বেলা তিনটের সময় ক্যাম্পের দিকে ফিরে চললাম দু'জনে। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা বেজে গেল তাঁবুতে পৌঁছুতে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তবে শেষ পর্যন্ত মানুষখেকোটার সন্ধান পেয়েছি এবং ইয়েগার মতো দুঃসাহসী ও একাগ্রচিত্ত লোকের সঙ্গে শিকারের কাজে সাহায্য করতে পেরেছি মনে করে মনটা একটু হালকা হল।

আমাদের কয়েকঘণ্টা আগেই তিমায়া গাড়ী নিয়ে তাঁবুতে এসে পৌঁছেছিল। সে আমাদের কাছ থেকে খবর শোনার জন্য রীতিমতো উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, তাঁকে বলবার মতো কিছুই ছিল না।

আমরা ঠিক করলাম, আজকের রাতটা মানানটোড্ডিতে ফিরে গিয়ে বাংলোতে কাটাব। পরদিন সকালে আবার তাঁবুতে ফিরে আসবো।

আমি এইখানেই মারাত্মক ভুল করে বসলাম। কারণ, পরদিন সকালে পৌঁছেই দেখি ছোট্ট তাঁবুটার অবস্থা দারুণ বিপজ্জনক। বাঁশকাটার লোক-গুলো সব একসঙ্গে একটা মাত্র কুঁড়েতে আশ্রয় নিয়েছে। তারা আমাদের দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জানালো, গভীর রাতে শয়তানটা হানা দিয়েছিল এবং কুঁড়েঘরের দেওয়ালের তলা দিয়ে একজনকে টেনে নিয়ে চলে গিয়েছে।

আপনারা হয়তো বাঘের এই কাণ্ড শুনে আশ্চর্য হয়েছেন। মনে মনে হয়তো ভাবছেন, বাঘের পক্ষে এটা কি করে সম্ভব। উত্তরটা আমি বলে দিচ্ছি। বাঁশকাটার লোকগুলো যে কুঁড়েগুলো তৈরী করেছিল সেগুলো ছিল জঙ্গলে তাদের অস্থায়ী আস্তানা। কাজ হয়ে গেলেই তারা চলে যাবে। তাই ওগুলো চেরা বাঁশ ও পাতা দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল।

মানুষখেকোটা যে ক্ষুধার্ত ছিল সেটা অতি সহজেই বোঝা যাচ্ছিল। সম্ভবতঃ আগের দিনে শিকারটা হারিয়ে খিদেটা তার আরও বেড়ে গিয়েছিল।

বাঘটা ভোরের দিকেই শিকারে এসেছিল। কুঁড়েতে সবাইকে ঘুমুতে দেখে তার সাহস বেড়ে যায়। সে তখন গুঁটি গুঁটি পায়ে কুঁড়ের কাছে এগিয়ে যায় এবং ঘুমন্ত একজনের মুখ দেখতে পায়। খুব সন্তর্পনে আরও কয়েক পা এগিয়ে ফাঁক দিয়ে থাবা বাড়িয়ে মানুষটাকে চেপে ধরে। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ওঠে। সবাই জেগে দেখে ঐ অবস্থা। কারও মাথায় তখন কোন বুদ্ধিও এলো না। বাঘটাও দ্রুততার সঙ্গে মাটির দেওয়াল ভেঙ্গে শিকারটাকে টেনে বাইরে নিয়ে আসে এবং দৌড়ে পালিয়ে যায়।

লোকটার দুর্ভাগ্য যে, সাহসী ইয়েগা ঐ কুঁড়েতে ছিল না। সে কিছুটা দূরে অন্য একটা কুঁড়েতে ছিল। ফলে বাঘটা কোনরকম বাধা না পেয়ে আনন্দে শিকার নিয়ে চলে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। লোকগুলো আমায় জানালো যে, তারা অনেকদূর থেকেও বেচারীর চিৎকার শুনতে পেয়েছিল। সাধারণতঃ শিকার ছাড়ানোর চেষ্টা করলেই বাঘ শিকারকে মেরে ফেলে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার বিপরীত ঘটলো। লোকটা অত চিৎকার ও আর্তনাদ করা সত্ত্বেও বাঘটা তাকে মেরে ফেলেনি। বরং ঐ অবস্থাতেই তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছে।

ইয়েগা তখনই আমাকে সঙ্গে করে বাঘটার খোঁজে রওনা হতে চাইল। কিন্তু অন্য লোকগুলো দারুণ ভেঙ্গে পড়েছে। তারা সবাই ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করে চলেছে। বাঘটার উদ্দেশ্যেও গালমন্দ নিক্ষেপ করছিল তারা। ইয়েগা বাদে তারা মোট নয়জন ছিল। আমি দেরী না করে তিমায়াকে বললাম, লোকগুলোকে গাড়ীতে করে মানানটোড্ডিতে রেখে আসতে। তাঁকে আরও বললাম, সে যেন গাড়ী নিয়ে ফিরে আসে এখানে এবং বাড়ীর মধ্যেই যেন অপেক্ষা করে আমাদের জন্যে। তিমায়ার কাছে আমার পয়েন্ট ৩৫০/৪০০ রাইফেলটা রয়েছে, তাই সে যে আত্মরক্ষা করতে পারবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

এরপর আমি আর ইয়েগা দু'জনে মিলে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে দেখে এগুতে লাগলাম।

কুঁড়ের বাইরে জমিটা নরম ছিল। ফলে বাঘটা হতভাগ্য লোকটার দেহের কোন মারাত্মক জায়গা নয় তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। লোকটা যে ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছে এবং মাটিতে পা ছুঁড়েছে তার চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। একসময় লোকটা একটা গাছের গুঁড়ি চেপে ধরেছিল। বাঘটা জোরাজুরি করে টেনে

হিঁচড়ে লোকটিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে তখনও লোকটার হাতের মাংসের টুকরো গাছের গায়ে লেগেছিল। তাছাড়া ওখানকার মাটি ও গাছের গায়ে রক্তের পরিমাণ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, লোকটা বাঁচবার জন কি চেষ্টাই না করেছে।

বাঘটা যে পথে গিয়েছে আমরা সহজেই সে পথে অনুসরণ করতে পারছিলাম। কেননা, লোকটার গা থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। আর সেই রক্ত বাঘের গমন পথকে সহজেই চিহ্নিত করেছিল। অরণ্যের অন্ধকার গভীর রাতে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে সেই ছবিটা মনে করে আমরা কেমন শোকগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সেইসঙ্গে লোকটার অসহায়তার কথা মনে হতেই একটা বিশ্রী ঘৃণাভাব আমাদের মধ্যে দেখা দিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা এমন এক জায়গায় এসে পৌছুলাম যেখানে বাঘটা তার শিকারকে মুখ থেকে মাটিতে নামিয়ে বারে বারে কামড়ে শিকারের চীৎকার চিরজীবনের মতো স্তব্ধ করে দেয়।

জায়গাটা যেভাবে রক্তে ভিজে উঠেছে এবং মাটিতে যেভাবে দাগ পড়েছে তা থেকেই এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

আমরা এক ফার্লং রাস্তা পথটার পায়ের ছাপ দেখে এগিয়ে গেলাম। এখানে এসেই বাঘটা নিশ্চিন্তে শিকারকে ভোজন করবে বলে ঠিক করে। আর তাই সরু রাস্তা দিয়ে না গিয়ে পাশের একটা ঘাস, আগাছা ও ফার্ণগাছ ঘেরা ছোট নীচু জায়গায় প্রবেশ করে। এইখানেই বাঘটা তার ভোজন শুরু করে। আমাদের ধারণা যে মিথ্যে নয় তা সেখানে গিয়েই বুঝলাম।

শয়তানটা এত ক্ষুধার্ত ছিল যে, সামান্য হাড়গোড় ছাড়া দেহটার খুব সামান্য অংশই অবশিষ্ট ছিল। নাড়ি, ভুঁড়ি দেহ থেকে আলাদা করে বাঘটা দূরে এক জায়গায় রেখে এসেছিল। আর বন্য ভোজের প্রমাণস্বরূপ পড়ে রয়েছে হাড়গুলো।

হতভাগ্য লোকটার দেহের চারভাগের একভাগ চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। অবশ্য এটুকুই বাঘটাকে দ্বিতীয়বার খাবার জন্য টেনে আনার পক্ষে যথেষ্ট। আমরা যদি ঠিকমতো কৌশল প্রয়োগ করি এবং বাঘটার মনে যদি কোন সন্দেহ দেখা না দেয় তবেই এটা সম্ভব।

আমরা দু'জন চারিদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলাম। আর সেই

সময়েই আমরা প্রথম বিপদের মুখোমুখি হলাম। কেননা, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার আশি গজের মধ্যে কোন বড় গাছ ছিল না। আর আবার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি, রাতে টর্চ জেলে গুলি করবার পক্ষে এই দূরত্বটা যথেষ্ট বেশী।

যাদের এ ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা নেই তারা হয়তো ভাবছেন আমি মনগড়া কথা বলছি। দিনের বেলায় আশি গজ দূরত্ব খুব কম বলে মনে হতে পারে, কিন্তু রাতে জঙ্গলের মধ্যে মাচানে যারা এসেছেন শিকারের সন্ধানে তারাই বুঝতে পারবেন আমি কি বলতে চাইছি। ঝোপ-ঝাড়, পাতা, ঘাসের আগা প্রভৃতি দৃষ্টিপথে বাধার সৃষ্টি করে। তাই বাঘটা যখন মড়ার কাছে ফিরে যাবে তখন যাতে তাকে ভালো করে দেখতে পাই সে ব্যবস্থা করতে হলে ঝোপঝাড় কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু এতে করে বাঘটার মনে সন্দেহ জাগবে। তখন সে আর মড়ার কাছে ফিরে আসবে না। মনে রাখবেন, বাঘটা শুধু জখম হয়ে ফিরে যাক, এ ঝুঁকি আমি নিতে রাজী নই। বরং তাকে গুলি করে মারতে হবে।

বাঘ ও চিতাবাঘ—বিশেষ করে মানুষখেকোরা মড়ার কাছে ফিরে আসবার সময় খুব সতর্ক হয়ে এগিয়ে আসে। তারা প্রথমে রাস্তাটা ভালো করে দেখে নেয়। যদি সন্দেহজনক কিছু আঁচ করতে পারে, যেমন কোন গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে, বা পাথর সরিয়ে ফেলা হয়েছে অথবা কোন জিনিষ আমদানী করে তার পিছনে লুকিয়ে থাকাব ব্যবস্থা হয়েছে, তবে তারা সতর্ক হয়ে মড়াব কাছ থেকে দূরে সরে যায়। ভুলেও তারা সেখানে ফিবে আসে না। যদিও বাঘের ঘ্রাণশক্তি নেই, তবুও শিকারীব মন ও শিকারীব প্রত্যেকটা কাজ বোঝার মতো ক্ষমতা সে রাখে।

লোকটাব দেহের অবশিষ্টাংশের কাছে গাছে অভাব পূর্ণ কবার জন্যই যেন বাঘটা প্রথমে শিকারটিকে নিয়ে যে নীচু জায়গাটাতে গিয়েছিল তার ধার দিয়ে টাইগার-ঘাসের ঘন জঙ্গলেব সৃষ্টি হয়েছে। মড়াটা থেকে জঙ্গলটাব দূরত্ব মাত্র পনেরো ফুট।

আমি যদি ঐ জঙ্গলের আড়ালে লুকোতে পাবি তবে অতি সহজেই বন্দুকের নল একেবারে বাঘের গায়ে লাগিয়ে গুলি করা সম্ভব হবে। তাছাড়া আজ সকাল সকাল চাঁদ উঠবে। আমারও সুবিধা হবে। অবশ্য বাঘটা যদি আমার উপস্থিতি আদৌ টের না পায়। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? আর যদি

বাঘটা বুঝতে পারে যে আমি এখানে আছি তাহলে আমাকে মারাত্মক পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে।

সব বাঘই, বিশেষ করে মানুষখেকো বাঘ দ্বিতীয়বার খাবারের উদ্দেশ্যে মড়ার কাছে ফিরে আসবার সময় প্রাকৃতিক আড়ালগুলোর সুযোগ নেয়। মানুষখেকো বাঘ দারুণ চালাক বলে সতর্কতায় সে অন্যান্য বাঘকে ছাড়িয়ে যায়। আমার অভিজ্ঞতা থেকেই আমি এটা জানি। আমি যে জঙ্গলটার মধ্যে লুকিয়ে থাকব ভেবেছিলাম সেই জঙ্গলটা বাঘের আসবার রাস্তার ওপরেই এবং মড়াটার এত সামনে জঙ্গলটা যে একেবারে নিশ্চয় করে না হলেও খুব সম্ভবতঃ সে নিজের আবির্ভাবকে গোপন রাখার জন্য ঐ জঙ্গলটাকে ব্যবহার করবে। আর আমি যতই চুপচাপ বসে থাকি না কেন তার আগমন যে কি প্রচণ্ড নিস্তব্ধতার সঙ্গে ঘটবে তা আমি জানি। তাই আমি দেখার আগেই যদি মানুষখেকোটা আমাকে দেখে ফেলে তাহলে কয়েক মুহূর্ত বাদে আমার হাড়গুলোও ঐ মড়াটার হাড়গুলোর সঙ্গে গিয়ে মিশবে। আমাকে এখন যা করতে হবে তা আসলে জুয়া খেলা।

আমি যদি ঘাসের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকি তবে আমাকে দু'টি বিপরীত দিক লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ একদিকে মড়াটার দিকে অন্যদিক হলো যেদিক থেকে মানুষখেকোটা আসবার সম্ভাবনা সেদিকটায়। আর বাঘটা যে এই ঘাসের জঙ্গলের মধ্য দিয়েই আসবে সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত। অথচ ঝোপের মধ্যে বসে থেকে আমাকে নড়াচড়া করতে হবে—মাথাটা এদিক ওদিক ঘোরাতে হবে। কিন্তু যে কোন ধরনের নড়াচড়ার ফল মারাত্মক হতে বাধ্য।

বাঘটা যদি আমার উপস্থিতি টের পেয়ে যায় তাহলে দু'টো ব্যাপার ঘটবে —হয় সে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে নয়তো আক্রমণের মতলব নিয়ে অলক্ষ্যে আমার সামনাসামনি চলে আসবে। আর আমি তার উপস্থিতি টের পাওয়ার আগেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর। আমি এই মারাত্মক সম্ভাবনার কথা ভেবে দারুণ ভয় পেলাম।

ইয়েগার মাথায় সেই সময় একটা দারুণ বুদ্ধি এলো। সে বলল, আমরা দু'জনে পরস্পরের দিকে পিছন ফিরে ঘাসের ওপর বসব—একজন মড়ার দিকে নজর রাখবে, অন্যজন মানুষখেকোটা ঘাসের জঙ্গলে ঢুকবার পথে নজর রাখবে।

এখন প্রশ্নটা হলো আমি কোন্‌দিকে নজর রাখবো। আমি যদি মড়াটার

দিকে নজর রাখি এবং ইয়েগো জঙ্গলের দিকে নজর রাখে, তবে ইয়েগার কাজ হবে বাঘটা জঙ্গলপথে ঢুকবামাত্র কনুই দিয়ে আমাকে সতর্ক করে দেওয়া এবং আমাকে সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে বাঘটাকে গুলি করতে হবে। গুলি যাতে বাঘটাকে ঠিকমতো আঘাত করে সেদিকেও নজর রাখতে হবে। আর আমি যদি বিপরীত দিকে অর্থাৎ জঙ্গলের দিক নজর রাখবো বলে ঠিক করি এবং ইয়েগাকে মড়াটার দিকে নজর রাখতে দিই, তখন মানুষখেকোটা যদি অন্যপথ ধরে মড়াটার কাছে গিয়ে হাজির হয় তবে আমাকে ঐ আগের মতোই পিছন ঘুরে গুলি ছুড়তে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে অবস্থা মোটেই গুরুতর হবে না। অন্ততঃ শয়তানটা বেশ খানিকটা দূরে থাকবে। আমিও গুলি করবার বেশ ভালো সুযোগ পাবো।

ইয়েগার জীবন বা নিজের জীবন নষ্ট করবার আদৌ ইচ্ছা আমার ছিল না। অথচ এটাই একমাত্র উপায়। সুতরাং মাথা নেড়ে ইয়েগার প্রস্তাবে সায় দিলাম।

আকাশে হঠাৎ দেখা-দেওয়া কোন শকুনের নজরে যাতে না পড়ে সেজন্য মড়ার হাড় এবং নাড়িভুঁড়িগুলি ডালপালা দিয়ে ভালো করে ঢেকে রাখলাম। এরপর আমরা আবার সেই কুঁড়েতে ফিরে এলাম।

আমরা পৌঁছুনোর মিনিট পনেরো বাদে তিমায়া গাড়ী নিয়ে মানানটোড্ডি থেকে ফিরে এলেন। আমরা তাঁকে আমাদের শেষ বক্তব্য জানালাম। কিন্তু এমন একটা অবস্থা উদ্ভব হলো যা বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা দেয়। তিমায়া হঠাৎ বোকার মতো অনুরোধ করলেন যে, তিনি রাইফেলটা নিয়ে ইয়েগার বদলে আমার সঙ্গে বসবেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব আমার আদৌ পছন্দ হলো না। প্রথমতঃ আমি আমার বন্ধুকে এমন বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ ইয়েগার মতো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ যতটা যোগ্যতার সঙ্গে বাঘটার পাহারায় থাকতে পারবে ততটা যোগ্যতা উনি দেখাতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তবে এ সন্দেহের পেছনে আমার স্বার্থপরতা জড়িত। আমি আমার জীবনকে বিপন্ন হতে দিতে রাজী কিন্তু বন্ধুর নয়। তাই খুব চালাকির সঙ্গে তিমায়াকে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করলাম। তিনি তো চটে গেলেন এবং এমন ভাব দেখালেন যে, আমার অনুরোধ তিনি রাখতে পারছেন না। তিনি বললেন, "যান, যান আপনার মতো আমি সামান্য শহরবাসী নই, আমি একজন চাষ-আবাদকারী। আপনি আমাকে কি ভাবেন? আমার সঙ্গে

বসবার কথা যদি ভাবতে না পারেন তবে আমাকে ঐ পয়েন্ট ৪৫০/৪০০ রাইফেলটা ধার দিন আর······আপনি মানানটোড্ডিতে ফিরে যান। বাকী কাজটা আমিই সেরে নিতে পারবো।

তিমায়ার চোখেমুখে একটা তিক্ততার ভাব।

আমি তাঁর কাঁধে হাত রেখে নীচু স্বরে বললাম, 'ঠিক আছে, আমি আপনার সঙ্গেই বসবো।'

মুহূর্তের মধ্যে তার চোখমুখ আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলো। আর ইয়েগা এই নয়া পরিকল্পনার কথা শুনে ভেঙ্গে পড়লো। আমি জানি এখন সে আমার প্রতি অনুযোগের দৃষ্টিতে তাকাবে। তাই ইচ্ছে করে তার দৃষ্টি এড়ানোর জন্য আমি স্টুডিবেকারের একটা চাকা দেখতে লাগলাম।

খানিকক্ষণ বাদে খাওয়ার জন্য আমরা মানানটোড্ডি ফিরে গেলাম। সঙ্গে ইয়েগাকেও নিয়ে গেলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে একটু ঘুমিয়েও নিলাম। কেননা, রাতে জেগে থাকার জন্য শক্তি সঞ্চয় প্রয়োজন। বেলা তিনটের সময় জঙ্গল অভিমুখে যাবার জন্য তৈরী হলাম। তিমায়া সঙ্গে চা আর স্যাণ্ডউইচ নিতে চাইলেন। আমি রাজীও হলাম। তবে কাল সকাল ছাড়া ওগুলো খাওয়া যাবে না। কেননা, বাঘটার অপেক্ষায় যখন বসে থাকবে তখন নড়াচড়া করা একদম চলবে না।

আমরা ইয়েগাকে মানানটোড্ডিতে রেখেগেলাম। আপাততঃ তার সাহায্যের তেমন প্রয়োজন নেই। সাড়ে তিনটের সময় জঙ্গলের সেই কুঁড়েতে এসে হাজির হলাম। সেখানে গাড়ীটা রেখে হেটে টাইগার-ঘাসের জঙ্গলে গিয়ে পোঁছুলাম।

আমি এবার ঢাকা দেওয়া সেই হাড়গুলো যেখানে ছিল সেখান থেকে খানিকটা দূরে সরিয়ে রাখলাম। নাড়িভুড়িগুলো থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছিল। মানুষখেকোটা নাড়িভুড়িগুলো একপাশে রেখে গিয়েছিল। মানুষখেকোটার যাতে কোন সন্দেহ না জাগে সেজন্য নাড়িভুড়িগুলো দূরে সরিয়ে রাখতে সাহস হলো না।

ইয়েগার সঙ্গে আমার যে পরিকল্পনাটা হয়েছিল আমি তিমায়াকে সেইমতো জানালাম। তিমায়া কোনরকম আপত্তি না করে রাজী হয়ে গেল। আমরা বাংলো থেকে দুটি ফোমের গদী নিয়ে এসেছিলাম। এই গদীগুলো আনার দুটি উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ আরাম করে বসতে পারব আর দ্বিতীয়ত নড়াছড়া করার সময় কোন শব্দ হবে না।

গদীগুলো মাটিতে রেখে তার উপর পরিকল্পনা মতো আমরা যে যার জায়গায় বসে পড়লাম। আমি চুপচাপ বসে থাকার জন্য পায়ের উপর পা তুলে বসলাম। আর এইভাবে বসা আমার বহুদিনের অভ্যেস। তিমায়া ঐভাবে বসে আরাম পাচ্ছিলেন না বলে সামনের দিকে পা দুটো ছড়িয়ে বসলেন। এরকমভাবে বসাটা আমার অস্বস্তিকর মনে হলো। এবং আমি জানতাম যে, সূর্যাস্তের আগেই তিমায়া অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।

ওয়াইনাদ ও পশ্চিমঘাট-এর জঙ্গল-জীবন অন্যান্য উষ্ণ অঞ্চলের জঙ্গল-জীবন থেকে অনেকটাই আলাদা। এই অঞ্চলে জন্তু ও সরীসৃপের সংখ্যা খুবই কম, তবে পাখী ও পোকামাকড় খুবই বেশী। আমরা আসতেই তা বুঝতে পারলাম। আমরা সেখানে পৌঁছুনোর পর অন্য কোন শব্দ পেলাম না, শুধু পাখীদের কলতান ও ঝিঁ ঝিঁ পোকার নৈঃশব্দ ভাঙ্গার শব্দই কানে এসে বাজতে লাগলো।

সন্ধ্যা নেমে এলো। পাখীদের মধ্যে ঘরে ফেরার তাড়া। জংলী মোরগ-মুরগীর ক্রমাগত ডেকে যাবার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ময়ূর-এর ডেকে ওঠারও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আর আমাদের চারপাশে বিভিন্ন শ্রেণীর পোকামাকড়, যেমন গুবরে পোকা, গঙ্গা ফড়িং প্রভৃতি নানা পর্দায় সুর ভাজতে শুরু করেছে। একটা সবুজ রঙের পতঙ্গ আমার সামনে এসে হাজির হলো। সেটা যদি আমার হাঁটুর উপর না বসতো তাহলে আমি সেটার অস্তিত্বই টের পেতাম না। তবে সেটির আকৃতি এতই অদ্ভুত যে সঠিক ভাবে তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। পাখা দুটো খুবই স্বচ্ছ দেখতে। তার উপর সুন্দর শিল্পকলার নিদর্শন। পিঠের উপর পাখা দু'টো ভাজ হয়ে থাকায় ঠিক দেখতে লাগছে একটা পাতার মতো। প্রাকৃতিক ছদ্মবেশ অবলম্বনের অদ্ভুত নিদর্শন। এই ছদ্মবেশের উদ্দেশ্য একদিকে যেমন শত্রুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো অন্যদিকে অন্য জীবকে হত্যার জন্য লুকিয়ে থাকা। আসলে উভয়ে উভয়কে বোকা বানানোর জন্য প্রাণীদের মধ্যে এই ছদ্মবেশ-ধারনের ক্ষমতা আমি সমানভাবে পেয়েছি।

খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নেমে এলো। পাখীর কলতানও থেমে গেল। বাড়তে থাকলো আমাদের চারপাশের ঘাসের তলাকার কীটপতঙ্গের খস্‌খস্‌ শব্দ। অন্ধকারে আমরা ওদের দেখতে পাচ্ছিলাম না ঠিকই, তবে গায়ে বসার জন্য অনুভব করতে পারছিলাম। ওরা আমাদের শরীরের যেখানে

সেখানে বেয়ে উঠতে লাগলো। ফলে এদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে হচ্ছিল। আমায় খেয়ালও রাখতে হচ্ছিল যেন কোন শব্দ না হয়।

সমতলের এই জঙ্গলে আমি আমার পুরানো বন্ধু, সেই নাইটজার পাখীটার অনুপস্থিতি অনুভব করলাম। কয়েক মুহূর্ত সেটির কথা মনেও করলাম। যে সব কীটপতঙ্গ দিনের বেলায় ঘুরে বেড়ায় তারা দেরী করে বাসায় ফিরতে গিয়ে তখনও এদিক ওদিক ঘুরঘুর করছিল। গোধূলীর এই লগ্নে এইসব কীটপতঙ্গকে খাবার জন্য নাইটজারের মতো নিশাচর পাখী স্বভাবসিদ্ধ ও অপার্থিব ভঙ্গীতে উড়ে বেড়াত।

আমার মনে এলো জীবজন্তুর জীবনধারনের নানা দিককার কথা—খাবার যোগাড়ের কথা; বংশবৃদ্ধির কথা প্রভৃতি। আমি আরও নানারকম চিন্তা করতে লাগলাম। এদিকে রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। মানুষ-খেকোটার কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে শয়তানটা কত কাছেই না এগিয়ে এসেছে। আর এই ভেবেই তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসলাম।

মড়ার হাড়-নাড়িভুঁড়িগুলো থেকে বিকট দুর্গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর সেই গন্ধে এই গভীর রাতে বড় বড় নীল মাছি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জড়ো হয়েছে এখানে। রাতে যে সব শিকারী মড়া পাহাড়ায় বসে তাদের কাছে এই নীলমাছিগুলো বন্ধুর মতো কাজ করে। কেননা, কোন প্রাণী যদি মড়ার কাছে আসে, এমনকি সে যদি মড়া স্পর্শ নাও করে তবুও এই নীলমাছিরা উপস্থিতি বুঝতে পেরে একসঙ্গে ভনভন করে উড়ে যায়। শিকারী যদি কাছাকাছি থাকেন এবং তার কান যদি সতর্ক থাকে তাহলে তিনি ঐ শব্দ শুনেই বুঝতে পারেন যে, কোন প্রাণী এসে হাজির হয়েছে। এখন নীলমাছিগুলো শান্ত থাকায় আমি নিশ্চিত হলাম যে কোন প্রাণী ধারে কাছে আসেনি।

তিমায়া আমার পিঠের সঙ্গে লেপটে বসেছিলেন ফলে আমার অসুবিধা হচ্ছিল। সোয়েটারের মধ্যে শরীরও বেশ উষ্ণ হয়ে উঠেছিল। বড় বড় চোখ মেলে আমার বন্ধু অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে তিনি ভয় পাচ্ছেন। যে শিকারী নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষখেকো বাঘের প্রতীক্ষায় বসে থাকেন তার কাছে এই সময়টা অর্থাৎ সন্ধ্যের শুরু থেকে

আকাশে তারার উদয় না হওয়া পর্যন্ত এই সংক্ষিপ্ত পনেরো মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা সময়টা সব থেকে বিপজ্জনক।

যে ঘাসের জঙ্গলটায় আমরা আত্মগোপন করে বসে রয়েছি তার বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ আমি যে দিকে তাকিয়ে বসে আছি সেদিক থেকে আমাদের সবচেয়ে বড় বিপদের আশঙ্কা। যদি শয়তানটা ঐ দিক থেকে আসে তাহলে সে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে এই অন্ধকারের মধ্যেও কিছুটা দূরে থাকতেই আমাদের উপস্থিতি আবিষ্কার করতে পারবে। তখন সে বিপদ বুঝে আর এক পাও এগুবে না। অবশ্য তখন সে কি করবে তা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর। হয়তো সে ঐ পনেরো ফুট দূর থেকেই লাফিয়ে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের উপর এসে পড়বে। আর যদি অন্যান্য মানুষখেকোর মতো কাপুরুষ হয় তবে চুপ করে সরে পড়বে।

এইসব ভেবে আমার মনেও ভয় এসে জমা হলো। এই বাঘটা কাপুরুষ হবে বলে আমার মনে হলো না। বাঘটা সামনের দিক থেকে আসবার সময় যে সামান্য কঁ্যাচকঁ্যাচ অথবা খস্‌খস্‌ শব্দ বাঘটার উপস্থিতি জানিয়ে দেবে আমি সেই শব্দ শোনার জন্য জড়সড় হয়ে বসে কান সজাগ করে রাখলাম। পেছনের থেকে এলে নীলমাছিগুলোর সদলবলে উড়ে যাবার ভনভন শব্দের দিকেও কানটা খাড়া করে রাখলাম। কিন্তু চারিদিকে এখন শুধু নিস্তব্ধতা।

খানিকক্ষণের মধ্যেই আকাশে অসংখ্য তারা দেখা দিল। জমাট অন্ধকারের রাজ্যে আলো-আঁধারির সমাগম হলো। চারিদিকের জিনিষগুলো স্পষ্ট দেখতে পেলাম। হঠাৎ বিপদের আশঙ্কাও মন থেকে দূর হয়ে গেলো। আমাদের কয়েক গজের মধ্যে অসংখ্য জোনাকি পোকা ক্লান্তিহীন ভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে। কখনও কখনও তাদের মিলিত আলোক দ্যুতি ফ্ল্যাশলাইটের মতো অন্ধকারকে হটিয়ে দিচ্ছিল কখনও বা তারা পরস্পর থেকে দূরত্ব বজায় রেখে অন্ধকারে লক্ষ লক্ষ আলোক বিন্দুর সৃষ্টি করছিল।

চারিদিকে একটা অদ্ভুত নৈঃশব্দ বিরাজ করছে। মনে হচ্ছে যেন এই জঙ্গলে কোন প্রাণীই বাস করে না। কোন চিত্রল হরিণ বা সম্বর ডেকে উঠে আমাদের কোন সাহায্যও করছে না। রাতের বেলায় সচরাচর যে সব পাখীর ডাক শুনতে পাওয়া যায় তাদের সেই ডাকও শুনতে পাচ্ছিলাম না। শুধুমাত্র আমাদের চারপাশে ঘাসের মধ্যে কীটপতঙ্গের নড়াচড়ার শব্দই আমরা শুনতে

পাচ্ছিলাম। এইসব দুষ্ট কীটপতঙ্গগুলো আমাদের উপর অতিরিক্ত অত্যাচারও করছিল। সঙ্গে এসে জুটলো মশার দলও। এতক্ষণ পর্যন্ত মশা আমাদের কামড়ায়নি। সম্ভবতঃ আমাদের অস্তিত্ব বুঝতে পারেনি। আর এখন আমাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে তারা তা সদ্ব্যবহার করবে বলে ঠিক করেছে। কিন্তু আগুয়ান মানুষখেকোটাকে আমাদের উপস্থিতি টের পাইয়ে দেবার সাহস আমার হচ্ছিল না। পেছনে তিম্মায়ার মশা তাড়ানোর অতি ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেলাম।

ঠিক এই সময় নীল মাছিগুলোর বিরক্ত হয়ে উড়বার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলাম। তিম্মায়াও শব্দটা শুনতে পেয়েছেন বুঝলাম। কেননা তিনি আমার পিঠের উপর ক্রমশঃ জোরে চাপ দিচ্ছেন এবং মশা তাড়ানো স্থগিত রেখেছেন। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি কনুইয়ের গুতো দিয়ে বাঘের আবির্ভাবের কথা জানিয়ে দিলেন। এবং বসে বসেই কোলের উপর থেকে পয়েন্ট ৪৫০/৪০০ রাইফেলটা হাতে তুলে নিলেন।

আবারও মাছিগুলো ভয় পেয়ে পচা হাড় ও নাড়িভুড়িগুলো থেকে ভনভন শব্দ উড়ে গেলো। কিছুক্ষণ পড়েই মাছিগুলো আবার শান্ত হয়ে ওগুলোর উপর বসলো। বুঝলাম আগন্তুক এখনো মড়াটার কাছাকাছি এসে হাজির হয়নি। যদি আগন্তুক কাছাকাছি থাকতো তাহলে মাছিগুলো কিছুতেই মড়াটার উপর গিয়ে বসতো না।

মড়াটার ওপাশ থেকে হঠাৎ একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে এলো। দূরে থপ্ করে একটা পাথর ওলটানোর শব্দও হলো। স্পষ্ট বুঝলাম মানুষখেকোটা এসে গেছে। সে সম্ভবতঃ আশেপাশে কোন বিপদ লুকিয়ে আছে কিনা তা দেখছে এবং এখুনি ভোজনের জন্য বাকি হাঁড়গোড়গুলোর কাছে এগিয়ে যাবে। না কি সে আমাদেরই দিকে ওৎ পেতে এগিয়ে আসছে?

আমি আর দেরী না করে রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিলাম এবং রাইফেলের নলের সঙ্গে লাগানো টর্চের বোতামটায় বাঁ হাত দিয়ে টিপতে টিপতে রুদ্ধশ্বাসে ঘুরে দাঁড়ালাম। টর্চের উজ্বল আলোয় দু'টো চোখ জলজল করে উঠলো। চোখদুটো যেন পরস্পরের অতি কাছাকাছি।

টর্চের আলোয় আরও দেখতে পেলাম, শয়তানটা কুকুরের মতো উবু হয়ে বসে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। তার অল্প খোলা মুখে লাল জিভটাও দেখতে পেলাম।

তাহলে এই চিতাবাঘটাই কি মানুষখেকো শয়তান? আমার মন অবশ্য এই প্রশ্নে সায় দিল না। কেননা, মানুষখেকোটার গমন পথ অনুসরণ করতে গিয়ে মানুষখেকোটার যে পায়ের ছাপ দেখেছি সেগুলো বাঘের পায়ের ছাপ – এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত তাছাড়া ইয়েগা ও তার সঙ্গীরা তো বাঘটাকে দেখেছেই। সম্ভবতঃ এই চিতাবাঘটা এখানে হঠাৎই চলে এসেছে। যেতে যেতে সে মৃতদেহটা দেখতে পেয়েছে। তাই ভাবছে এটা কোথা থেকে এলো এবং সে এটা খাবে কিনা।

এমন সময়ই টর্চের আলো চিতাটার চোখ দুটি আকর্ষণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়িয়ে গজরাতে লাগলো এবং খানিকক্ষণের মধ্যেই হাঁটতে শুরু করলো। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, সে নিজেকে এইসব সংশয়পূর্ণ ঝামেলায় জড়াতে চায় না। আমিও তাই চটপট টর্চটা নিভিয়ে দিলাম।

কিন্তু মানুষখেকোটা কোথায়? সে কি কাছাকাছিই আছে? তা যদি হয় তবে তো সে আমার টর্চের আলো দেখতে পেয়েছে। ফলে তার পালিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। আবার গুঁড়ি মেরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসাও বিচিত্র নয়। তার চিতাবাঘটা যেভাবে নিশ্চিন্তে বসে ছিল তাতে বাঘটার কাছাকাছি থাকার প্রশ্ন ওঠে না। কেননা, বাঘটা যদি আশে পাশে কোথাও থাকতো তবে চিতাটার পক্ষে এখন চুপচাপ বসে থাকা অসম্ভব ছিল।

নীল মাছিগুলো আবার মৃতদেহের হাড়গোড়গুলির উপর গিয়ে বসলো। আমরাও ক্লান্ত হয়ে দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যহীন পাহাড়ায় বসে রইলাম। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। মাঝে মাঝে জোনাকিদের আলোর কিছুটা মুগ্ধতার সৃষ্টি করছে। আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করলো। যত সময় যায় ঠাণ্ডাও তত বাড়ে। আমাদের চারিদিকে ঘাসের মধ্যে যে পোকামাকরগুলো ছিল তারাও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে মনে হয় তাদেরও ঠাণ্ডা লাগছিল। ক্রমশঃ মশাও কমে এলো। জোনাকিগুলোকেও আর দেখা গেল না।

এদিকে বাঘটার দেখা নেই। চিতাটা আসার আগেই তার মৃতদেহটার কাছে আসার কথা। আমার মনে হয়, বাঘটার মৃতদেহের কাছে ফিরে আসার আদৌ ইচ্ছে নেই।

সময় এগিয়ে চলেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমও আমাদের পেয়ে বসতে চাইছে। খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় দু'দুটো শব্দ

হলো। শব্দটা যদিও আমি শুনেছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে দাগ কাটেনি। পরমূহুর্তেই সম্পূর্ণ সচেতন ও সজাগ হয়ে উঠলাম।

আমরা যে জঙ্গলটায় লুকিয়ে ছিলাম মনে হলো যেন তার কাছে কিছু একটা এসে হাজির হয়েছে। আর সে সামনাসামনি আসেনি, এসেছে আমার বাঁ দিক দিয়ে। একটা ক্ষীণ শব্দও শোনা গেল। তারপরই ঘাসের ওপব কোন ভারী দেহের পা ফেলবার পরিষ্কার আওয়াজ শুনলাম। পরক্ষণেই ঘাসে ঘাসে ঘর্ষণেব এবং ঘাসের ডাল ভাঙবার শব্দ শোনা গেল।

এরপরই আওয়াজটা গেল থেমে। তবে কি রহস্যময় আগন্তুক আমবা এখানে আছি তা আগেই জানতে পেরেছে? সে কি আমাদের উপর লাফ দেবার জন্য ওৎ পেতে আছে? ঠিক এমন সময়ই বাঘটার প্রচণ্ড গর্জন শুনে আমাদের প্রশ্নের উত্তব পেয়ে গেলাম।

আমি টর্চের আলোতে দেখলাম ঘাসগুলো প্রচণ্ডভাবে নড়ছে। হঠাৎ দেখতে পেলাম বাদামী রঙের একটা জন্তু। সে একটু পিছিয়ে গেল। তারপরই জঙ্গল কাঁপিয়ে সে গর্জন করতে লাগলো।

মানুষখেকোটা বাবে বারে হুঙ্কার তুলে মেজাজ দেখাতে লাগলো। আমি টর্চ নিভিয়ে দিলাম। বাঘটা রেগেও যেমন গেছে, তেমনি ভয়ও পেয়েছে মারাত্মক। আমি টর্চটা এক মূহূর্তে আগে জ্বালিয়ে ভালই করেছিলাম। সে যদি চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য তৈরী হতো তাহলে তখন তাকে আটকাবার সময় পাওয়া যেত না।

বাঘটার গর্জন শুনে তিমায়াও ঐ দিকেই তাকিযে রইলেন। বাঘটা গর্জন করতে করতে আমাদের চারিদিকে ঘুরতে লাগলো। হয় সে আমাদের আক্রমণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে নয়তো আমাদের ভয় দেখিযে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে। আমার ধারণা, যে দ্বিতীয়টাই করতে চাইছে।

আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। উদ্দেশ্য দেখি সে কি করে। কিন্তু না, সে আক্রমণ করলো না। এতক্ষণ গর্জন করলেও এখন সেই গর্জন বন্ধ। তবে রাগে যে সে ফুসছে সেটা তার গরগর আওয়াজ থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। চক্রাকারে ঘোরা তার কখনও থামেনি। সে সম্ভবতঃ আন্দাজ করতে চাইছে এখানে একজনের বেশী লোক রয়েছে কিনা।

আরও মিনিট পনেরো কেটে গেলো কিন্তু তেমন কিছুই ঘটলো না।

সে রকম কোন ভাবও দেখাল না, আবার চলেও গেল না। পরস্পরকে ভয় দেখানোর যেন প্রতিযোগিতা চলছিল এবং শেষপর্যন্ত বাঘটাই জয়ী হল।

আমি ঝুঁকি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইলাম, উদ্দেশ্য বাঘটাকে আক্রমণ করার সুযোগ দেওয়া তাহলেই সে বাইরে বেরিয়ে আসবে। তিমাযাকে চুপচাপ বসে থাকতে বলে আমি দূর ছাউনিটার দিকে হাঁটবো বলে ঠিক করলাম আমার ধারণা বাঘটা নিশ্চয়ই আমাকে অনুসরণ করবে। নয়তো আলো হাতে এই ঘৃণ্য মানুষটাকে ফিরে যেতে দেখে সে মৃতদেহটার কাছে বাকী অংশ খেয়ে নেওয়াই ঠিক করবে। আব দ্বিতীয়টা যদি ঘটে তাহলে তিমায়া গুলি করার সহজ সুযোগ পাবে।

কিন্তু আমার বন্ধুটি শুরুতেই আপত্তি করলেন। তিনি নীচু স্বরে বললেন, "খবরদার, এমন বোকামী করবেন না।" আমি তাঁর কাঁধে হাত রেখে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাঠুরেদের সেই কুঁড়ের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। চুপিসারে নয় রীতিমতো শব্দ করেই হাঁটতে লাগলাম।

সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা গর্জন করে উঠল। তারপরই তেড়ে এলো আমার দিকে। বাঘটা যাতে ভয় না পায় সেজন্য টর্চটা নিভিয়ে দিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটে গেল ঠিক বিপরীত।

আমি প্রায় পচিশ গজ এগিয়ে যেতেই মানুষখেকোটা আক্রমণ করার সাহস পেল। আমারও ভাগ্য ভাল, সে গর্জন করে এগিয়ে আসছিল বলে রক্ষে। যদি নিঃশব্দে এগিয়ে আসতো তাহলে আমি কোন ভাবেই টের পেতাম না।

বাঘটা আক্রমণ করতে উদ্যত হতেই সেই পরিচিত উফ্ উফ্ শব্দ কানে এল। আমি সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের বুড়ো অঙ্গুল দিয়ে টর্চটা জেলে দিলাম।

রাইফেলটা নিয়ে তড়িৎগতিতে ঘুরে দাঁড়ালাম। টর্চের আলোতে আমার দিকে অগ্রসরমান হিংস্র মানুষখেকোটার আক্রোশপূর্ণ চোখ দু'টি জ্বল জ্বল করে উঠলো।

ঠিক এমন সময় ঘটে গেল একটি অঘটন। হঠাৎ একঝলক আলো এসে আমাকে ডুবিয়ে দিল অন্ধকারে। বাঘটা মনে হলো যেন নজরের আড়ালে চলে গেল। কিনারার টর্চের আলো সরাসরি আমার মুখে পড়তেই এই অস্বস্তিকর অবস্থা। আলো থেকে বাঁচবার জন্য হাত দিয়ে চোখটা ঢেকে নিয়ে

লাফ দিয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেলাম। পরমুহূর্তেই কালির মতো ঘন অন্ধকারে সব ডুবে গেল। আমি টর্চ নিভিয়ে দিতেই তিমায়াও তাঁর টর্চের আলো আমার মুখের উপর থেকে সরিয়ে নিলেন।

এবার তিমায়ার টর্চের আলো গিয়ে পড়লো বাঘটার উপর। আমি তো দেখে থ'। বাঘটা আমার মাত্র চারফুট দূরে মাটিতে বিচিত্র কায়দায় বসে রয়েছে। সামনের পা দু'টো ছড়ানো মাথাটা মাটিতে লাগানো। আর দেহের পশ্চাৎভাগটা অদ্ভুতভাবে উপর দিকে তোলা। মনে হল যেন বাঘটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে। তাই লেজটা উপর দিকে উঠে শক্ত হয়ে গেছে।

এমন সময় গুলির বজ্র-কঠিন শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝলাম তিমায়া গুলি ছুঁড়ছে। গুলিটা মানুষখেকোটার দেহের একপাশে লেগে তাকে সরিয়ে দিল, যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল।

আমি ঠিক সেই সময় বাঘটার রাস্তায় বরাবর দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমিই তখন তার সবচেয়ে কাছের শত্রু। তাই সে আমার দিকে এগিয়ে এলো। কিন্তু আমার টর্চের তীব্র আলোয় তার দৃষ্টি তখন ঢেকে গিয়েছে। আমি আর দেরী না করে বাঘটার খোলামুখে গুলি করলাম। সে বীভৎস হুঙ্কার তুলে আমার পায়ের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়তেই আমি এক লাফে পিছিয়ে গেলাম এবং আবার গুলি করলাম।

এমন সময় তিমায়া আবার গুলি ছুঁড়লেন। তাঁর গুলিটা বাঘটার গায়ে না লেগে আমার পায়ের কাছে মাটিতে বিঁধে একরাশ ধূলো উড়িয়ে চারিদিক ঢেকে দিল। বাঘটা তখন মাটিতে গাড়াগাড়ি খাচ্ছে। বুঝলাম আমাদের কাজ শেষ। আমি এই সুযোগে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ দৌড়ুতে লাগলাম।

মানুষখেকোটাকে মারার কৃতিত্বটা পুরোপুরি তিমায়ার। কেননা তাঁর প্রথম গুলিটাই মানুষখেকোটাকে জখম করেছিল মারাত্মকভাবে। আর সেই সময় সে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। সেই মুহূর্তে গুলিটা লাগতেই সে নিরস্ত হয়েছিল। তাছাড়া তিমায়া দ্বিতীয় যে গুলিটা ছুঁড়েছিল সেটা সোজা গিয়ে বাঘটার বাঁ পাশের ঘাড়ের পেছনে লেগেছিল। হৈ-চৈ-র মধ্যে এই গুলিটার আওয়াজ আমি একদম শুনতে পাইনি। আমার প্রথম গুলিটা বাঘটার মাথায় এমনভাবে বিঁধেছিল যে সে রীতিমতো শক্তি হারিয়ে

ফেলেছিল। দ্বিতীয় গুলিটাও ঐ মাথায় বিঁধেছিল। তবে আমার বন্ধুর তৃতীয় গুলিটা সম্পূর্ণভাবেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল।

বাঘটাকে মারতে পারার আনন্দে তিমায়া আত্মহারা। দিশেহারা হয়ে তিনি পরাজিত ও ভূলুণ্ঠিত বাঘটার চারিদিকে নাচতে লাগলেন। সেইসঙ্গে তিনি বারবার বলতে লাগলেন যে, এরকম অদ্ভুত অবস্থায় এর আগে কেউ কোন মানুষখেকো বাঘ মেরেছে বলে তাঁর জানা নেই।

আমি যদিও তিমায়ার মতো অতটা উৎফুল্ল হইনি, তবে তিমায়ার মতে সায় দিলাম। আমাকে আবার যদি এইরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই আপত্তি করবো না। তবে আমি যে জায়গায় বসেছিলাম সেই জায়গায় নয়, তিমায়া যে জায়গায় বসেছিলেন সেই জায়গাটি পেলেই রাজী ও আনন্দিত হবো।

তালাইনভুর মানুষ-বিদ্বেষী

৬

কোল্লেগাল তালুকের একটি ছোট্ট গ্রামের নাম তালাইনভু। বৃটিশ ভারতে মাদ্রাজ প্রদেশের কোয়েম্বাটোর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল কোল্লেগাল। এখন আর বৃটিশ নেই, তাদের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়েছে মাদ্রাজ প্রদেশও। তার জায়গা নিয়েছে মাদ্রাজ রাজ্য। এই মাদ্রাজ রাজ্যের আয়তন পূর্বতন মাদ্রাজ প্রদেশের প্রায় অর্ধেক। মাদ্রাজ প্রদেশের অনেকটা অংশই পাশাপাশি রাজ্য অন্ধ্র, মহীশূর ও কেরালা ভাগ করে নিয়েছে।

ফলে কোল্লগোল তালুক আজ মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে এখানে চাষআবাদ ও বাড়ীঘর অনেক বেড়েছে। তালাইনভু থেকে কাবেরী নদীর উপত্যকা পর্যন্ত ঢেউখেলানো পাহাড়ের মধ্য জুড়ে যে অপরূপ বনভূমি ছিল তার অধিকাংশই আজ আর নেই। যে সমান্য অংশ আছে তাতে বন্যপ্রাণী বলতে তেমন কিছুই নেই।

ছোট্ট গ্রাম তালাইনভু-কে আমি চিনি অনেক দিন থেকে। তবে আমার এই গ্রামটির কথা মনে হয় মাঝে মাঝেই, প্রধানত দু'টি কারণে। প্রথমতঃ তামিল ভাষায় 'তালাইনভু' কথার অর্থ 'মাথা ধরা'। আর দ্বিতীয়তঃ গ্রামটা থেকে দশ মাইল দূরে গভীর উপত্যকায় কাবেরী নদীর তটে যে চালাক-চতুর চিতাবাঘটা আস্তানা গেড়েছিল আমি যখন তার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে যাই তখন সেটা বাস্তবিকই মাথা ব্যাথার কারণ হয়েছিল।

দক্ষিণভারতে মানুষখেকো চিতার সংখ্যা খুব কম এবং আগাগোড়াই তাই। আসলে উপরে উল্লেখিত চিতাটি কোন সময়ই মানুষখেকো হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি মানুষের প্রতি চিতাটার ছিল দারুন বিদ্বেষ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে তার এই বিদ্বেষকে মনে পুষে রেখেছিল। এবং তার জীবনের প্রধান শত্রুর উপর তা প্রয়োগও করেছিল।

ঘটনাটা প্রথম থেকেই বলা যাক। তালাইনভুর দশ মাইল দক্ষিণে বনের

মধ্যে পাহাড়ের উপরে একটা স্ত্রী চিতাবাঘ থাকতো। পূবদিকে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত বিশাল বনভূমি। সেটা গিয়ে সালেম জেলায় পৌঁছেছে এবং কাবেরী নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথ ধরে এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমে বনের বিস্তার মাত্র দু' মাইল অবধি। তারপর নীচু আগাছার জঙ্গল। কোল্লেগাল শহর থেকে যে প্রধান রাস্তাটা উত্তর দিকে মাদুর ও ব্যাঙ্গালোর পর্যন্ত চলে গিয়েছে ঐ আগাছার জঙ্গল তার দুপাশে বিস্তৃত।

ঐ স্ত্রী চিতাটার বয়স ছিল কম। প্রথম তিনটি বাচ্চার জন্ম দেবার পর সে অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে গেল। বাচ্চাগুলোকে সে এতো ভালোবাসতো যে প্রাণ দিয়ে তাদের রক্ষা করতে প্রস্তুত। অনেক দিন পরে আমি যে খবর সংগ্রহ করেছি তা থেকে জানা যায় যে, কোন অজ্ঞাত কারণে চিতাটা বাচ্চাগুলোকে নিয়ে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই পাহাড়ের গুহা ছেড়ে চলে আসে। বাচ্চাগুলো তখন এত ছোটো যে নিরাপদে তাদের পক্ষে চলাফেরা সম্ভব ছিল না। আমার ধারণা, বাচ্চাগুলোর জন্মদাতা পুরুষ চিতাটি তাদের মেরে ফেলার কুমতলব এঁটেছিল এবং খেয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। পুরুষবাঘ ও চিতাদের স্বভাবটাই এই ধরনের।

স্ত্রী চিতাটি তার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে কাবেরী নদীর তীরে একটি বাঁশগাছের জঙ্গলে নিরাপদ আশ্রয় ভেবে লুকিয়ে রাখল। আর একটা গুহা খুঁজে না বার করা পর্যন্ত সম্ভবতঃ সেটা ছিল অস্থায়ী আস্তানা। কিন্তু একদিন সকালবেলা চিতাটার ভাগ্য তাকে বিদ্রূপ করলো। সে তার বাচ্চাগুলোকে বাঁশঝাড়ের মধ্যে রেখে সারারাতের জন্য শিকারে বেরিয়েছিল। সকালবেলা সে ফিরে আসছিল আস্তানায়। উত্তাল ও তরঙ্গায়িত নদীর জলের উপর ভোরের সূর্যের আলো পড়ে চিক চিক করছে। আস্তানা থেকে চিতাটা তখনও এক মাইল দূরে।

হঠাৎ সে একটা ঘট্‌ঘট আওয়াজ শুনে হাঁটতে হাঁটতে থেমে গেল। মানুষ! যেখানে সে বাচ্চাগুলোকে লুকিয়ে রেখে গেছে সেখান থেকেই আসছে শব্দটা।

চিতাটা আর দেরী না করে দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো, বাচ্চাগুলোর চিন্তাই তখন তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কাছাকাছি পৌঁছে সে বাচ্চাগুলোর গজরানির শব্দ শুনতে পেল। মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলো আসল ব্যাপারটা কি। তার বুঝতে এতটুকু কষ্ট হলো না যে, ঘৃণ্য মানুষগুলো তার বাচ্চাগুলোকে দেখতে পেয়েছে।

আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে চিতাটা যে দৃশ্য দেখলো তা হলো, ছ' সাতজন উলঙ্গ লোক বাচ্চাগুলোকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। বাচ্চাগুলো ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে একসঙ্গে বসে রয়েছে। আর বাঁচার জন্য তারা গজরাচ্ছে। লোকগুলো ঐ বাচ্চাগুলোর দিকে ধারালো বাঁশ কাটার অস্ত্রগুলো তুলে ধরে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করলো। প্রত্যেকের কথাবার্তায় ফুটে উঠেছে উত্তেজনা। অসহায় বাচ্চার উপর এতটুকু মায়া আছে বলে মনে হলো না।

একসময়ে তার চোখের সামনেই একজন হাতের অস্ত্রটা সজোরে বসিয়ে দেয় একটা বাচ্চার উপর। অস্ত্রটা বাচ্চাটার নরম দেহে বিঁধতেই লাফিয়ে ওঠে শূন্যে। এবং দেহটা দু'টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ে দু'পাশে। কিন্তু তখনও তার দেহে প্রাণ ছিল। সে অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করতে লাগলো। তারপরই তার রক্তে ঘাস ও মাটি লাল হয়ে উঠলো।

এরপর অন্যান্যরা মিলে বাকী বাচ্চাগুলোকে আক্রমণ করলো। তাদের অস্ত্রের ঘায়ে মুহূর্তের মধ্যে বাচ্চাগুলো মারা পড়লো। একটু আগেই যেখানে তিনটি জীবন্ত প্রাণী পরম আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেখানে পড়ে রয়েছে তাদের মৃতদেহগুলো, তাও ছিন্নভিন্ন অবস্থায়।

নিজের বাচ্চাদের চোখের সামনে নৃশংসভাবে নিহত হতে দেখে মা চিতাটি ক্ষেপে গিয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠলো। বার বার উঁচু স্বরে গর্জন করতে করতে সে লোকগুলিকে আক্রমণ করলো।

প্রথম লোকটা টেরই পায়নি কি ঘটতে চলেছে। তার আগেই চিতাটার থাবা এসে পড়েছে তার মুখের উপর। সেইসঙ্গে চিতাটা আঁচড়ে খামচে তুলে নিয়েছে তার চোখ দুটি। এরপরের লোকটারও একই অবস্থা হলো। প্রথম দু'জনের এই অবস্থা দেখেই বাকীরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালালো।

চিতাটা যারা পালাচ্ছিল তাদের দিকেও তেড়ে গিয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়া লোক দুটিকে দেখে ফিরে এল এবং লোক দুটির উপর বসে নীরব ক্রোধে তাদের দেহ আঁচড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে লাগলো।

এরপর সে বাচ্চাগুলোকে শুঁকে তাদের দেহের শেষ টুকরোটা পর্যন্ত মুখে নিয়ে ঐ জায়গা ছেড়ে হাঁটা দিল।

এইভাবেই গোটা ব্যাপারটার শুরু।

গ্রামে ফিরে লোকগুলো রটিয়ে দিল যে, একটা বিরাটাকৃতির ভয়ানক

চিতাবাঘ আচমকা তাদের দলটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই নাটকে তারা কে কি ভূমিকা নিয়েছিল সেটা তারা চেপে গেল, কাউকে কিছু বললো না। পরে অবশ্য তারা আসল ঘটনাটা খুলে বলেছিল।

চিতার হাতে দু'জনের প্রাণ যাবার ঘটনায় গ্রামময় উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। সকলেই যে জায়গাটাতে ঘটনাটা ঘটেছিল সেই জায়গাটা এড়িয়ে যেতে লাগলো। তবে বিশেষ দরকার হলে বন্দুক ও টাঙ্গিতে সজ্জিত হয়ে বিরাট দল নিয়ে তারা সেখানে যেতো।

এই ঘটনার পর কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। চিতাটার আর কোন খোঁজ নেই। তার গতিবিধির কথাও শোনা গেল না। ফলে লোকে তাকে ভুলে গেল। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলবার প্রয়োজনও আর কেউ মনে করলো না। অনুমোদিত আর অননুমোদিত দু'দলের বাঁশ-কাঠ কাটিয়েরাই আবার জঙ্গলে যাওয়া আসা শুরু করলো। যারা আইন মেনে কাঠ কাটতে যেতো তারা দিনের বেলায় জঙ্গলে যেতো আর যারা চুরি করে কাঠ কাটতে যেতো তারা উজ্জ্বল চাঁদের আলো ভরা রাতে জঙ্গলে যাওয়া আসার পুরোনো অভ্যাসটা আবার শুরু করলো।

কিন্তু গ্রামের লোকেরা ভুলে গেলেও প্রতিহিংসাপরায়ণা মা চিতাটা ভুলে যায় নি তার বাচ্চাদের ওপর নৃশংস অত্যাচারের কথা। এটাই তো তার প্রতিশোধ নেওয়ার দ্বিতীয় সুযোগ!

এক কুখ্যাত চোর চন্দন কাঠ চুরি করতো। বনবিভাগের এবং পুলিশের লোকেরা লোকটির কাজকর্ম জেনে তাকে অনেক চেষ্টা করেও বাগে আনতে পারে নি। এক জ্যোৎস্না রাত্রে লোকটি তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বনে গেল। তাদের পরিকল্পনা ছিল, চন্দন কাঠ কেটে নদীজলে ভাসিয়ে নদীর ভাটিতে মাইলখানেক দূরে একটা জায়গায় নিয়ে যাবে। সেখান থেকে ডিঙ্গিতে করে নদীর অন্য পারে নিয়ে যাবে।

এর আগে একদিন বাপ-বেটাতে গিয়ে চন্দন গাছগুলোতে চিহ্ন দিয়ে এসেছিল। এখন তারা সেগুলি কাটতে শুরু করলো। কাঠ কাটার খট্‌খট্‌ আওয়াজ চিতাটার কানে গিয়ে পৌছালো। যেদিন তার চোখের সামনে তার বাচ্চাগুলোকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছিল, সেই দিনটার কথা মনে না করে বরং অনেকটা সহজাত প্রবৃত্তির মতই তার মনে জাগলো মানুষের প্রতি বিদ্বেষ। সে শব্দটা লক্ষ্য করে এগোতে লাগল। তার মাথার

মধ্যে কেবল একটাই ভাবনা—যারা ঐ শব্দ করছে তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

চিতাটা প্রথমে বয়স্ক লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলায় থাবা বসিয়ে দেয়। সে সাহায্যের জন্য চেঁচাবার আগেই বিরাট চিতার দেহটার ভারে সে মাটিতে পড়ে গেল। তার আঠারো বছরের ছেলে সবই প্রত্যক্ষ করলো। কিন্তু সে আর বাবাকে সাহায্য করবার কথা মনে না এনে কুড়ুল ফেলে রেখে সোজা দৌড়ে পালিয়ে গেল।

লোকটাকে মেরে ফেলতে চিতাটার কয়েক সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগল। এদিকে ছেলেটা প্রাণপণে দৌড়িয়ে ডিঙ্গিটার কাছে এসে পৌছল এবং একলাফে ডিঙিতে উঠে উল্টোপাল্টা ডিঙি বাইতে বাইতে নদীর অপর পারে গিয়ে হাজির হল। সে ঘরে গিয়ে তার মাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল এবং দুঃখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

গ্রামবাসীরা অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারা হঠাৎ মা-ছেলের একসঙ্গে কান্না শুনে আলো নিয়ে এগিয়ে এল এবং ঘটনাটা শুনলো। তারা প্রত্যেকেই জানতো, বাপ-বেটা দুজনেই চোর। তাই তারা ভোরের অপেক্ষায় বসে রইল।

পরদিন বেশ বেলায় গ্রামবাসীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছেলেটার নির্দেশে পথ চলে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হল। তারা দেখলো, লোকটার দেহ থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। তার অন্ননালী ছেঁড়া। দেহটা ভীষণভাবে কামড়ানো। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার, হত্যাকারী মাংসের টুকরো একটুও স্পর্শ করে নি। এতে প্রমাণ পাওয়া গেল, হত্যাকারী প্রাণীটি মানুষখেকো নয়। লোকগুলো বড়বড় চোখ করে বীভৎস মৃত দেহটা দেখতে লাগল। তাদের ধারণা হল, অকারণে কোন প্ররোচনা ছাড়াই ঐ লোকটাকে প্রাণীটা হত্যা করেছে। ঘটনাটা কোথা থেকে শুরু সেটা অনেক লোকেরই অজানা ছিল।

আবার গ্রামটা উত্তেজনায় ভরে গেল। আবার তারা দলবদ্ধ হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বনে যাওয়া-আসা করতে শুরু করলো। তবে এবার ভয়ের ভাবটা বেশিদিন ধরে লোকের মনে জেগে রইল। কিন্তু সময় বয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকে ক্রমশঃ ঐ ভয়ের ভাবটা মন থেকে মুছে ফেললো এবং তারা অভ্যাসমত আবার কাজকর্ম করতে লাগল।

এরপর কত জ্যোৎস্নাময় রাত এল গেল। কত সপ্তাহ কেটে গেল। ভারতের জঙ্গলগুলোর অধিকাংশ দুষ্কার্য এই জ্যোৎস্নার রাতগুলিতেই হয়ে থাকে। কারণ এই সময়েই চোরা শিকারীরা গিয়ে ডোবা ও নোনা মাটির ধারে গুড়ি মেরে বসে থাকে এবং সেখানে যে সম্বর, চিতল হরিণ ও অন্যান্য প্রাণীরা তেষ্টা মেটাবার জন্য অথবা আগ্রহের সঙ্গে নোনা মাটি চাটতে আসে তাদের গুলি করে মারে। আর কাঠ চোরেরা, যাদের কাজ হচ্ছে চন্দন কাঠ, শাল কাঠ, বৃহৎ জাতের বাঁশ ইত্যাদি চুরি করা, তারা বনে গিয়ে ঐ সমস্ত কাঠ কেটে এবং তারপর সেগুলো সুবিধামত লম্বায় টুকরো টুকরো করে নদীপথে ভাসিয়ে অথবা লুকিয়ে চুরিয়ে গরুর গাড়ীতে করে নিয়ে আসে। আবার যারা যথেষ্ট বেপরোয়া তারা ঐগুলো লরি ভর্তি করে নিয়ে আসে।

তৃতীয় আর এক শ্রেণীর লোক এই ধরনের রাতের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। তারা মাছ চুরি করে। তবে জাল বা ছিপ দিয়ে এরা মাছ ধরে না। কেননা এতে সময় যেমন বেশী লাগে, তেমনি কষ্টও। বিস্তৃততর ও গভীরতর অংশসমূহে এক এক সময় নানা জাতের মাছ ঘুমোবার জন্য বা খাবার খোঁজার জন্য বড় বড় ঝাঁক বেঁধে থাকে, সেটা ঐ মাছ চোরদের জানা। তারা বাড়িতে লুকিয়ে ছিপ আর জালের বদলে কাঁচা বারুদ ও সলতে দিয়ে বোম তৈরী করে এবং ঐ সমস্ত জায়গায় গিয়ে তা ব্যবহার করে। মাছ চোরেরা ডিঙিতে করে ধীরে ধীরে নদীর ভাটিতে মাইল পাঁচেক পর্যন্ত এইভাবে ভেসে যায় এবং পথে ঐ রকম যে সব এলাকা পড়ে তার প্রত্যেকটিতে হানা দেয়। সেখানে তারা বোমের সলতে আগুন ধরিয়ে জলে ভাসিয়ে দেয়।

বোমাগুলো যখন ফাটে তখন জলে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বড় বড় মাছগুলো অচেতন হয়ে পড়ে, অজস্র ছোট ছোট মাছ মারা যায় এবং বিস্ফোরণ স্থানের কয়েক গজের মধ্যে যেসব পোনা থাকে সেগুলোও মরে যায়। মাছগুলো তারপর জলে ভেসে উঠলেই মাছ চোরের দল বড় বড় জাল দিয়ে ধরে ডিঙিতে তুলে ফেলে। ছোট মাছ ও মরা মাছগুলো তারা নেয় না।

এরা কয়েকজন মিলে একটা দল তৈরী করে সাধারণতঃ দুটো ডিঙি ব্যবহার করে—একটা থেকে বোমা ফেলা হয় এবং অন্যটায় মাছ তোলা হয়। যতক্ষণ না ডিঙিটা মাছের ভারে জলে ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় ততক্ষণ তারা মাছ ধরার থেকে বিরত হয় না। ব্যাপারটা যাতে ফাঁস না হয় তাই প্রতিবার মাছ ধরার পর দলের প্রত্যেককে এক ঝুড়ি করে মাছ দেওয়া হয়। আর যদি

কখনও আইন রক্ষাকারী কোন কর্মচারীর চোখে এই দুষ্কর্ম ধরা পড়ে তবে তারা ঐ কর্মচারীকে সব থেকে বড বড মাছগুলোর গোটা ছয়েক মাছ দিয়ে দেয়। আর তাতেই কর্মচারীর মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর তারা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে ডিঙি ভেড়ায়। এখানে মাছগুলোকে ভাল করে ধুয়ে চটের বস্তাতে ভরা হয়।

এইভাবে নদীতে নদীতে এরা দুষ্কর্ম করে থাকে। তবে অমাবস্যার সময় এরা এই কাজে বেরোয় না। বিশ্রাম নেয় এবং পরবর্তী জ্যোৎস্নার জন্য হাঁ পিত্যেশ করে বসে থাকে।

যেখানে বেশি নির্জন বা বনরক্ষী বাহিনীর কর্মচারী নেই সেখানে দিনের বেলাতেই জলাশয়ে বোমা ফাটান হয়। দুঃখের বিষয়, আজকাল বাধা বিপত্তি তেমন আর নেই। দেশ স্বাধীন হবার পর ঐ সব চোরদের চুরি করবার জন্য এখন আর রাতের অপেক্ষা করতে হয় না।

এখন ওসব কথা থাক, আসল গল্পতে আমরা আবার ফিরে আসি। আবার চন্দ্রালোকিত রাত ফিরে এলে একদল মাছ চোর পর পর অনেকগুলো জলাশয়ে বোমা ফাটিয়ে জাল দিয়ে মাছ ধরে দ্বিতীয় একটা ডিঙিতে ভর্তি করতে লাগল। ডিঙিতে যাতে বেশী মাছ ধরে তার জন্য ডিঙি চালাবার এক জন মাত্র লোক ছিল। লোকগুলো মধ্য রাতের পর পর্যন্ত একটানা কাজ করে গেল। তারপর তারা ঠিক করল সময় করে তীরে গিয়ে সঙ্গে করে আনা খাবারগুলো খেয়ে আসবে।

ঘটনাক্রমে মাল বোঝাই ডিঙিটা, যেটা একজন লোক টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তীরের কাছাকাছিই ছিল। তার সঙ্গীরা যারা অন্য ডিঙিতে ছিল তারা তাকে ডেকে বলল, 'ভাই, নৌকো তীরে ভেড়াও। যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে এবং অনেক মাছ ধরা হয়েছে চল একটু বিশ্রাম করে সঙ্গে করে যে খাবার এনেছি খেয়ে একটু ঠাণ্ডা কফি পান করে নেওয়া যাক।"

প্রথম ডিঙির লোকটা তাদের কথায় রাজী হল। সে তখন বৈঠাটা একবার বাদিকে, একবার ডানদিকে ঘন ঘন ও জোরে জোরে মারতে মারতে তাড়াতাড়ি ভাবে, নদীর স্রোত কেটে ডিঙ্গি তীরে নিয়ে চলল।

লোকটা ডিঙি নিয়ে একসময়ে তীরে এসে পৌছল। ডিঙ্গির বাঁশের তৈরী তলদেশের সঙ্গে বাঁধা দড়িটার অপর দিকটা হাতে করে কোন গাছের গুঁড়ি অথবা শিকড়ের সঙ্গে বাঁধবে বলে সে ডাঙায় লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু

তাকে আর দড়ি বাঁধতে হল না। তার সঙ্গীরা তাকে লক্ষ্য করছিল। কেবল হলুদ রঙের একটা বিরাট জন্তু জলের পাশের মেন্দির ঝোপ থেকে লাফিয়ে পড়ল। তারা একটা অস্ফুট গর্জনও শুনতে পেল এবং অদ্ভুত আকৃতির ধূসর বর্ণের একটা কিছু তাদের সঙ্গীর দেহের উপর গিয়ে পড়তেই সঙ্গীর কালো দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখল; তারা তার আকাশ ফাটানো চীৎকার শুনতে পেল। তারপরই তাদের ডিঙিটার ওপর নজর পড়ল, দেখলো দড়িটা ঐ লোকটির হাত থেকে এসে দড়ি সমেত নৌকা নদীর স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছে।

যে লোকটা অন্য ডিঙিটা বাইছিল সে ভেসে যাওয়া ডিঙিটাকে ধরবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল। কিন্তু ধরতে পারল না। ক্রমে ডিঙিটা পাক খাওয়া নদীস্রোতে পড়ে আরও জোরে ভাসতে ভাসতে মাঝনদীর দিকে এগিয়ে গেল।

অনুসরণকারী মাঝিটিও দিশেহারা হয়ে নিজের নৌকোটাকে বিপজ্জনক এলাকায় নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার সঙ্গীরা তাকে বাধা দিল। তারা ভয়-চকিত চোখে লক্ষ্য করল, যাত্রীশূন্য নৌকাটা পাহাড়ে গিয়ে জোরে ধাক্কা খেয়ে টলতে লাগল এবং তারপর ডুবে গেল। আর মাছগুলো সব নদীর জলে ভেসে গেল। তারা তখন তাদের সঙ্গীকে গালাগাল দিতে লাগল। তাকে মারবে বলে তীরের দিকে অগ্রসর হল। মাছগুলোর কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, কিন্তু ঐ বিরাট ডিঙিটা এখন তৈরী করতে গেলে একশো টাকা লাগবে। কিনতে গেলে তো আরও বেশি দাম দিতে হবে। তারা স্থির করল, লোকটাকে খুব করে ধোলাই লাগাবে।

কিন্তু তীরে ঐ সঙ্গীকে দেখতে পাওয়া গেল না। তারা হলুদ রঙের যে একটা জিনিস দেখেছিল ও তার গর্জনও শুনেছিল এবং তার সঙ্গেই যে তাদের সঙ্গী ছিটকে পড়ে গিয়েছিল, এই সমস্ত যখন মনে পড়ল, তারা ভেসে যাওয়া ডিঙিটাকে ধরবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে তাদের সঙ্গীর কি দশা হল তা ভাববার সময় তারা পায় নি।

যে লোকটা ডিঙি বাইছিল সে তার সঙ্গীর অবস্থা দেখবার জন্য তীরে যেতে চাইল, কিন্তু তার অন্যান্য সঙ্গীরা তাকে বাধা দিল। তাদের মতে, ওখানে নিশ্চয়ই কোন দুষ্টু আত্মা আছে যে তাদের সঙ্গীকে টেনে নিয়েছে। আর তারা যদি সাহসে ভর করে খুব সামনাসামনি যায় তবে তাদের সকলকেও ধরে নেবে।

অনেকদিন ধরে চিতাটার কথা কারো মনে ছিল না। এখন অনেকের মনেই জেগে উঠল চিতাটার কথা। তখন তারা বুঝতে পারল, যে হলুদ রঙের বস্তুটা তারা দেখেছে সেটা ঐ চিতাবাঘটারই, আগে থেকে লুকিয়ে বসেছিল। তাদের ধারণা, চিতাটাই তাদের সঙ্গীকে মেরে ফেলেছে এবং তাকে খেয়ে নিয়েছে।

তীরে যেতে তাদের সাহস হল না। তাই তারা ডিঙি উজানে নিয়ে চলল। আধ মাইল যাবার পর তারা এগোনো সম্ভব নয় মনে করে তীরের দিকে এগোতে লাগল। তীরে পৌছে তারা কে আগে নামবে, সেই নিয়ে মহাচিন্তায় পড়ল। শেষ পর্যন্ত সবাই একসঙ্গে লাফিয়ে ডাঙায় নামল। তারপর ডিঙিটাকে টেনে কয়েক গজ উপরে তুলে দল বেঁধে গ্রামের দিকে এগোতে লাগল। আর চিতাটা তাদের কথা শুনে তাদের দিকে যাতে না আসে সেজন্য যতটা সম্ভব জোরে চেঁচিয়ে কথা বলতে লাগল।

পরের দিন সকালে সেই লোকগুলো গ্রামের আরও কয়েকজনকে নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঐ নিখোঁজ লোকটার সন্ধানে গেল। তারা মেন্দি ঝোপের আড়ালে লোকটার দেহাবশেষ দেখতে পেল। তার দেহটা টুকরো টুকরো করা হয়েছে ঠিক, কিন্তু এক টুকরো মাংসও জন্তুটা খায় নি।

এইভাবে চিতাটা সুযোগ পেলেই মানুষ খুন করতে লাগল। তবে আকর্ষণীয় ব্যাপার এই যে, সে মাংস স্পর্শ করতো না। প্রতিটা মৃতদেহে শুধুমাত্র আঁচড়ানো কামড়ানোর চিহ্ন পাওয়া যেত। মনে হয়, মৃতদেহগুলো প্রায় চেনাই যায় না এরকমভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেই চিতাটা প্রচণ্ড আনন্দ পেতো।

নদীটার যে অংশটাতে এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেই অংশটা ভারতীয় মাছেদের রাজা 'মাসীর' মাছ ধরবার আকর্ষণীয় স্থান। কিন্তু মাছ ধরবার প্রতি আমার আকর্ষণ কোনদিনই ছিল না। আর মাছ ধরতে গেলে যে ধৈর্য দরকার তাও আমার নেই। কিন্তু আমার বন্ধুদের অনেকে মাছ ধরতে ভালোবাসে এবং তাদের কাউকে না কাউকে নিয়ে মাঝে মধ্যে আমাকে ঐ নদীতে গিয়ে দিন দু'য়েকের মত কাটাতে হয়।

আমরা খুব কমই যেতাম। কারণ তালাইনভু থেকে অরণ্যের ভেতর দিয়ে নদী পর্যন্ত যে উঁচু নীচু রাস্তা আছে সে রাস্তা খাড়াই এবং রাস্তাটাতে হঠাৎ কতগুলো মোড় আছে। এই কারণে আমার স্টুডিবেকার গাড়ীটা ঐ রাস্তা

দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই যখন কোন জীপগাড়ীর অধিকারীকে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য পাওয়া যেত অথবা সৌভাগ্যক্রমে কোন জীপ গাড়ী অথবা ঐ রকম কোন গাড়ী ভাড়া পেতাম তখনই কেবল আমাদের নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া হয়ে উঠতো।

অবশেষে আমরা এরকম একটা সুযোগ পেলাম এবং মনে হল স্থায়ীভাবেই এল। আমার ছেলে ডোনাল্ড একটা পুরোনো গাড়ী কিনলো, তবে গাড়ীটার যন্ত্রের অনেক দোষ ছিল। সে ঐ গাড়ীটাকে প্রচুর টাকা খরচ করে নতুন কলকব্জা লাগিয়ে ঠিক করে নিল। ফলে আমরা যেকোন জায়গায় যেতে পারে এরকম একটা গাড়ীর অধিকর্তা হয়ে পড়লাম।

তারপর একদিন দিন স্থির করে তালাইনভুর মাছধরার জায়গাটার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ডোনাল্ড তার নতুন গাড়ীটা চালাচ্ছিল। তার পাশে বসে ছিলেন "খুদে" সেভন। তিনি একজন "বিরাট" মাসীর মাছ শিকারী। তাঁর বিরাটত্ব কেবল মাছধরার ক্ষমতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার দেহের উচ্চতা এবং বুকও বিশাল। পিছনের সিটে আমরা তিনজন বসলাম। এদের মধ্যে একজন ডোনাল্ডের পুরানো বন্ধু ও স্কুলের সহপাঠী মেরওয়াল চামার বাউগভালা। দ্বিতীয় জন আমার একসময়ের শিকারের সাথী থাঙ্গাভেলু। রান্না বান্না থেকে শুরু করে গাড়ি পরিষ্কার করা সব কাজই সে করে। তার উপর ভার সে ক্যাম্পে গিয়ে রান্না করবে। আর তৃতীয় এবং শেষজন শুনলাম আমি, একেবারে কোণঠাসা হয়ে অশান্তিতে 'নট নড়ন-চড়ন' হয়ে বসে আছি।

তালাইনভু থেকে দশমাইল দূরে কাবেরী নদীর ধারে যে জায়গাটাতে আমরা মাছ ধরবার জন্য তাঁবু ফেলব বলে ঠিক করেছিলাম ঐ জায়গাটা আমাদের বাঙ্গালোরের বাড়ী থেকে ঠিক নিরানব্বুই মাইল দূরে। বাঙ্গালোর থেকে বেরোতেই আমাদের একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমরা যখন নির্দিষ্ট জায়গায় এসে হাজির হলাম তখন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে নানা রঙের ঝরণা সৃষ্টি করে অস্ত যাচ্ছে। আমরা বরাবর একই জায়গায় তাঁবু ফেলি। তমাল, তেঁতুল প্রভৃতি বড় বড় গাছের বাগানেই আমরা তাঁবু ফেললাম।

গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই কাজে লেগে গেলাম। হাতীর যাতায়াতের কোন চিহ্ন আছে কিনা ডোনাল্ড তা খুঁজে দেখতে লাগল। কারণ সামনা সামনি কোন হাতী থাকলে আমাদের অনধিকার প্রবেশে সে

ক্ষেপে গিয়ে বজ্রগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কোন চিহ্ন না পেয়ে বোঝা গেল এখানে হাতী নেই। একটু নিশ্চিন্ত হলাম। আমি পা দিয়ে ঝরাপাতা, পাথরের টুকরো ও শুকনো কাঠের টুকরো সরিয়ে পাঁচ ছ' গজ ব্যাস নিয়ে চক্রাকারে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করতে লাগলাম। কারণ এই সব নোংরা আবর্জনার মধ্যে কাঁকড়াবিছা এবং নানাধরনের বিষাক্ত প্রাণী লুকিয়ে থাকে। আর থাঙ্গাভেলু নিজের কাজে মেতে উঠল। সে দ্রুত "ক্যাম্প-ফায়ার"-এর জন্য শুকনো কাঠ যোগাড় করতে গেলে। ডোনাল্ড তাকে সহায়তা করল। আমরা ঘুমিয়ে থাকাকালীন যদি কোন হাতী এপথে এসে পড়ে সেই ভয়ে সারারাত্রি এই 'ক্যাম্পফায়ার' জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

টিনি সেভন একটা আধডোবা পাথরের ওপর লাফিয়ে উঠলেন এবং ঘূর্ণাবর্ত নদীস্রোতের দিকে চিন্তিত মনে তাকিয়ে রইলেন। পরদিন সকালে কোথায় বসে মাছ ধরা হবে, সেটাই তিনি নির্দিষ্ট করছিলেন। চামার বাউগভাজা আমি এইমাত্র যে জমিটা পরিষ্কার করেছি তার ওপর শুয়ে পড়ল এবং বলতে লাগল যে, গাড়ির মধ্যে থাকার চাইতে এখানে থাকা অনেক বেশী শান্তি।

আমরা তখনও কেউ চিতাবাঘটা সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। তাই সেই প্রাণীটার কথা আমাদের মনে পড়ল।

অন্ধকার চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছে। চাঁদ তখনও আকাশে দেখা দেয় নি। আমরা খেতে বসলাম। মেরওয়ানের আনা মুরগীর মাংসের বিরিয়ানী এবং শুয়োরের মাংসের ভিন্দাআলু দিয়ে ভাজো খাওয়া হলো। তারপর নদীতে আমরা জল খেতে গেলাম। আর থাঙ্গাভেলু চা তৈরী করতে লাগল, টিনির ধারণা নদীর জল খেলে কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি অসুখ হয়। তাই টিনি ছাড়া আমরা সকলেই নদীর জলই খেলাম। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে মাথার ওপরকার পাতার ফাঁক দিয়ে নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে ধূমপান করতে লাগলাম। অবশেষে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ কেন জানি আমি ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠলাম। ঘড়িতে তখন তিনটে বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে। ক্যাম্পফায়ার প্রায় নিভে এসেছে, কয়েকটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো ছাড়া সবই পুড়ে গেছে। ক্যাম্পফায়ার জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব যার সেই থাঙ্গাভেলু অনেকক্ষণ হলো ঘুমিয়ে পড়েছে। ডোনাল্ড আমার বাঁদিকে শুয়ে বেশ জোরে জোরে নাক ডাকছে। আর

আমার ডানদিকে টিনি ও সেরওয়ানও দিব্যি ঘুমোচ্ছে। মশা ও কুয়াশা থেকে বাঁচবার জন্য তারা চাদর দিয়ে মাথাও ঢেকে রেখেছে।

আমি চিন্তা করে পেলাম না কেন আমার ঘুমটা এমনভাবে হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। সম্ভবতঃ জঙ্গলের কোন শব্দে জেগে উঠেছি। আমি ভালো করে কান পেতে রইলাম শব্দ শোনার আশায়। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য ডোনাল্ডের নাক ডাকার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলাম না।

হঠাৎ একটা গ্যাক গ্যাক ঘড়ঘড় আওয়াজ। শব্দটা খুব কাছ থেকেই আসছে।

জঙ্গলের স্বাভাবিক পরিবেশে চিতাবাঘ একেবারেই ক্ষতিকর নয়। একমাত্র ব্যতিক্রম তখনই যখন চিতাবাঘ মানুষ খেকোতে রূপান্তরিত হয়। তবে সেটা খুব কমই হয়। আর চিতারা ক্ষতিকর হয় যখন তারা জখম হয় অথবা ভীতু ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে, তখন তারা মানুষের কাছ থেকে সরে পড়তে চায়। তাই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ক্ষুধার্ত চিতাটা আমাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি থাকলেও, সে আমাদের "ক্যাম্প ফায়ার"-এর জ্বলন্ত কাঠগুলো লক্ষ্য করেনি। যখনই সে ওগুলো দেখতে পাবে তখনই তার প্রাণপণ দৌড়ে এখান থেকে চলে যাবার সম্ভাবনা। আধঘুমন্ত অবস্থায় শব্দটা শুনতে শুনতে আমি তাই চিন্তা করতে লাগলাম।

আবার ডাক। এবার আরও জোরালো ভাবে শোনা গেল। নিঃসন্দেহে ক্ষুধার্ত চিতাটা বেশ কাছে এসে পড়েছে। নিশ্চয়ই সে এতক্ষণে আগুনটা দেখতে পেয়েছে। কিন্তু বিছানা থেকে উঠতে আমার আলসেমি লাগছিল। ঘুমেও চোখদু'টি যেন বুঝে এসেছে। মনে মনে ভাবলাম, ভয়ের কি আছে। আমি তো ক্যাম্পের মাঝামাঝি অবস্থায় নিরাপদেই রয়েছি।

ঠিক এই সময় আবার হুঙ্কার শুনতে পেলাম। ভাবলাম আগুন দেখে এইবারে চিন্তিত হয়ে পড়বে। কিন্তু না আবার সে দীর্ঘক্ষণ ধরে ভীতিকর ভাবে ডাকতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে নীচু স্বরে থেমে থেমে গজরাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমি বালিশের তলা থেকে টর্চটা খুঁজতে লাগলাম। ঘুম চোখে হাত রগড়াতে রগড়াতে চিতাটার আওয়াজ যে দিক থেকে আসছিল সেদিকে টর্চের আলো ফেললাম।

টর্চের আলোতে চিতাটাকে স্পষ্ট দেখা গেল। থাম্বাভেলুর কয়েক ফুট

দূরেই সে ওৎ পেতে বসে আছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সে তাকে আক্রমণ করবার জন্য তৈরী হয়েছে। দেখতে পাচ্ছিলাম সে তার লেজটাকে বারবার এদিক ওদিক করছিল—এটা তার দুষ্ট মতলবের সুস্পষ্ট প্রমাণ। আমি মাটিতে রাখা গুলিভর্তি রাইফেলটা খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু হঠাৎ থাঙ্গাভেলু সব ভেস্তে দিল।

খুব সম্ভব, জঙ্গল সম্বন্ধে তার সহজাত অনুভবশক্তিই এর জন্য দায়ী। যে মহা বিপদ শিয়রে এসে উপস্থিত ঐ অনুভবশক্তিই তাকে সে সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছে, তবে একটু দেরীতে। সে তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়ল, ফলে টিনির খাওয়ার জন্য যে ডেচকিতে জল গরম করে রেখেছিল সেটি পায়ের ধাক্কায় উল্টিয়ে গেল। ঐ ডেকচি পড়ার শব্দে অথবা থাঙ্গাভেলুর নড়াচড়ার শব্দে অথবা আমার টর্চের আলো দেখে চিতাটার বুঝতে অসুবিধা হল না যে আমরা তার অস্তিত্ব টের পেয়েছি। আমি রাইফেল থেকে গুলি নিক্ষেপ করার আগেই চিতাটা বনের মধ্যে পালিয়ে গেল।

থাঙ্গাভেলু ঘুমে এত মগ্ন ছিল যে এতক্ষণ কিছুই টের পায়নি। এখনও তার চোখ থেকে ঘুম কাটেনি। তাই সে চিতাটার ডাক শুনতে পায়নি এবং তাকে দেখতেও পায়নি। আমি সকলকে ডেকে তুলে সমস্ত ঘটনাটা বললাম।

প্রথমে তারা আমার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। তারপর ডোনাল্ড বলল, "বাবা, আপনি দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। মেরওয়ানের আনা মুরগীর মাংসের বিরিয়ানী এবং শুয়োরের মাংসের চপই এর কারণ। সমস্ত রাত্রে আমি কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পাইনি। আর কয়েক মাইলের মধ্যে একটাও প্যান্থার আছে কিনা সে বিষয়েই আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

আমার ছেলের কথা শুনে অন্য সকলে হো হো করে হেসে উঠল। তাতে আমি একটু রেগে গেলাম। সমস্ত রাত্রি তো ডোনাল্ড নাক ডেকেছে। সে কি করে বলতে পারে যে কোন শব্দ শুনতে পায়নি। আমি টর্চ আর রাইফেল নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

কিন্তু এখানকার মাটি শক্ত থাকায় চিতাটার পায়ের ছাপ দেখা গেল না।

ফলে ডোনাল্ড আমাকে বিদ্রূপের সুরে বললো, "কোথায় কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না?" মেরওয়ানও বকবক করে বলতে লাগল "শুধু শুধু কেন আপনি আমার সুন্দর ঘুমটা নষ্ট করলেন।"

এরপর আমি বাদে সবাই শুতে চলে গেল। আমার কথা কেউই বিশ্বাস করতে চাইল না। তবে আমার স্থির বিশ্বাস চিতাটা আমাদের ভৃত্যের ওপরই হানা দিত, এটা স্বপ্নও নয়, কল্পনাও নয়। এটা খাঁটি সত্যি।

গত সন্ধ্যায় থাঙ্গাভেলু কিছু কাঠ যোগাড় করে রেখে দিয়েছিল। আমি ক্যাম্পফায়ারের আগুনকে আবার জাগিয়ে দিলাম। তারপর রাইফেল ও টর্চ হাতে করে গোটানো বিছানার ওপর হেলান দিয়ে বাকি রাতটা না ঘুমিয়ে জেগে কাটালাম। আমি 'স্পষ্ট' বুঝতে পেরেছিলাম, যে চিতাটাকে আমি দেখেছি সেটা মানুষখেকো এবং থাঙ্গাভেলু খুব ভাগ্যের জোরে ওর হিংস্র থাবার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। আমি চিতাটার যে ডাক শুনে ঘুম থেকে উঠেছিলাম, সেই ডাকটা ছিল ক্ষুধার্ত। তাই তার ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল।

ঘণ্টাখানেক সময় এরপর কেটে গেল। হঠাৎ আধমাইল দূরবর্তী পাহাড়ের ধারে একটা সম্বরের ডাক শুনতে পেলাম। এরপর কতকগুলো চিতল হরিণের আর্তনাদ শুনতে পেলাম। সম্ভবতঃ চিতাটাকে তারা দেখতে পেয়েছে নয়তো তার গন্ধ অনুভব করেছে। বুঝতে পারলাম, চিতাটা পাহাড়ের ধার দিয়ে চলে গেছে।

দীর্ঘ সময় পর একফালি চাঁদের উদয় হলো। তার উজ্জ্বল আলোয় একেবারে কাছের জিনিসগুলিও দেখা যাচ্ছিল। পাথরের ওপর নদীটা নিজের মনে কুল কুল করতে করতে এগিয়ে চলেছে, একসময়ে রাত শেষ হয়ে ভোর হল। টিনিই ঘুম থেকে আগে উঠল। সে আমাকে দেখে বলল, "আপনি কি সারারাত্রি জেগে কাটিয়েছেন?"

আমি তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম "থাঙ্গাভেলুকে ডেকে একটু চা করতে বল।"

টিনি প্রায় সারাদিন মাছ ধরতে লাগলো। সে একটা দশ পাউণ্ড ওজনের ও দুটো সাত পাউণ্ড ওজনের মহাশের এবং কতকগুলো ছোট ছোট মাছ ধরল। ডোনাল্ড মাছ ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু সেও আমার মত ধৈর্যহীন। সুতরাং বৃথাই চেষ্টা। মেরওয়ান স্নান করার জন্য তোয়ালে কাঁধে নিয়ে নদীর ভাটির দিকে এগিয়ে চলল। আমার এই সময় আবার মানুষখেকো চিতাটার কথা মনে পড়ল। আমি তখন মেরওয়ানকে পেছন থেকে চীৎকার করে

বললাম, "এক মিনিট দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।" আমি রাইফেলটা কাঁধে নিয়ে তোয়ালে হাতে করে তাকে অনুসরণ করে এগোতে লাগলাম।

ঐ দিন বিকেলে সবার ঘুমে চোখ বুজে এল। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। ক্যাম্প নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে একটা "বুম বুম" শব্দ বেশ কয়েকবার চারিদিক কাঁপিয়ে আওয়াজ তুলল এবং ক্রমশঃ শব্দটা আমাদের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

মাছ চোর! প্রকাশ্য দিনের আলোয় তারা নদীতে বোম মেরে মাছ ধরছে। স্পষ্ট বুঝলাম তাদের ধরা পড়ার ভয় নেই। মুহূর্তের মধ্যে দু'খানা ডিঙ্গি দেখতে পেলাম। একটাতে লোক ভর্তি এবং দ্বিতীয়টা মাছে ঠাসা। আমাদের দেখতে পেয়ে লোকগুলো পড়ি মরি করে স্রোতের প্রতিকূলে নৌকা বেয়ে অপর পাড়ে পৌঁছাবার চেষ্টা করতে লাগল।

তাদের এই দুষ্কর্ম দেখে আমাদের মনে রাগ হল। আমরা কঠোর হতে বাধ্য হলাম। ডোনাল্ড বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজ করে চেঁচিয়ে বলল, "ভাল চাও তো, এদিকে এগিয়ে এসো। নয়তো এক একটাকে গুলি করে মারবো।"

তারা নৌকো বাওয়া বন্ধ করে স্রোতে ভেসে চলল। বুঝতে পারলাম, ওরা এগিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করবে না। দেখলাম তাদের নিজেদের মতে এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে।

মেরওয়ান চেঁচিয়ে বলল, "আরে, বুদ্ধুরামরা, এদিকে এসো। নয়তো ডিমের খোলার মত ডুবিয়ে দেব জলের তলায়।"

তারা অবশ্য মেরওয়ান কি বলছে তা বুঝতে পারল না।

অবশেষে ধীরে ধীরে লোকগুলো ডিঙি বেয়ে আমাদের দিকে এগোতে লাগল। তারপর পাড়ের কাছে এসে ডাঙা থেকে কয়েক গজ দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা ডাঙ্গায় তাদের থেকে একটু উঁচুতে ছিলাম বলে ডিঙি ভরা মাছগুলো ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলাম।

তারপরেই শুরু হল তাদের সঙ্গে তর্ক। তা যেমন প্রয়োজনহীন তেমনিই অর্থহীন। তাদের এরকম দুষ্কর্মের জন্য ডোনাল্ড পর্যায়ক্রমে তাদের ভয় দেখাতে ও গালমন্দ করতে লাগল। তারা বলল, তারা একাজের মধ্যে দোষের কিছু দেখছে না। মাছ নির্দিষ্ট কোন লোকের ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। সুতরাং সরকার মাছধরার ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করতে অথবা লাইসেন্স দাবী করতে

যাবে কেন? আর আমাদেরই বা এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কি আছে? এই রকম আরও কত কি বললো।

আমাদের দলের মধ্যে থাঙ্গাভেলুরই এই সবে বেশী অভিজ্ঞতা। সে বলল, "সব থেকে ভাল কথা বলছি, বড় মাছগুলোর ভেতর থেকে সবচেয়ে বড় দুটো মাছ দাও। তারপর তোমরা যা খুশী করগে, আমরা দেখতে যাব না।"

এসব কথাবার্তার মধ্যে আমিও ঝোপ বুঝে কোপ বসিয়ে দিলাম। বললাম, "শোন এ অঞ্চলে কি কোন মানুষখেকো চিতা আছে?"

আমার কথা শোনা মাত্রই সবাই চুপ করে রইল এবং পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। তারপর একজন নীচু গলায় বলল, "হ্যাঁ, সাহেব আছে। মাত্র কয়েকদিন আগে শয়তানটা আমাদের এক সঙ্গীকে মেরে ফেলেছে। এই কারণেই আমরা উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় মাছ ধরে বেড়াচ্ছি। সাধারণতঃ আমরা চন্দ্রালোকিত রাতে মাছ ধরি কিন্তু এখন সূর্যাস্তের পর যে কোন লোক একটু নড়তেও ভয় পায়।"

লোকটার এত আস্তে কথা শুনে আমার মনে হল যাতে তৃতীয় কোন ব্যক্তি এই কথাগুলো না শুনতে পায় তাই এত ধীরে ধীরে কথা বলছে।

বুঝলাম, আমার ধারণা সঠিক।

এই কথাগুলো ডোনাল্ডের মনে আলোড়নের সৃষ্টি করল। সে লোকগুলোকে বলল, "এদিকে এস, ডাঙায় এস। রেখে দাও তোমাদের মাছের ব্যাপার। আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করব না। আমরা শিকারী, তাই চিতাটার বিষয়ে বেশ কিছু খবর শুনতে চাই। আমরা সেটিকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করবো।"

সমস্ত কিছু মেটবার পর লোকগুলো তাদের ডিঙিগুলো পাড়ে গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে ডাঙায় উঠে এল। এবং আমাদের চারপাশে গোল হয়ে বসল। আমি আর ডোনাল্ড প্যান্থারটার বিষয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম এবং তারাও যথাসম্ভব উত্তর দিতে লাগল। তারা যে-সব খবর দিল সেগুলো পরপর সাজিয়ে দাঁড় করালে আমি যা বলেছিলাম তাই হয়ে দাঁড়াবে। লোকগুলো বললো, চিতাটা আসল মানুষখেকো নয়। সে মানুষকে হত্যা করে এবং নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে গিয়ে শিকারকে খাঁমচে, আঁচড়ে দেবে এবং দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে। এতেই সে আনন্দ পায়। কোন সন্দেহ নেই, চিতাটা মাদী। সে যেমন অসাধারণ চালাক তেমনি

অস্বাভাবিক স্মরণ শক্তির অধিকারী। চিতাটা যে তার বাচ্চাগুলির নির্মম হত্যার কথা ভুলতে পারেনি এখনও সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল। আর মানুষের প্রতি বিরক্তি ঘৃণা যেমন ছিল এখনও তেমনই বজায় আছে। সম্পূর্ণ গল্পটা শুনে আমাদের মনে জানোয়ারটার প্রতি সহানুভূতি জাগলো।

এরপর লোকগুলো আমাদের কাছ থেকে বিদায় চাইলো। আমাদের আরো কিছুর জানা ছিল। তাই রেগে গিয়ে বললাম, দূর হও এখান থেকে। কিন্তু থাঙ্গাভেলু তার মাছের কথা ভোলে নি। সে সবচেয়ে বড় দেখে দুটো মাছ বেছে নিল।

নৌকো দুটো ছেড়ে দিল। থাঙ্গাভেলু সমেত আমরা সকলে চিতাটাকে কি ভাবে গুলি করে মারা যায় সেই আলোচনায় গভীরভাবে মগ্ন হলাম। বিশেষ করে ডোনাল্ড ও মেরওয়ানের এ বিষয়ে বেশী উৎসাহ দেখলাম। আমার মত হল, চিতাটার ব্যাপারটা আর অবহেলা করবার মত নয়।

প্রথম থেকে অন্য সকলে মনে করল যে চিতাটা যেহেতু ঠিক মানুষখেকো নয় তাই তার দেখা পাওয়ার জন্য আমাদের নাজেহাল হতে হবে। আমি কিন্তু তাদের কথা মানতে পারলাম না। আমার ধারণা, তাড়াহুড়া না করলেই বরং চিতাটার দেখা পাওয়া অনেক বেশী সহজ হবে। কারণ মানুষের ওপর তার হৃদয় বিদ্বেষে পূর্ণ হওয়ায় সে দিশেহারা হয়ে নিজে থেকে আমাদের ওপর হানা দেবে। অবস্থা বিবেচনা করে দেখলাম দলবদ্ধ না হয়ে প্রত্যেকের পক্ষে একা একা চিতাটার খোঁজ করাই হবে সব থেকে ভাল। তাহলে আমরা শয়তানটাকে মারবার চারগুণ সুযোগ পাব।

আমাদের যাকেই সে নজর করবে, তাকে নিঃসঙ্গ দেখে অমনি আক্রমণ করে বসবে। অবশ্য মাছধরা লোকগুলোর কাছ থেকে শোনা গল্প থেকে বোঝা যায় যে, দলবদ্ধ মানুষকে আক্রমণ করতেও সে এতটুকু ভীত নয়। থাঙ্গাভেলুর পন্থা অনুযায়ী চলতে গেলে চিতাটাকে মারতে বরং যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। কারণ থাঙ্গাভেলুর প্রস্তাবনুযায়ী আমাদের জিপে করে তালাইনভু গিয়ে টোপ হিসাবে দুটো মোষ বা বলদ কিনতে হবে। তারপর সে গুলোকে পায়ে হেঁটে তাড়াতে তাড়াতে নিয়ে আসতে হবে এবং সে-গুলো বাঁধবার মত উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে হবে। এ করতে গেলে অনেক সময় অপচয় হবে, এটা আমি ভালো মতোই জানতাম। আর ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে তাতে চিতাটা আমাদের মত

তাড়াতাড়ি আক্রমণ করবে, টোপদুটোর যে কোন একটিকে আক্রমণ করার সম্ভাবনা সেক্ষেত্র অনেক কম।

ভাগ্য ভালো যে ডোনাল্ড তার পয়েন্ট ৪২৩ মসার রাইফেলটার সঙ্গে পয়েন্ট ১২ বোরের শটগানটাও নিয়ে এসেছিল এবং আমিও আমার পয়েন্ট ৪০৫ রাইফেল ও পয়েন্ট ১২ বোরের শটগান সঙ্গে করে এনেছি। ফলে আমাদের প্রত্যেকের অস্ত্রে সজ্জিত হবার মত উপযুক্ত সংখ্যক অস্ত্র রয়েছে।

স্থির করলাম, তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে নেব। তারপর টিনি আমার বিষাক্ত গুলিতে ঠাসা শটগানটা নিয়ে নদীর তীর ধরে সোজাসুজি ভাটির দিকে ঘণ্টা দু'য়েকের জন্য ঘুরে আসবে। ডোনাল্ডের শটগানটা নিয়ে মেরওয়ান ঠিক একই ভাবে নদীর উজানের দিকে ঘুরে আসবে। ডোনাল্ড আর আমি নিজেদের রাইফেল নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে জঙ্গলের পৃথক পৃথক দিকে খোঁজ করবো। খাঙ্গাভেলু কাছাকাছি কোন গাছে উঠে বসে থাকবে। এবং আমরা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আর আমাদের জীপ, ক্যাম্পের জিনিসপত্র যা এদিক-ওদিক ছড়ানো ছিল তার দিকে লক্ষ্য রাখবে। সেইসঙ্গে এও ঠিক হল যে আমাদের খুব বেশী দেরী হলেও, পাঁচটার মধ্যে যে যার ক্যাম্পে ফিরে আসবে।

পরিকল্পনানুযায়ী কাজ শুরু হল। হঠাৎ আক্রমণ সম্বন্ধে প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে বলে এক একজন একদিকে যাত্রা করল। প্রত্যেকেরই আশা, প্যান্থারটার দেখা পাবার মত সৌভাগ্য একমাত্র তারই হবে। আমার ধারণা, আমাদের মধ্যে কেউই একেবারে সঙ্গী বিহীন হবার আগে পর্যন্ত বুঝতে পারে নি সে কি দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছে, বুঝতে পারে নি পরবর্তী চারঘণ্টা বা তারও বেশী সময় সে নিজেকে এমন একটা হিংস্র পশুর টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে চলেছে যে পশুটা ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি স্থির করেছিলাম আগের দিন রাতে যেদিকে সম্বরের ডাক শুনেছিলাম সেদিকে এগোতে থাকবো। খুব সম্ভব ওদিকে কোন গুহা আছে। তাই বনের মধ্যে এদিক ওদিক না ঘুরে বেরিয়ে ওদিকে গেলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কিছুটা এগোনোর পরেই পশু চলাচলের রাস্তা দেখতে পেলাম। রাস্তাটা খুব পরিষ্কার। হরিণ ও অন্যান্য পশু গরমকালে নদীতে জল খেতে আসবার সময় এই পথ ব্যবহার করে থাকে। হরিণ ও একটা ভালুকের চলাফেরার দাগ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল ঐ এলাকায় বন্য পশুর সংখ্যা

মোটামুটি ভালই, যদিও সে তুলনায় গতরাতে বন্য জীবজন্তুর সাড়া পাওয়া গেছে কম।

পথটা কোনাকুনি ভাবে উপরের দিকে উঠে গেছে এবং পাথর ও ঘন ঝোপ-ঝাড়ের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। পাথর বা ঝোপের আড়ালে হিংস্র ও মাংসাশী প্রাণীরা আত্মগোপন করে থাকে, এই ভয়ে হরিণ জাতীয় জীব এইভাবেই চলে। এতে আমারই সুবিধা হল। যদিও আমি জানতাম যে চিতাবাঘ লুকোবার জন্য যে কোন রকমের আড়ালের সুযোগ নিতে পারে। এই অস্বস্তিকর চিন্তা করতে করতে আমি ডোনাল্ড ও আমাদের দুজন সঙ্গীর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মনে মনে অবশ্য ভাবলাম যে তারাও হয়তো আমার মত সাবধানে চলাফেরা করছে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম পড়ল প্রচণ্ড। আর পাখির কলকাকলিও বন্ধ হয়ে গেছে। তাই অতি সাবধানে নীরবতা রক্ষা করে চলতে হচ্ছিল। সামনে যে সব ঝোপঝাড় পড়ছিল তার সামনে এগোবার আগে ডান পাশে বাঁ পাশে ভাল করে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সেগুলো পরীক্ষা করে নিতে হচ্ছিল। আমার ধারণা হচ্ছে যদি বিপদ আসে তবে সেটা আসবে পেছন দিক থেকে। কারণ চিতা এবং অন্যান্য সমস্ত বাঘই মানুষকে আক্রমণ করা অভ্যাসে পরিণত করবার পরও মানুষ সম্পর্কে ভীতি সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারে নি। ফলে বেশীর ভাগ সময়ই ওরা পেছন দিক থেকে শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ে।

আমি অনুসন্ধানী চোখে দেখতে লাগলাম। কখনও একটা পাতা সন্দেহজনক ভাবে দুলে উঠছে, কখনও একটা ঘাসের মাথা চট করে সোজা হয়ে উঠছে, যেন ওটা ততক্ষণ কোন লুক্কায়িত পশুর দেহভারে চাপা ছিল। কখনও কখনও শুকনো ডাল ভাঙার স্পষ্ট শব্দ, বা খসখস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। শব্দ কানে এলেই একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পয়েন্ট ৪০৫ বোরের রাইফেলটা কিছুটা উঁচু করে যেদিক থেকে শব্দ আসছিল সেদিকে লক্ষ্য করছিলাম এই মনে করে যে, যে কোন মুহূর্তে হলুদ বর্ণের দেহটাকে আমার দিকে ছুটে আসতে দেখবো। কিন্তু কিছুই হল না। বাতাসে গাছের পাতা, ঘাস দুইই দুলে উঠছিল, শব্দও আসছিল। তখন আমার চিন্তা দূর হল, মানসিক উত্তেজনা কমে এল। ভাবলাম ভয়ের কিছু নেই। এইভাবে কিছুদূর যাওয়ার পরে অন্য আরেকটা শব্দ আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল।

আমি পাহাড়টার মাথায় গেছলাম। বিপরীত দিকের বাঁশের জঙ্গলে

বোঝাই উর্বরা উপত্যকার মধ্যে নামতে আরম্ভ করলাম। একটা ক্ষীণ খসখসানি ও পাতা টেনে নেওয়ার আওয়াজ, তারপরেই শোনা গেল বাঁশ ভাঙার ভীষণ শব্দ। নিঃসন্দেহে, কোন হাতী এখানে আছে।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। যেদিক থেকে শব্দ আসছিল সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি। যদি হাতীটা একা হয় তাহলে তার একেবারে কাছে গিয়ে হাজির হলে অতর্কিতে সে আক্রমণ করে বসতে পারে। আর অনেকগুলো হাতী দল বেঁধে থাকলে আমার অস্তিত্ব টের পেয়ে তারা পালিয়ে যাবে। আমি যে হরিণের পথচলা রাস্তাটা ধরে এগোচ্ছিলাম শব্দটা সেই দিকে চলে গিয়েছে। যদি আমি এখন হাতীটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য এই পথ ধরে হাটা ছেড়ে দিই তাহলে আমাকে খুব তাড়াতাড়িই কাঁটা ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজতে খুঁজতে যেতে হবে। অর্থাৎ যে পথ দিয়ে হিংস্র জন্তু জানোয়াররা চলাফেরা করে সেই পথ ধরে, নিঃসন্দেহে অ'ত বিপজ্জনক রাস্তা। তাই আমি হরিণ চলাচলের পথটা ধরে চলাই শ্রেয় মনে করলাম।

পাতার খসখসানি ও হাতীর বাঁশ ভাঙ্গার আওয়াজ আর পেলাম না। নিশ্চয়ই হাতীটা পালিয়েছে বা আমার উপস্থিতি টের পেয়েছে। এটা তারই ইঙ্গিত। আবার এও হতে পারে যে, সে আমার জন্য অপেক্ষা করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

মনে মনে আমি অধৈর্য হয়ে উঠলাম। হাতীটাকে তাড়িয়ে দেব বলে স্থির করলাম। অবশ্য পরে বুঝেছিলাম এই সিদ্ধান্তটা আমার ভুল হয়েছিল।

আমার ঔদাসীন্য হাতীটাকে দূরে সরিয়ে রাখবে মনে করে মুখে শিস দিতে দিতে এগিয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফল ফলে গেল; হাতীটা প্রায় লাফিয়ে এল। এবং নিজেদের সাহস বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য আক্রমণমুখী হাতীরা ঠিক যে রকম চীৎকার করতে থাকে ঠিক এই হাতীটাও সেই ভাবে চেঁচাতে চেঁচাতে কাঁটাঝোপঝাড় উপেক্ষা করে আমার দিকে তেড়ে এল। সবুজ ঝোপগুলো প্রচণ্ড শব্দে ফাঁক হয়ে গেল। সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল একটা দাম্ভিক মাথা যার সঙ্গে যুক্ত আছে দুটি দাঁত আর সেই ফাঁকের মধ্যে গোটানো একটা শুঁড়। আর তার বিরাট কানদুটো মাথার দু'পাশে প্রায় মিশে আছে।

আমি দ্রুত ভেবে নিলাম। এই অঞ্চলে কোন পাগলা হাতী রয়েছে সেকথা বন'বিভাগ থেকে ঘোষণা করা হয় নি। তাই আমি যদি এই হাতীটাকে হত্যা করি তাহলে আমাকে অশেষ ঝামেলার মধ্যে পড়তে হবে। আবার

দৌড়ে পালাতে গেলে জানোয়ারটাকে প্ররোচনা দেওয়া হবে এবং কিছুটা দৌড়েই সে আমাকে ধরে ফেলবে।

তাই এখন একটা মাত্র উপায় আছে, যদিও তাতে সফল হওয়ার আশা খুব কম। কিন্তু আমি সেটাই গ্রহণ করলাম। জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লক্ষ্য ঠিক করে নিয়ে হাতীটার ঠিক মাথার ওপর দিয়ে এক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ে ফাঁকা আওয়াজ করলাম। আমার ধারণা, এতে যদি আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তাহলে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য পরবর্তী গুলিটা সরাসরি হাতীর দেহেই করতে হবে।

কিন্তু দেখা গেল প্রথমবারেই ফল পাওয়া গেল। বিরাটদেহী জন্তুটা অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং হাতীটার চারটি পা মাটিতে ঢুকে গেল। যে মুহূর্তে জানোয়ারটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে অমনি ধূলো ও মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো পাতা উড়ে চারিদিকে কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি হল। বুঝলাম, সে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করলাম। দৌড়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয়বার ফাঁকা আওয়াজ করলাম।

প্রকাণ্ড জন্তুটা এবার প্রচণ্ডভাবে ডেকে উঠল। কিন্তু তার ডাকে রাগের লক্ষণ নেই। রীতিমতো ভয়ে হেলতে দুলতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তার লেজটা চাবুক খাওয়া কুকুরের মত দুপায়ের ফাঁকে ঝুলে পড়ল। তার পালিয়ে যাবার শব্দ মিলিয়ে যেতে আমি হতাশ হয়ে সামনের একটা পাথরের ওপর বসে পড়লাম।

তবে হাতীটার গায়ে গুলি করতে হল না বলে আমি মনে মনে বেশ উৎফুল্লই হলাম। কিন্তু হাতীটা চলে যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা না করে বরং এগিয়ে গিয়ে তাকে আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেছিলাম বলে নিজের উপর বিরক্ত হলাম। আমার রাইফেলের গুলির শব্দ ঐ পাহাড়গুলোর গায়ে ধাক্কা লেগে ভীষণভাবে আওয়াজ তুলেছে। তাঁবু থেকে ফিরে এসেছি মাত্র আধ ঘণ্টা হল। যে মৃগপথ ধরে চলেছি আগের পরিকল্পনানুযায়ী এ পথ ধরে আরও দেড়ঘণ্টা খোঁজ চালিয়ে নদীর ধারে ফেরা ঠিক হবে কিনা চিন্তা করতে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত উঠে পড়ে পথটা ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম। আগামী মিনিট দশেক চিতাবাঘটার কাছ থেকে কোন বিপদ আসবার সম্ভাবনা কম। রাইফেলের গুলির শব্দে শুধু হাতীটা কেন, অন্যান্য জন্তু-জানোয়াররাও এখন

অনেক দূরে। আমি বাঁশের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তাড়াতাড়ি এগোতে লাগলাম। কাবেরী নদীর গর্ভদেশ থেকে জমির উচ্চতা যত বাড়ছিল বাঁশ বনের ঘনত্ব ততই পাতলা হয়ে আসছিল। হাটতে হাটতে আমি বাবুল, কোরাম আর বেঁটে তেঁতুলগাছের একটা জমিতে এসে পড়লাম। এখানে এসে দেখলাম যে, পথটা বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছে। পরিষ্কার বোঝা গেল, জমিটা হরিণদের প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্র।

এই সুন্দর বিচরণ ক্ষেত্রটি হরিণে পূর্ণ হওয়ায় এখানে চিতাটার দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। তাই আমি আবও দ্বিগুণ উৎসাহ ও চেষ্টা নিয়ে চিতাটার খোঁজ করতে লাগলাম।

কিছুটা এগিয়ে যেতেই ডান দিক থেকে পব পর কয়েকবার পাখির ডাকেব মতো শব্দ শুনতে পেলাম। ক্রমশঃ সেটা জোরালো হয়ে উঠলো। আরে এ যে বুনো কুকুর! কুকুরগুলো শিকারের পেছন পেছন তাড়া কবে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। আমি তাডাতাডি কাছাকাছি একটা তেতুল গাছের মোটা গুড়ির আড়ালে দাঁডালাম।

শিকারী জানোয়ারের মধ্যে ভারতেব এই বুনো কুকুররা সবচেয়ে বেশী চালাক এবং যে কোন জীবিত প্রাণীর সে অবশ্যাম্ভাবী শত্রু। এই বুনো কুকুরের দল যদি কোন হরিণকে আক্রমণ কবে তাহলে তার মৃত্যু অবধারিত। আসলে এরা সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় দয়ামায়া শূন্য হয়ে তাকে হত্যা করবে। এই দলের প্রধান অংশটা পাখির তীব্র ডাকের মত এক রকমের শিকারধ্বনি তুলতে তুলতে শিকারকে অনুসরণ করে চলে। আমি একবার একটা সম্বরকে বুনো কুকুরের দল দ্বারা আক্রান্ত হযে একটা শুকনো নদী পার হয়ে যেতে দেখেছিলাম। সম্বরটার নাড়ীভুড়ি তার বেশ কয়েকগজ পেছন পর্যন্ত বালিতে লুটোতে লুটোতে যাচ্ছিল, তার চোখ দুটো কামড়িয়ে তুলে নেওয়া হয়েছিল এবং কুকুরগুলো তাব গলা গা কামড়ে ধরে ঝুলছিল।

হঠাৎ গাছপালার সঙ্গে শিং-এর আঘাতের শব্দ কানে এল। মুহূর্তে আমার সামনে এসে হাজির হল একটা সুন্দর পুরুষ সম্বর। সম্বরটা দিশেহারা হয়ে দৌড়িয়ে পালাচ্ছিল। তার মুখের থেকে ফেনা ঝড়ে পড়ছিল। চোখ দুটো যেন ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে প্রচণ্ড হুঙ্কারে প্রায় শূন্য দিয়ে এসে একটা ডোরাকাটা শক্তিশালী দেহ সোজাসুজি সম্বরটার ওপর ঝাপিয়ে পড়ল।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। একটা বাঘ আহার খুঁজতে এই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছিল। এমন সময় সে কুকুরগুলোর আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল এবং বুঝতে পেরেছিল ওদের তাড়ানো শিকার তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

সাধারণতঃ বহু কুকুর একসঙ্গে থাকে বলে এবং তাদের প্রচণ্ড সাহস ও বুদ্ধির জন্য বাঘ তাদের এড়িয়ে চলে। দৈবক্রমে বুনো কুকুরগুলো সম্বরটাকে বাঘটার দিকেই তাড়িয়ে আনছিল। এ সুযোগ না দেখা দিলে এখানেও হয়তো বাঘটা কুকুরগুলোকে এড়িয়ে যেতে চাইতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কি করা যায় পুরোপুরি বোঝার আগেই বাঘটা চূড়ান্ত কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলে।

আর এই কারণেই বাঘটা টের পায় নি যে আমি তাকে পেছন দিক থেকে অনুসরণ করছি। সে কুকুরগুলির ডাক শুনে এতই আশান্বিত হয়ে উঠেছিল যে আমার একটু আধটু নড়াচড়ার শব্দ সে বুঝতে পারে নি।

বাঘটা হঠাৎ গিয়ে সম্বরটার ঘাড়ের ওপর পড়ল। ফলে সম্বরটা শুয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ স্বরে ভয় মেশানো কণ্ঠে ডাকতে লাগল। সেইসঙ্গে তারা ধস্তাধস্তি করতে করতে ঝোপের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। পরমুহূর্তে এই দৃশ্যের মধ্যে ক্রুদ্ধভাবে ডাকতে ডাকতে এসে হাজির হল শিকার সন্ধানে ছুটে আসা বুনো কুকুরগুলো।

আমি যেখানে লুকিয়েছিলাম সেখান থেকে বাঘটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কেবল বাঘটা সবেমাত্র শিকার করা সম্বরটাকে আঁকড়িয়ে ধরে কুকুর-গুলোকে তাড়ানোর জন্য যে হুঙ্কার ছাড়ছিল সেই ভয়ঙ্কর গর্জন শুনতে পেলাম। তাদের গর্জন ও ডাকা-ডাকিতে গোটা অরণ্য যেন কেঁপে উঠল।

কুকুরগুলো কিন্তু দমল না। তারা প্রথমে তাদের শিকারকে অন্যের আয়ত্তে দেখে অবাক হয়ে গেল। তবে মুহূর্তের মধ্যে সেই ভাবটা কাটিয়ে উঠে দলবদ্ধ হয়ে বাঘটাকে আর তাদের প্রাপ্য শিকারকে ঘিরে ধরল। আমি গুণে দেখলাম কুকুরের সংখ্যা নয়।

কুকুরগুলো তাদের স্বরের পরিবর্তন করে এবার একটানা সুরে বিলাপধ্বনি তুলতে আরম্ভ করলো। আমার মনে পড়ে গেল, চামলা উপত্যকার অদূরে জঙ্গলে একবার আমি বুনো কুকুরের এই রকম ডাক শুনেছিলাম।

ভয় পেয়েছে এমন কায়দায় বাঘটা দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সে একবার দেহটা ঘুরিয়ে দেখে নিল কতগুলো শত্রু তাকে ঘিরে ধরেছে। সে বিরাট বড় হাঁ করে গলার পেশীগুলোকে সঙ্কুচিত

করে ভীষণ তর্জন গর্জন করতে লাগল। সে তার লেজটা ইতস্তত: এমনভাবে ঘোরাতে লাগল যে তা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল, তার মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনা, হিংস্রতা, নিজের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

ক্রমে কুকুরগুলো গায়ে ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে গোলটাকে ছোট করে দিল এবং সাহায্যের জন্য ন'টা কুকুর একসঙ্গে উচ্চস্বরে ডাকতে থাকলো। তাদের সমষ্টিগত কণ্ঠস্বরে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হল। বনময় সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াতে লাগল।

বাঘটা ভাবলো, এখন যত সময় নষ্ট করবে ততই কুকুরগুলো সুযোগ পেয়ে যাবে। তাই সে অপেক্ষা না করে সামনের কুকুরটাকে প্রথমে আক্রমণ করলো। সামনের কুকুরটা একটু লাফিয়ে সরে গেল আর অন্যান্য কুকুরগুলো বাঘটাকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবে বলে এগিয়ে এল। বাঘটা তা বুঝতে পেরে দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ডাইনে বাঁয়ে সামনের থাবা দুটো ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘুরতে লাগল।

সেই শক্তিশালী থাবার আওতার মধ্যে যে সমস্ত কুকুরগুলো পড়লো তারা কিছুটা দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা কুকুর সরে যেতে সময় নিল। বাঘ তার ধারালো নখগুলো দিয়ে কুকুরটার পিছন দিকটা আঁচড়িয়ে দিয়ে কুকুরটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। কুকুরটার একটা পা দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেল। আর পিছনের কুকুরগুলো বাঘের দেহ থেকে মাংস খুবলে নেবে বলে লাফিয়ে এগিয়ে এল।

বাঘটা আবার পাক খেয়ে ঘুরে গেল এবং যে কুকুরগুলো তার আবার সামনে পড়ল তারা এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল। শেষকালে বাঘের পেছনে ও পাশের দিকে যে কুকুরগুলো থেকে গেল তারা বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এগিয়ে এল।

বাঘটা ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ পিছনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। পিছনের যে কুকুরগুলো এগিয়ে এসেছিল তারা আর সরে যেতে পারল না। বাঘের বিশাল বিস্তৃত ও শক্তিশালী থাবার সম্পূর্ণ আঘাত গিয়ে ঐ কুকুরগুলোর গায়ে লাগল। বাঘটা মাটিতে দু'বার থাবা ছুঁড়তেই দুটো কুকুরের দেহ একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তার মধ্যে একটা কুকুর ছেচড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। বাঘটা এক লাফে গিয়ে নাড়ীভুড়ি বেরিয়ে যাওয়া সেই কুকুরটার উপর পড়ে মাংসের মধ্যে থাবা ঢুকিয়ে দিল। এটাই হয়েছিল

বাঘটার কাল। ফলে পেছনের এবং পাশের কুকুরগুলো বাঘটাকে ঘিরে ধরার সুযোগ পেল। সেইসঙ্গে তারা বাঘটার দেহ থেকে টুকরো টুকরো মাংস ছিঁড়ে আনতে লাগল। বাঘটা ভয়ার্ত গর্জন করে উঠলো।

মুহূর্তের জন্য কুকুরগুলো আক্রমণ থেকে বিরত হল এবং বাঘটাও নিস্তার পেল। বাঘটার ক্ষত থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে শ্বাস নিচ্ছিল।

নিমেষের মধ্যে অশান্ত কুকুরগুলো নতুন করে আক্রমণ করলো। বাঘটা আবার গজরাতে লাগল, কিন্তু তার ডাক কুকুরগুলোর ডাকের চেয়ে অনেক ক্ষীণ। বোঝা গেল, বাঘটার আর লড়াই করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, সে নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছিল।

ঠিক এই সময় নতুন ডাক কানে এসে পৌছল। অনেক দূর থেকে বুনো কুকুরের দল সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে একসঙ্গে এগিয়ে আসছে।

বাঘটাও সে ডাক শুনতে পেল। মুহূর্তের মধ্যে তার বাকি লড়াইয়ের স্পৃহা উড়ে গেল। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বাঘটা পালিয়ে গেল। আহত ও ক্লান্ত কুকুরগুলো তাকে অনুসরণ করলো।

অল্প সময়ের মধ্যেই দলভারী করার জন্য নতুন কুকুর এসে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হল। তারা কিছুক্ষণ থেমে পড়ে থাকা রক্ত এবং তিনটে কুকুরের দেহের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন টুকুরোগুলো শুঁকে রাগে উন্মাদ হয়ে উঠল। গর্জন করতে লাগল। তারপর তারা, বাঘটা এবং তাকে পশ্চাৎ অনুসরণ করে ছ'টা কুকুর যেদিকে গেছে সেদিকে দৌড়ে চলে গেল।

আবার একদল কুকুর এসে হাজির হল সেই স্থানে এবং ঐ পাঁচটা কুকুর যেদিকে গেছে সেদিকে ছুটে গেল। বাঘটার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। কারণ, এতক্ষণে দু'ডজন কুকুর তার পিছু নিয়েছে। বাঘটাকে টুকরো টুকরো না করে ফেলা পর্যন্ত তারা তার পেছন ছাড়বে না।

বাঘটার গর্জন ধ্বনি দূরে মিলিয়ে যেতেই আমি ঘটনাস্থল ও মৃত কুকুর তিনটেকে দেখার জন্য তেঁতুল গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। মৃত সম্বরটা কিছুটা দূরে পড়ে আছে। এটা নিঃসন্দেহ, বাঘটাকে মেরে যে কুকুরগুলো বেঁচে থাকবে তারা এখানে ফিরে এসে ভোজনে মত্ত হবে।

আমি তাঁবুতে ফিরে এলাম। টিনি আমার আগেই ফিরেছিল এবং একটু

পরেই মেরওয়ান এসে হাজির হল। ডোনাল্ড এল সবার শেষে এবং অনেক দেরীতে। তারা কেউই বিশেষ ধরনের কিছু দেখতে পায় নি। কেবল ডোনাল্ড একটা চিতাবাঘের পায়ের দাগ দেখতে পায় এবং তার খানিকটা দূরেই একটা গুহা তার চোখে পড়ে। গুহাটার সঙ্গে চিতাটার সম্পর্ক আছে মনে করে সে গুহাটার ভেতর পাথর ছোঁড়ে, তার মনে হয়েছিল এবং আশাও হয়েছিল যে পাথর ছোঁড়ার ফলে গুহার ভেতর থেকে চিতাটা বেরিয়ে আসবে। কিন্তু চিতার বদলে গুহার ভেতর থেকে দুটো বাচ্চা কাঁধে করে বেরিয়ে এল একটা ভালুক। সে বেশ বিরক্ত হয়েছিল। 'ভালুকটা যদি ডোনাল্ডকে দেখতে পেত তাহলে আত্মরক্ষা করার জন্য তাকে গুলি করতে হত। কিন্তু তার প্রয়োজন হয় নি। ভালুকটা দিশেহারা হয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর আর কিছুই ঘটে নি। কোন চিতাবাঘ কোন ভালুক পরিবারের সঙ্গে একই গুহাতে বাস করতে পারে না জেনে ডোনাল্ড সেই স্থান ত্যাগ করে চলে আসে।

তারা আমার মুখে বাঘ ও বুনো হিংস্র কুকুরগুলোর সংগ্রাম কাহিনী গভীর মনোযোগ সহকারে শুনলো।

আমরা ক্যাম্পফায়ারের সামনে বসে সমস্ত পরিকল্পনা ঠিক করে নিলাম। প্রত্যেকে একে একে পাহারা দেবে। তাই তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার পর্ব চুকিয়ে দেওয়া হল। তারপর ধূমপান করতে করতে গল্প গুজব করতে লাগলাম। স্থির হল, প্রথমে থাঙ্গাভেলু পাহারা দেবে দু' ঘণ্টা, তারপর মেরওয়ান, আমি, ডোনাল্ড ও টিনি পাহারা দেব।

কিছুক্ষণ পরে দিনের বেলায় আমি যে পাহাড়টাতে গিয়েছিলাম সেই পাহাড়টারই কোন জায়গায় একটা বাঘ ডাকতে আরম্ভ করল। আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছি। আমার ধারণা, বুনো কুকুরগুলো যে বাঘটাকে নিঃসন্দেহে হত্যা করেছিল এ বাঘটা নিশ্চয়ই তার সঙ্গিনী।

রাত এগারোটার সময় থাঙ্গাভেলু মেরওয়ানকে ঘুম থেকে ডাকতে এল, কিন্তু মেরওয়ান উঠতে চাইল না। ফলে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হল। আমার ঘুম গেল ভেঙ্গে। আমি থাঙ্গাভেলুকে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে বললাম মেরওয়ানের গায়ে। কিন্তু থাঙ্গাভেলু ইতস্ততঃ করতে লাগল। যতই হোক সে আমাদের চাকর। তাই বাধ্য হয়ে আমাকেই মেরওয়ানের গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে হল। মেরওয়ান সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে উঠে পড়ল।

কিন্তু খুব বিরক্ত হল। তবে সে এর প্রতিশোধ নিয়েছিল। সেও রাত্রি একটার সময় আমাকে ডাকবার সময় গায়ে ঠাণ্ডা জল ফেলে দিয়েছিল মেরওয়ান লোকটার স্বভাবই এই রকম।

সে জানাল যে, রাত্রি বারোটা বেজে কয়েক মিনিট পরেই একটা চিতাকে ডাকাডাকি করতে শুনেছে এবং তার ধারণা, সেটা আমাদের পেছনের পাহাড়টার উপরেই রয়েছে। এরপর সে আমাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর দিল। আমাকে জাগিয়ে দেবার কয়েক মিনিট আগে একটা জংলী মোরগ ভয়ার্ত স্বরে ডেকে উঠে প্রচণ্ড জোরে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মিলিয়ে গেছে। এ ঘটনাটা বেশ কাছাকাছিই ঘটেছে। মেরওয়ানের মনে হয়েছিল, ঘটনাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই সে জানাতে চাইছিল না।

আমি তার কথার আর কোন জবাব দিলাম না। মেরওয়ান নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমি কিন্তু ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলাম। ভয়ার্ত বুনো মোরগটা কি কারণে তার পুরোনো আশ্রয় ছেড়ে নতুন আশ্রয় খুঁজে নেবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল? বিপদ খুব কাছে না এলে বুনো মোরগ এরকম করে না। সেটা কোন খাদ্য অন্বেষণকারী ময়াল সাপ হতে পারে। আবার একটা বনবিড়াল বা বৃক্ষবাসী গন্ধ-গোকুলও হতে পারে। এমনকি একটা চিতাও হতে পারে।

আমি গভীরভাবে ভাবতে লাগলাম। যতই চিন্তা করতে লাগলাম ততই যেন মনে হতে লাগল আমরা যে চিতাটার খোঁজ করছি এ জানোয়ারটা সেটাই। মনে হতে লাগল, তাকে তাকে থেকে আমাদের এক বা একাধিক জনকে মেরে ফেলার মতলব নিয়ে জানোয়ারটা তাঁবুর কাছে এসেছে। যাতে আলো আরও বেশী হয় এবং আশপাশ দেখা যায় সেজন্য আগুনে আর একটা কাঠ দিয়ে দিলাম। তারপর আমি জায়গা বদলে বসলাম। কাছেই একটা মথি গাছ ছিল, সেটাতেই ঠেস দিলাম। ফলে জঙ্গলটা আমার সামনেই পড়ল। আর আমার সঙ্গী সাথীরা থাকল আমার একটু দূরে খানিকটা ডান পাশে।

এইভাবে বসার মানে হল, আমার পিছন দিক থেকে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা রইল না। আমি এবার চারিদিকে চোখের সতর্ক দৃষ্টি ফেলতে পারব। এবং কান সজাগ রেখে ভালোভাবে আরামও করতে পারবো।

রাত দুটো পর্যন্ত একই ভাবে বসে রইলাম। কিছুই চোখে পড়ল না বা

সেরকম কিছু ঘটল না। নদী পাথরের ওপর আছাড় খেতে খেতে কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেছে। ফলে জঙ্গলের মৃদুতর কোন শব্দই আমার কানে আসছিল না। জলের মধ্যে একটা মাছ লাফিয়ে উঠল এরপর আরও জোরালো একটা শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হল কোন বিরাট ধরনের মাছ বা কুমীর টুমীর হবে। সারা আকাশ তারায় জলজ্বল করছে। আকাশ-পটে হঠাৎ একটা কালো ছায়ার মত পদার্থ দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেখলাম ওটা একটা বৃহৎ জাতের ঝুঁটিওয়ালা পেঁচা। এই পেঁচা শুধু জঙ্গলেই দেখতে পাওয়া যায়। এরা ছোট ছোট স্তন্যপায়ী জীব ধরে খায়। খরগোসও এদের খাদ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

ঠিক সেই সময় আমার কানে একটা ক্ষীণ শ্বাসটানার শব্দ এল। নদীর জলের প্রচণ্ড আওয়াজে আমি এই শব্দটাকে আলাদা ভাবে ধরতে পারছিলাম না। এবার শব্দটা বেশ বুঝতে পারলাম। এবং আমার সঙ্গীরা যেখানে ঘুমিয়ে আছে সেখান থেকে কিছুটা দূরেই ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে শব্দটা আসছে। ওখানকার জঙ্গলের ঘনত্ব এত বেশী যে চারিদিকটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমি এ শব্দ এর আগেও শুনেছি, বুঝতেও পারলাম এটা কিসের শব্দ।

নিঃসন্দেহ হলাম যে, চিতাটা ঐ ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে। আর আমার সঙ্গীরা যেখানে শুয়ে আছে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরী হচ্ছে।

আমি অবশ্য চিতাটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কারণ, চারপাশে ঘন অন্ধকার। মনে মনে ভাবছি কি করি। যদি ঐ অন্ধকারের মধ্যে টর্চের আলো ফেলি আর চিতাটা যদি ঝোপের আড়ালে থাকে তবেই তাকে দেখতে পাবো। আর সে যদি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে তাহলে তাকে দেখতে পাব না। বরং উল্টে তখন টর্চের আলো দেখে জন্তুটা পালিয়ে যাবে। সুতরাং আমি আর একটু অপেক্ষা করবো ঠিক করলাম।

কিন্তু হিংস্র চিতাটার আর ধৈর্য রইল না। সে আক্রমণ করার জন্য সামনে এগিয়ে আসতে লাগল। আক্রমণ করবার সময় ঐরকম জানোয়ার যেভাবে জোরে গর্জন করে উঠে সেই রকম গর্জন করে চিতাটা একলাফে ঝোপের ভেতর থেকে ঘুমন্ত মানুষগুলোর কয়েক ফুট দূরে এসে পড়ল। পরবর্তী লাফে সে নিশ্চিতভাবেই ওদের ওপর এসে পড়বে।

আমি এইটাই চাইছিলাম। আমার ভাগ্য ভাল যে, রাইফেলটা কাঁধেই

সেট করা ছিল আর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল রাইফেলের গায়ে টর্চের বোতামে স্থির ছিল।

ছুরির ফলার মত আমার টর্চের আলো অন্ধকারকে ভেদ করে চিতাটার জ্বলন্ত চোখ দুটোকে আলোকিত করে দিল। হঠাৎ আলো পড়ে চিতাটার চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় সে একটু ইতস্তত: করতে লাগল। আমিও সুযোগ বুঝে রাইফেলের ট্রিগারে দিলাম চাপ।

চারিদিক কাঁপিয়ে হঠাৎ একটা গুলি ছোড়ার শব্দ হল, খানিক পরেই দ্বিতীয়বার গুলি ছোঁড়ার শব্দ।

"বাবা, ওটাকে গুলি করুন, গুলি করুন"—বলে ডোনাল্ড চেঁচাতে চেঁচাতে লাফিয়ে উঠল।

বুঝলাম গোড়াতেই ডোনাল্ডের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এবং শুয়ে থাকতে থাকতে সে-ই গুলি দুটো ছুঁড়েছে।

গুলির শব্দে সকলের ঘুম গেল ভেঙ্গে। তাদের হতবুদ্ধিকর অবস্থা সত্যিই হাস্যকর! খান্নাভেলু শুধু চেঁচিয়ে উঠল। টিনি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বসল এবং আধবোজা চোখে বলে উঠল "মাগো"! মেবওয়ান তাদের থেকেও বেশী করল। সে লুটোপুটি খেতে লাগল যেন তার নিজের গায়েই গুলির আঘাত লেগেছে।

এরপর তারা মৃত চিতাটাকে দেখতে পেল। মৃত না বলে অর্ধমৃত বলাই ঠিক। কারণ চিতাটা তখন খাবি খাচ্ছিল এবং নড়াচড়া করছিল। আমি তার চোখের ওপর টর্চের আলো জ্বেলে দেখলাম, তার মৃত্যু এগিয়ে আসছে। এরপর একসময়ে তার দেহ নিশ্চল হয়ে গেল। চোখ দুটো নীল হয়ে গেল। বুঝলাম এবার সে মারা গেছে।

আমরা দল বেঁধে চিতাটার কাছে গিয়ে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলাম। দেখলাম এটা একটা সুন্দর স্ত্রী চিতা। সত্যি কথা বলতে কি, আমি এই কৃতিত্বের জন্য কোন আনন্দ অনুভব করলাম না। চিতাটা সম্পর্কে গল্প শোনার পর তাকে মারবার জন্য আমি যেভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম তার জন্য অনুতপ্ত হলাম। যা হবার তা হয়ে গেছে—এই বলে মনকে সান্ত্বনা দিলাম। এবং আমার চিন্তার গতি ঐখানেই থামিয়ে দিলাম। সবশেষে ডোনাল্ডের এই কৃতিত্বের জন্য তাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম।

সপ্তম অধ্যায়

শের খান ও বেট্রামুগলমের মানুষখেকো

অনেক দিন আগের কথা। একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ প্রশাসক, যিনি সে-যুগে কালেক্টর হিসেবেই পরিচিত ছিলেন, সালেম জেলার গুথেরিয়ান পর্বত-মালার উত্তরে তিনশ' একর অরণ্যসংকুল জমি কিনেছিলেন। আর সেখানে তিনি তৈরী করেছিলেন অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর একটি বাংলো। সম্পূর্ণ পাথর দিয়ে দুর্গের ঢঙে বাড়িটি তৈরী করেছিলেন।

ভদ্রলোক যথার্থই অরণ্যপ্রেমিক ছিলেন। আর তাই প্রচুর অর্থ ব্যয়ে তিনি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। সেইসময় কাঁটা ঝোপ ও ল্যাণ্টানা গাছ সবেমাত্র দক্ষিণ ভারতের জঙ্গলগুলোতে মাথা তুলতে শুরু করেছে। তিনি জমি থেকে এইসব গাছ তুলে ফেলার জন্য একদল কুলী নিযুক্ত করেছিলেন।

সেই আমল থেকে একটানা বাড়তে বাড়তে এখন ল্যাণ্টানা গাছ গোটা দক্ষিণ ভারতের জঙ্গলকে ছেয়ে ফেলেছে। বহু সংরক্ষিত বনাঞ্চলও ঢেকে গেছে এইসব আগাছায়। বনবিভাগ সমেত সরকার বিভিন্ন সময়ে এইসব আগাছাগুলোকে ধ্বংস করার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেছেন এবং এখনও করছেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, ল্যাণ্টানার সতেজ পাতা থেঁতলে সেই রস চামড়ার গায়ে আঁচড়ে যাওয়া জায়গায় কিংবা ঘায়ের উপর দিলে তা সম্পূর্ণভাবে ভালো হয়ে যায়। ল্যাণ্টানার পাতার রস টিংচার আয়োডিনের মতোই কাজ করে। আর এতে কোনরকম জ্বালা হয় না।

এবার আমরা ঐ ব্রিটিশ কালেক্টর ভদ্রলোক ও তার তিনশ' একর জমির গল্পে ফিরে আসি।

স্থানীয় উপত্যকার নাম অনুসারে ভদ্রলোক তাঁর এলাকাটার নাম দিয়েছিলেন "বেট্রামুগলম এস্টেট"। আর তার পাথরে তৈরী বাড়িটির নাম দিয়েছিলেন "জংলী দুর্গ"। সর্বগ্রাসী ল্যাণ্টানার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে

সেই তিনশ' একর জমিতে অরণ্য স্বাভাবিক ভাবেই দ্রুত বেড়ে উঠল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দ্রুত গজিয়ে ওঠা ঘাসের টানে বাইসন ও হরিণ এসে ভিড় জমালো সেখানে। এদিকে হরিণ আব বাইসনের লোভে তাদের পিছন পিছন এলো বাঘ, চিতাবাঘ ও এদের চেয়েও হিংস্র বন্য কুকুরের দল।

তারপর ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবতন ঘটতে লাগলো। ব্রিটিশ কালেক্টর ভদ্রলোক মারা গেলেন। একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জংলী দুর্গ সমেত গোটা যশডিটা কিনে নিলেন। কিন্তু এই ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। আগের মালিকের মতো উন্নতমানের অবস্থা বজায় রেখে তাঁর পক্ষে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষন করা সম্ভব হলো না। ফলে আবার সেই ল্যাণ্টানা গাছের দল মাথা তুললো। এর ফলে বাইসন আর হরিণের সংখ্যা দিনে দিনে কমে আসতে লাগলো। কিন্তু মাংসাশী হিংস্র পশুর দল আগের মতোই রয়ে গেল। তবে হরিণ আর বাইসনেব সংখ্যা কমে যেতে তাদের খাবারে পড়লো টান।

এদিকে, অল্প কিছুদিন পরে সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকও মারা গেলেন। কিন্তু তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজন সম্পত্তিটি দাবী করলেন না। ফলে জংলী দুর্গ পরিত্যক্ত অবস্থায় ভাঙতে শুরু করলো। গ্রামের লোকেরা বাড়িটির গ্রানাইট পাথরগুলো খুলে খুলে নিয়ে গেলেন।

এদিকে একসময় বাইসন ও হরিণ জঙ্গল থেকে একরকম শেষ হয়ে গেল। যে সব বাঘ, চিতাবাঘ ও বুনো কুকুর হরিণের মাংসের লোভে এসে জুটেছিল তারাও হারিয়ে গেল। শুধু রইলো বিভিন্ন জাতের বুনো মুরগী। কেননা, এদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ঐ ল্যাণ্টানা ঝোপটা বেশ ভালোই ছিল। গোটা এলাকাটাই মনে হতে লাগল প্রাণী বিবর্জিত। মাঝে মধ্যে দু'একটা বাঘ কিংবা চিতা ক্ষুধা নিবৃত্তির আশায় শিকার করতে এই বনে ইতস্তত ঘুরে যেতো। কিন্তু তাদের ক্ষুধা মিটতো না।

আয়ুর নামে একটা গ্রাম আছে এখান থেকে চার মাইল দূরে। সেই গ্রামে গুরাপ্পা নামে এক পঁচিশ বছরের যুবক ছিল। গুরাপ্পা তার জাতের নিয়ম ও নিজের অবস্থার তুলনায় একটু বেশী বয়সেই বিয়ে করেছিল। তাদের সমাজে ছেলেদের বেশীর ভাগেরই সতেরো থেকে আঠারো বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু গুরাপ্পাদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। বেশীর ভাগ পাত্রীর বাবা-মা একজন ভবঘুরে তার উপর আর্থিক অবস্থা ভালো নয়,

এমন লোকের সঙ্গে তাদের মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী নয়। তাই শত চেষ্টা করে গুরাপ্পার বাবা অল্প বয়সে তার বিয়ে দিতে পারেন নি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একটি মেয়ে গুরাপ্পার কপালে জুটেছে। মেয়েটা কানে একটু কম শোনে এবং খুব ছোটবেলা থেকেই একটু খুঁড়িয়ে চলে। মনে হয়, এ সব খুঁত থাকার জন্য মেয়ের বাবা-মা গুরাপ্পার মতো লোকের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হয়েছিলেন।

বিয়ের আগেই গুরাপ্পা একটা বাড়ি তৈরী করবে বলে ঠিক করল। কিন্তু তার কোন টাকা-পয়সা ছিল না। তবে তার ভাগ্য ভালো বলতে হবে। কেননা, তখন পর্যন্ত সেই জংলী দুর্গে কিছু দামী পাথর পড়েছিল। অবশ্য বড় ও মূল্যবান পাথরগুলো আগেই চুরি হয়ে গিয়েছিল।

গুরাপ্পা সেই পাথরগুলো চুরি করে আনার জন্য চাঁদনী রাতের অপেক্ষা না করেই গ্রামের মোড়লের কাছে গরুর গাড়িটা ধার চাইল। শর্ত একটাই, পরিবর্তে ফসল কাটার সময়ে গুরাপ্পা বিনা পয়সায় কয়েকদিন খেটে দেবে।

কেউ যখন কোন অপকর্ম করবে বলে ঠিক করে তখন তার পক্ষে কোন সঙ্গী না রাখাই শ্রেয়। গুরাপ্পা তাই দুপুরের খাওয়া তাড়াতাড়ি শেষ করে একাই যাত্রা করল। মনে করেছিল, যত তাড়াতাড়ি সে রওনা হবে তত বেলা থাকতে থাকতে সে ফিরে আসতে পারবে। সঙ্গে করে সে একটি শাবল নিয়েছিল। সেটা দিয়ে সে একটা একটা করে পাথর খসিয়ে গরুর গাড়িতে তুলতে লাগলো। এতে অবশ্য তার পরিশ্রমও হচ্ছিল এবং সময়ও লাগছিল যথেষ্ট। ফলে বারবার তাকে বিশ্রাম করতে হচ্ছিল।

এদিকে বেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে খানিক আগেই। নাইট্‌জার পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। গুরাপ্পা স্থির করলো, আজই সে গাড়িভর্তি পাথর নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। কাল আবার অন্য কারোর গাড়ি ধার করে এনে আরও কিছু পাথর নিয়ে যাবে।

তাই আর দেরী না করে সে ভাঙ্গা বাঁশের ডাণ্ডা দিয়ে রোগা হাড়-বের-করা বলদগুলোকে পিটতে লাগলো। বলদগুলোর তখন চলবার ইচ্ছে একদম নেই। কিন্তু মারের ভয়ে তারা গাড়ি টেনে চলতে শুরু করলো। গুরাপ্পা পিছন পিছন চলতে লাগলো। তখনও পর্যন্ত কোন বিপজ্জনক শব্দ সে শোনে নি। তবে যে বাঘটা গুঁড়ি মেরে পথে গুরাপ্পাকে লক্ষ্য করছিল সেই বাঘটার উপবাসে দিন কাটাবার মতো যদিও ছিল না, তবে সে যে দারুণ ক্ষুধার্ত ছিল সে

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সম্ভবত বাঘটা অসুস্থ বা আহত ছিল তাই স্বাভাবিক শিকার সংগ্রহে সে অপারগ হয়ে পড়েছিল। তবে সে পাকা মানুষখেকো ছিল না। কারণ, বহুদিন ধরে এ অঞ্চলে বাঘের হাতে কোন মানুষ মারা পড়ে নি।

বলদগুলো গাড়িটা টানতে টানতে একটা বাবুল গাছের পাশ দিয়ে চলে গেল। গাছটার নীচের দিকের অংশটা ল্যান্টানার ঝোপে রীতিমতো ঢাকা। বাঘটা ঐ ঝোপের মধ্যেই লুকিয়েছিল। কারণ, সেখান থেকেই সে গুরাপ্পার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

ঘটনা ঘটার চব্বিশ ঘণ্টা পর বনবিভাগের একজন রেঞ্জ অফিসার ও কয়েক-জন পাহারাদার সহ ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছুলাম। সঙ্গে আমাদের পুলিসের একজন সাব ইনস্পেক্টর ও একজন কনস্টেবলও ছিল। সেখানে গিয়ে দেখি, ল্যান্টানার ঝোপটা কাত হয়ে রয়েছে। বোঝা গেলো, বাঘটা ঐ ঝোপটাতেই বসে থেকে গুরাপ্পার জন্য অপেক্ষা করছিল।

প্রথমে গুরাপ্পা বুঝতেই পারে নি কি ঘটতে চলেছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে বুঝতে পারে যে, বাঘে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তখন সে অবশ্যই হুড়োহুড়ি ও চেঁচামেচি করেছিল। আর চেচামেচি শুনেই পাথর বোঝাই গাড়িটা নিয়ে বলদদুটো ছুট লাগিয়েছিল। অনেকটা দূরে রাস্তায় একটা বাঁক ছিল। সেখানটা পার হবার সময়ই গাড়িটা বলদগুলোকে নিয়ে খাদে উল্টে যায়।

তবে খাদে পড়ে গাড়িটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও বলদ দুটোর কিন্তু কিছুই হয় নি। তারা হাটতে হাটতে আয়ুর গ্রামে ফিরে গেল।

গ্রামের মোড়ল বলদদুটোকে খালি ফিরতে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন যে, হাতীতে আক্রমণ করে সম্ভবতঃ গাড়িটা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে। আর এর ফলে গুরাপ্পার কপালে কি জুটেছে তা তিনি অনুমান করে নিলেন। গ্রামের মোড়ল তখন বেশ কিছু লোক নিয়ে বনবিভাগের রেঞ্জ অফিসারের কাছে গেলেন এবং সবিস্তারে সব ঘটনা জানিয়ে সাহায্যের প্রার্থনা জানালেন। রেঞ্জ অফিসার সঙ্গে সঙ্গেই অনুসন্ধানী দল বের করবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু গ্রামের লোকদের মধ্যে এ ব্যাপারে তেমন উৎসাহ পাওয়া গেল না। কেউই জঙ্গলে যেতে রাজী নন। শেষ পর্যন্ত বহু পীড়াপীড়িতে পাঁচ-সাতজন লোক অনুসন্ধানের কাজে বেরুতে রাজী হলেন। তবে ততক্ষণে চারিদিক ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছে। এমন ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে অনুসন্ধান চালানো রীতিমতো

সাংঘাতিক ব্যাপার। তাই ঠিক হলো, আজ রাতের মতো অনুসন্ধান কাজ বন্ধ রইল।

পরের দিন সকালে অনুসন্ধানী দলটি জঙ্গল অভিমুখে রওনা হল। খাদের মধ্যে গাড়িটার ভাঙ্গা টুকরো খুঁজে পেতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হল না ঠিকই, কিন্তু গুরাপ্পার কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া গেল না। নরম বালির উপর গাড়ির চাকার ও বলদগুলোর পায়ের যে ছাপ পড়েছিল তা থেকে বোঝা গেল যে, বলদগুলো দৌড়তে দৌড়তে রাস্তার বাঁকটার কাছে গিয়েছিল এবং তাতেই গাড়িটা উল্টে গিয়ে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা কি জন্য এমন বেপরোয়া দৌড় দিয়েছিল?

গ্রামবাসীরা এটাকে হাতির দুষ্কর্ম ভেবে পিছিয়ে আসতে চাইল কিন্তু একটু পরেই আসল কারণটা তারা বুঝতে পারল। রাস্তায় তারা রক্তের দাগ, বাঘের পায়ের ছাপ আর শিকারের দেহটিকে হেঁচড়ে নিয়ে যাবার চিহ্ন দেখতে পেল। তখন তারা ভীষণ ভীত হয়ে পড়ল। মানুষ-খেকো বাঘ যে কোন মুহূর্তে যে কোন দিক থেকে আবির্ভাব ঘটিয়ে অতি দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে।

আর দেরী না করে দলটা আবার ফিরে গেল। গুরাপ্পা যখন মারা গেছে তখন আর খোঁজ করে লাভ কি?

আমি হঠাৎ সেদিন শিবানাপল্লীতে তাঁবু ফেলেছিলাম। জায়গাটা আয়ুরের পাঁচমাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বাঙ্গালোর থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে বলে এবং এই জায়গাটা আমার ভীষণ ভালো লাগে বলে আমি মাঝে মধ্যেই আসি।

শিবানাপল্লীতে বনবিভাগের যে রক্ষী ছিল সে তার ঊর্ধ্বতম অফিসার রেঞ্জ অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে আয়ুরে গিয়েছিল। দুপুরে সে ফিরে এসে হতভাগ্য গুরাপ্পার কপালে কি ঘটেছে তা জানাল। একটা টর্চ ও সোয়েটারটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে নিলাম কিছু বিস্কুট ও এক ফ্লাস্ক চা।

রেঞ্জ অফিসার এর মধ্যেই আধমাইল দূরের ছোট্ট শহর ডেঙ্কানিকোটায় অবস্থিত বনবিভাগের প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। ফলে আমি গিয়ে উপস্থিত হওয়ার একটু পরেই পুলিসের সাব-ইন্সপেক্টার পিছনের সীটে একজন কনস্টেবলকে বসিয়ে নিয়ে মোটর সাইকেলে সেখানে এসে হাজির হলেন। চোরাই পাথর ভর্তি গরুগাড়িটার পেছনে হতভাগ্য গুরাপ্পা হেঁটে যাবার সময়ে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আগে বাঘটা বাবুল গাছের নীচের দিকের যে

ল্যাণ্টানা ঝোপ থেকে তার ওপর লাফিয়ে পড়েছিল সেই ঝোপটার কাছে আমি আসবার সময়—এভাবেই দু'জন পুলিস অফিসার, রেঞ্জ অফিসারটি ও একদল পাহারাদার আমার সাথী হল।

ঘটনাটার প্রথম দিকটা আমি আগেই বলেছি। ঐ দু'জন অফিসার ও তাঁদের সহকারীদের সঙ্গে এখানে আসবার আগে আমার যে ছাড়া ছাড়া কথা হয়েছিল তা থেকে আমি ঘটনাটা বুঝতে পেরেছিলাম। পুলিসের সাব ইনস্পেক্টর ভদ্রলোক ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং স্পষ্টবাদী। অনেকদিন আগে মৃত ঐ বৃটিশ কালেক্টর যিনি বেট্টামুগলম এস্টেট ও জলীদুর্গের মালিক ছিলেন এবং এখনকার এই পাত্র গুরাপ্পা যার কোন ঘরবাড়ি ছিল না, যে একটা বাড়ি তৈরী করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, তাদের দুজনের ভাগ্যের মধ্যে যে জটিল যোগসূত্র বর্তমান ছিল একাধিক বার তিনি সেই কথা বলতে লাগলেন।

তিনি কোন সূত্রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন তা ধরতে না পেরে আমি ঠাট্টা করে বললাম যে মোটের উপর অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে ভাগ্যদেবতা তা উৎফুল্ল মনে নেন নি এবং যারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি নেবার ধান্দা করছে তাদের কাউকে তিনি শাস্তি দেওয়া স্থির করেছেন এরকম ভাবার যুক্তি থাকতে পারে। কথাটা আমি তামাশার ভঙ্গিতে বলেছিলাম, কিন্তু যেভাবে কথাটা নেওয়া হল তাতে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণটি ও ভীতু রেঞ্জ অফিসার আমার কথা ঠিক বলে গণ্য করলেন।

গুরাপ্পার মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ খুঁজে বার করবার ইচ্ছে কারোরই দেখা গেল না।

আমি আগেই বিবৃত করেছি শিকারের উপর আক্রমণ করার আগে বাঘটা ল্যাণ্টানা ঝোপের যে জায়গাটায় শুয়েছিল তা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। রাত্রিতে বালি, ঘাস আর পাতার ওপর দিয়ে শিকারকে হেঁচড়ে টানতে টানতে নিয়ে যাবার চিহ্ন বেশীর ভাগ দেখা না গেলেও কিছু কিছু আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছিল।

যাই হোক আমরা ঐ দাগ দেখে শতখানেক গজ এগোতে সমর্থ হলাম। তারপরই আমরা দিশেহারা হয়ে পড়লাম। এই জায়গাটায় একটা 'উড়োজাহাজ' গাছ ছিল। এই গাছগুলো অদ্ভুত কায়দায় এবং আশ্চর্যজনক উপায়ে বীজ ছড়িয়ে দেয় বলে স্থানীয় তামিল অধিবাসীদের মধ্যে গাছটার ঐ নামই প্রচলিত। দুটো তিন ইঞ্চি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পাতার মত ফলক। এর মাঝখানে একটা করে বীজ থাকে। ঐ ফলকগুলো ঠিক যেন উড়োজাহাজের

জোড়া প্রপেলারের ছোট্ট সংস্করণ। মূলগাছ থেকে আলাদা হয়ে বাজ সমেত ফলকগুলো বাতাসে চক্রাকারে ঘুরে যেতে যেতে উড়ে অবিশ্বাস্য রকমের দূরে চলে যায় এবং তারপর মাটিতে পড়ে। ঐ গাছটার গোড়ার ঘাসগুলো তখনও সবুজ ছিল। হঠাৎ দেখি সেই ঘাসের মধ্য থেকে একটা মানুষের হাত বেরিয়ে রয়েছে, হাতের পাঁচটা আঙুল ছড়ানো এবং ওপর দিকে মুখ করে রয়েছে। ঠিক যেন আমাদের ইশারা করে ডাকছে।

অবশেষে আমরা তাহলে গুরাপ্পার মৃতদেহের অবশিষ্টাংশের সন্ধান পেলাম।

খুব অবাক হওয়ার মত ঘটনা এই যে, বুক থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরের এই উপর ভাগ বাঘটা তখনও ছোঁয়নি। একখানা হাত উপরের দিকে ছড়ানো এবং অন্য হাতের আঙুলগুলো মুখের মধ্যে ঢোকানো। মনে হয় চিৎ করে চাপা দেওয়ার জন্য তা করা হয়েছে। লাল পিঁপড়ে এসে মুখ আর গায়ের চামড়া আচ্ছন্ন করে আছে। অনেক জায়গায় পিঁপড়েতে কালো গায়ের চামড়া খেয়ে ফেলতে পচা দেহের সাদা ও লাল মাংস বেরিয়ে পড়েছে। কেন যে হায়না বা শেয়াল এখনও এটা স্পর্শ করেনি তা পরিষ্কার বোঝা গেল। লাল পিঁপড়ের দুর্ধর্ষ স্বভাবের এবং যন্ত্রণাদায়ক হুল ফোটানোর কথা কারই বা না জানা।

মৃতদেহের নিম্নভাগের অতি অল্প অংশই পড়ে ছিল। বাঘটা পেটভরে খেয়েছিল, বাকী অংশটুকু রাত্রির উচ্ছিষ্টভোগী প্রাণীরা খেয়ে নিঃশেষ করেছিল।

বাঘ এবং অন্যান্য জীবেরা খেয়ে যাওয়ার পর মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ উড়োজাহাজ গাছের আড়ালে ছিল বলে শকুনের চোখকে আকর্ষণ করতে পারে নি। যদি টের পেত তাহলে আমরা পৌঁছানোর আগেই সব শেষ হয়ে যেত।

পচা মৃতদেহের দুর্গন্ধে বাতাস ভরপুর হয়েছিল। লাল পিঁপড়েগুলো আগেই তাদের কালো রঙের স্বজাতিদের বিতাড়িত করছিল। এখন ঐ লাল পিঁপড়েগুলোর ভয়ে মৃতদেহের ওপর খেতে না পেরে দলে দলে মাছি চারপাশের ঘাসের উপর দিয়ে ভনভন করে উড়ে বেড়াচ্ছিল। বোঝা গেল, ঐ উভয় দলের পিঁপড়ের মধ্যে দারুণ ঝগড়া হয়েছিল। কারণ মৃতের মাথা ও হাত দুটোর চারধারে একগজ চওড়া জায়গা নিয়ে উভয় প্রকার পিঁপড়ের শতশত মৃতদেহ ইতস্ততঃ ছড়িয়েছিল। মাঝে মধ্যেই ঐ দুই সংগ্রামী দলের কোন কোন সদস্য ভীষণভাবে জখম হয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল।

মৃতদেহের যে সামান্য অংশ অবশিষ্ট ছিল তা খাবার জন্য বাঘটা যে ফিরে আসবে না এটা পরিষ্কার জানা। তবে বাঘটা মৃতদেহটা ফেলে গেল কেন সেটাই বোঝা গেল না।

সাব ইনসপেক্টর তাঁর সঙ্গী কনস্টেবলটিকে মৃতদেহ অন্য জায়গায় সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে বললেন। তারপর তিনি কোনরকম কারণ ছাড়াই গালভরা সব কথা দিয়ে একটা বক্তব্য দাঁড় করালেন এবং আমাকে প্রমাণ স্বরূপ তাতে সই করতে বললেন। আমরা যখন বনবিভাগের আয়ুয়ের বিশ্রামাবাসে ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা প্রায় লাগে লাগে। রেঞ্জ অফিসারটি রাত্রের জন্য আমাকে তাঁর বাংলোতে থাকতে দিতে রাজী হলেন, কিন্তু কেটের শুকনো বিস্কুটের কথা স্মরণ হতেই আমি শিবানাপল্লীর ক্যাম্পে আমার জন্য যে মসলাপোসা মাংস অপেক্ষা করছে, তার কাছে ফিরে যাওয়া স্থির করলাম। সঙ্গে আমার টর্চ ছিল, কোন অসুবিধাই হবার কথা নয়।

অফিসার দুজনের কথা অমান্য করে রওনা হলাম। তাঁরা পেছন থেকে চীৎকার করে আমাকে সজাগ করে দিয়ে বললেন, হয়তো আমাকে আর শিবানাপল্লীর মসলাপোসা-মাংস খেতে হবে না। কারণ রাস্তাটার বেশীর ভাগই বক্রভাবে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ল্যাণ্টানার ঝোপ আর এদিক ওদিক ছড়ানো ছিটানো বাবুল গাছের চারার মধ্যে দিয়ে গেছে। অন্ধকার ক্রমশঃ ঘন হয়ে এল, আর সেই অন্ধকারের বুক ভেদ করে আমার টর্চের আলো মাত্র সরু একটা আলোর পথ তৈরী করলো।

আচমকা আমাকে একটা দারুণ মৃত্যুভয় ঘিরে ধরল। কোন শব্দ শুনতে পারছিলাম না। কেন যে আমাকে সাবধান করে দিয়ে ভীতু হরিণ ও অন্যান্য বুনো জীবজন্তুর ডাক আমার কানে এসে হাজির হচ্ছিল না তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। চারিদিকে গভীর নৈঃশব্দ্য। শুধু মাটি থেকে আমার রবার-সোলের জুতোর ঘষায় ক্ষীণ মচমচ আওয়াজ হচ্ছিল এবং মাঝে মধ্যে আমার পায়ের চাপ পড়ে ডালপালা এবং পাতা ভাঙ্গার মড়মড় শব্দ হচ্ছিল।

বাঘটা আমাকে লক্ষ্য করছে এই মনে ভেবে আমি হঠাৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালাম। কিন্তু কিছুই না, একটা জোনাকি পর্যন্ত দেখা গেল না। একটা ঝিঁঝিঁ ডেকে উঠে আমাকে একটু শান্তি দিয়ে গেল না।

এখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম কেন আমি এত ভয় পেয়ে গেছি।

আমি যে সম্পূর্ণ একা এই চিন্তাই আমাকে ভীত করে তুলেছে। আমার অদৃষ্টে যা ঘটতে চলেছে তা সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করার জন্য কোন জীবন্ত প্রাণী সেখানে ছিল না, আমাকে সান্ত্বনা দেবার মত কোন জনপ্রাণীও নেই। যদিও বাঘটাকে ঐ ঘুটঘুটে অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিলাম না এবং তার কিছুমাত্র সাড়া শব্দও আমার কানে পৌঁছচ্ছিল না, তবুও কেন জানি সে এখানে হাজির আছে সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। ঠিক আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে যতটা নিশ্চয় ছিলাম ঠিক ততটা।

আমি এটা খেয়াল করে দেখেছি, জঙ্গলে ভীষণ বিপদে পড়লে লোকে দুটোর মধ্যে যে কোন একটা কাজ করে। আক্রমণোদ্যত ক্রুদ্ধ হাতীর ভীষণ চীৎকার অথবা বাঘ বা চিতার বিকট গর্জনে হয় সে দিশেহারা হয়ে দৌড়িয়ে পালাতে থাকে নয়তো ভয়ে চলার শক্তি হারিয়ে একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়ে। এরকম অবস্থায় পড়লে কি করা কর্তব্য বা আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, কি করা যায় তা প্রায় ক্ষেত্রেই লোক একেবারেই চিন্তা করতে পারে না। আর সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারে অনেক কম জায়গায়ই। সাধারণতঃ ভাববার সময়ই থাকে না।

এখানে আমি বাঘের গর্জন বা হাতীর চীৎকার কিছুই শুনতে পাই না। তবে এখানে বাঘের উপস্থিতি সন্দেহ করে ভীত হয়ে যত জোরে দৌড়ে পারা যায় তত জোরে দৌড়ে ঐ বিপজ্জনক জায়গা থেকে পালাতে মন উৎসুক হয়ে উঠল। তবে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। কেননা, খুব বেশী জোরে দৌড়ুলে, বাঘটা আমাকে নির্ঘাৎ আক্রমণ করবে। মানুষখেকো বাঘ সমেত সমস্ত হিংস্র প্রাণীরাই জানে অন্যান্য জীবরা তাদের ভয় করে চলে। বাঘের দেখা পাওয়া মাত্রই যে শিকারের প্রাণ উড়ে যায়, তা দেখতেই বাঘ অভ্যস্ত এবং সেটা জানে বলেই বাঘের শিকার করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। আর তার ফলেই সে এত সাফল্যের সঙ্গে শিকার করতে পারে।

নিমেষের মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম যে নিজেকে বাঁচাবার একমাত্র পথ হচ্ছে না দৌড়ে অন্যপথ অবলম্বন করা। বাঘটা নিশ্চয় কোন জায়গায় গুড়ি মেরে বসে আমার ওপর নজর রেখেছে এবং আমার জন্য অপেক্ষা করছে। হয়তো সে আমার সামনে, নয়তো পেছনে অথবা পাশে যে কোন স্থান থেকে আমাকে আক্রমণ করবার সুযোগ খুঁজছে। আমার কাছে টর্চ থাকায় এবং টর্চের আলো গভীর অন্ধকার ভেদ করে চারিদিক উজ্জ্বল করে দেওয়ায় সে

এতক্ষণ আমাব ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে নি। অবশ্য সে নিশ্চয় বিরক্ত বোধ করছে। তবে তাকে আক্রমণে প্রলুব্ধ করতে হলে টর্চটা নিভিয়ে আমাকে দৌড়ুতে হবে। তাহলেই সে বাইবে বেবিয়ে আসবে।

কথাগুলো ভাবা মাত্রই একটা নির্দিষ্ট গতিতে হাঁটতে শুরু করলাম। যেতে যেতে সামনে পেছনে এবং উভয় পাশে টর্চের আলো ফেলতে লাগলাম। রাস্তাটা ছিল সংকীর্ণ, খুব বেশী হলে চ'ফুটের বেশী চওড়া হবে না।

পথটা এক জায়গায় মোড় নিয়েছিল। ওখানে পৌছুতেই টর্চের আলোতে সামনের দিকে একশ' গজ দূরে বা পাশ ঘেষে একটা পাথর দেখা গেল। পাথরটা ছিল ঢালু, দেখে মনে হল তার উঁচেতা ছ-সাত ফুট হবে। আমার ধারণা হলো প্রথমে জোরে হাঁটতে থাকলে সহজেই এক দৌড়ে গিয়ে পাথরটার মাথায় ওঠা যাবে। একথা ভাববার কারণ এই যে, আমার মাথায় একটা মতলব এল। মানুষখেকোটাকে লোভ দেখিয়ে দৃষ্টির সামনে আনার আমার ঐটাই একমাত্র উপযুক্ত জায়গা।

আমি আমার মতলবটা বেশ ভালো করে ঝালিয়ে নিয়ে হাঁটতে লাগলাম। বাঘকে আক্রমণে প্রবোচনা যুগিয়ে হেটে যাবার পক্ষে ঐ একশো গজ দূরত্বটা যথেষ্ট বেশী। আক্রমণোদ্যত বাঘেব গতিবেগ অবিশ্বাস্য এবং নিজের চোখে না দেখলে কল্পনা করা যায় না। তবুও পাথরটার পঞ্চাশগজ দূরে থাকতেই আমি মতলবটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করবো বলে স্থির করলাম।

গুলি ছুঁড়বার জন্য রাইফেলের ট্রিগার ঠিক করা আছে—এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে এবং পাথরটার ৫০ গজ দূরত্বে অবস্থান অনুমান করে নিয়ে আমি হঠাৎ টর্চ নিভিয়ে যথাসম্ভব জোরে দৌড়তে শুরু করলাম।

টর্চ নিভিয়ে দিতেই চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল। আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে টর্চ নিভিয়ে দৌড় আরম্ভ করবার আগে আমি পাথরটার অবস্থান কোথায় ভালভাবে করে দেখে নিয়ে সেদিকে ফিরে গিয়েছিলাম।

কিছুটা সচেতন হতেই এবং সে যা চাইছিল শিকার যে তাই করেছে তা বুঝতে বাঘটার বেশ কয়েক সেকেণ্ড সময় লেগে গেল। দৌড়ুতে দৌড়ুতে কেবল আমি চিন্তা করছিলাম হয়তো এখানে কোন বাঘই নেই, ভয় পেয়ে বোকার মত আমি বাঘ আছে বলে মনে করেছি।

হঠাৎ মানুষখেকোটা চারিদিক কাঁপিয়ে আমার পেছনে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। আমার আর গতি বাড়াবার উপায় ছিল না।

আমি যখন দৌড়ুতে দৌড়ুতে পাথরটার কাছে গিয়ে হাজির হলাম এবং পাথরটার ওপরে উঠে গেলাম তখন বাঘটা আমার কয়েক ফুট মাত্র পেছনে। আমি ফিরে দাঁড়িয়েই রাইফেল তুলে নিলাম এবং বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে টর্চের বোতাম টিপলাম। মানুষখেকো শয়তানটা সেই সুযোগে পাথরটার কাছাকাছি এসে গেছে এবং ওপরে উঠে আসবার জন্য লাফ দেবার উপক্রম করছে। আমি আর দেরী না করে রাইফেলের ট্রিগারে চাপ দিলাম। চারিদিক কাঁপিয়ে গুলি ছুটে গেল।

গুলি ছোঁড়ার বিকট আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ-খেকোটা উল্টে গিয়ে পিছিয়ে গেল। আমি পয়েণ্ট ৪০৫ রাইফেলের ট্রিগার টিপে দ্বিতীয় গুলিটা ছুঁড়লাম। কিন্তু কিছুই হলো না।

কিছুক্ষণ পরেই বাঘটা বিকট আওয়াজ করে তার বাঁ পাশে লাফিয়ে সরে গেল এবং সেখানকার লম্বা লম্বা ঘাসগুলোর ভেতর মিলিয়ে গেল। আমি আবার বাঘটা যেখানে মিলিয়ে গেল সেখানটা লক্ষ্য করে তৃতীয় গুলি ছুঁড়লাম।

আমি ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকাকালীন প্রথম গুলিটা ছুঁড়েছিলাম। কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে দ্বিতীয় গুলির শব্দ গুনহাণ্ডি পাহাড়ের ঢালে প্রতি-ধ্বনিত হবার আওয়াজ আমি শুনতে পেয়েছিলাম। আমি যে পাথরটার ওপরে দাঁড়িয়েছিলাম, সেটা থেকে পাহাড়টার দূরত্ব মাত্র এক মাইল।

গর্জন ক্রমে থেমে গিয়েছিল। তবে কি আমার দুটো গুলিই বিদ্ধ হয়েছে? না কি আমার গুলি দুটো বাঘটাকে ভয় দেখিয়েছে, স্পর্শ করে নি? হয়তো তার চাইতে খারাপ ব্যাপার ঘটেছে—আমি বাঘটাকে নাম মাত্র জখম করেছি।

বাঘটা যে-ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গিয়েছিল সেই ঝোপের উপর টর্চের আলো জ্বালিয়ে রেখে নিজে একটু শান্ত এবং স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নেওয়ার জন্য পাথরটার ওপর বসে পড়লাম। বিশেষ করে চিন্তা দূর করার জন্যই বসে পড়লাম। তখনই শুধু আমি বুঝতে পারলাম কত অল্পের জন্য আমি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি। বাঘটা যদি আমার আরও কাছে থাকতো বা আমার যে কোনও পাশে বা সামনের দিকে থাকত তবে আমি পাথরটার

কাছে পৌছুবার আগেই সে আমার আর পাথরটার মাঝখানে এসে হাজির হত। এছাড়া যে গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে সেটাই যদি প্রথমে থাকত তবে তো রক্ষাই ছিল না।

একটু স্বাভাবিক হওয়ার পর আমি শয়তানটার কি হয়েছে চিন্তা করতে লাগলাম। অত কাছে থেকেও আমি তাকে গুলিবিদ্ধ করতে পারি নি সেটাই আমাকে খোঁচা দিতে লাগল। আসলে আমি দ্রুতগতিতে দৌড়ুতে দৌড়ুতে শেষ মুহূর্তে পাথরটার ওপর এসে উঠেছিলাম। ভয়, আবেগ এবং পরিশ্রমে আমি দস্তবমত হাঁফাচ্ছিলাম। অতএব আমি নিশ্চিতই কিছুটা এলোমেলো ভাবে গুলি ছুঁড়েছিলাম। ফলে আমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে থাকতে পারে অথবা বাঘটাকে নামমাত্র আহত কবে থাকতে পাবে।

ঐ ঘন অন্ধকারে বাঘটাকে পেছু নেওয়া অসম্ভব। তাছাডা আমার গুলি যদি বাঘটার গায়ে না লেগে থাকে তবে সে একেবারেই পালিয়ে যাবে। আর যদি সে কিছু জখম হয়ে থাকে তবে আমি এখন শিবানীপল্লীর দিকে অগ্রসর হলে তার পক্ষে আমাকে অনুসরণ করাব সম্ভাবনা অনেক কম। তাই আমি নিমেষের মধ্যে স্থির করে ফেললাম যে, শিবানাপল্লীতে ফিরে যাব এবং পরদিন সকালে এসে বাঘটাব অনুসন্ধান কববো।

পথে নতুন কিছু অঘটন ঘটাব আগেই আমি শিবানাপল্লীতে ফিরে গেলাম। সেখানে গিয়ে ছোট্ট ক্যাম্পেব ভেতব শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম পরের দিনে কি করা যায়। পরমুহূর্তেই পকেটেব বিস্কুটগুলো দেখে অনুভব করলাম যে, আমি ক্ষুধার্ত। তখন মাংসেব টিন খোলার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

শিবানাপল্লীতে কোন আদিবাসী পথপ্রদর্শনকাবী পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল না। কিন্তু শের খাঁ নামে বিশেষ চরিত্রের একজন লোক ছিল। এই লোকটার জীবন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। তার বয়স ঠিক চল্লিশের কোঠায়। সে ছিল মুসলমান, একজন চোবা শিকারী ও কাঠচোর। আবার অনেকগুলো ডাকাতি করার জন্যও বিখ্যাত। গরুর গাড়িতে করে ডেঙ্কানিকোটা এবং আনচেট্টি গ্রামে শস্যেব বস্তা বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ঐ সব গাড়ি আটকে ডাকাতি করা হত।

প্রথম যে ডাকাতির কথাটা পুলিস জানতে পেরেছিল তখন পাঁচজন গাড়োয়ান পর পর সারি বেঁধে তাদের গাড়ি নিয়ে আমচেট্টি থেকে ডেঙ্কানিকোটা

যাচ্ছিল। যখন ডাকাতিটা হল তখন তারা গন্তব্য স্থল থেকে নয় মাইল দূরে ছিল। রাত একটা নাগাদ গরুগুলো বিরাট বোঝার গাড়ি নিয়ে খাড়াই পথ বেয়ে অতি কষ্টে এগোচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তার ওপাশ থেকে তাদের উদ্দেশে কর্কশ কণ্ঠে কে যেন ডেকে উঠল। কিন্তু তারা অন্ধকারে কাউকে দেখতে পেল না। কিন্তু ঐ আগন্তুক জানিয়ে দিল, ডাকাতদের হাতে বন্দুক আছে। তারা গাড়ি লুট করবে। গাড়োয়ানরা যদি বাধা দেয় তবে পাঁচজন গাড়োয়ানকেই গুলি করা হবে। আর যদি তারা বাধা না দেয়, ডাকাতদের আদেশ মেনে চলে তাহলে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। এরপরই তাদের আদেশ জারী করা হল—

পাঁচজনেই গাড়ি থেকে নেমে পড়ে যে রাস্তায় এসেছে সে রাস্তা ধরে হেঁটে একমাইল চলে যাবে। দশম মাইল স্টোনের কাছে গিয়ে বসে পড়বে এবং আগুন জ্বালিয়ে সকাল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। সকাল হলে গাড়ির কাছে ইচ্ছে হলে ফিরে আসতে পারো। তবে এটা স্মরণে রেখো তোমাদের অনুসরণ করে আমাদের একজন যাবে এবং সকাল পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আদেশ অমান্য করে বজ্জাতিপনা দেখাও তাহলে মনে রেখো তাকে আর কোনোরকম সতর্ক না করে সোজা গুলি করা হবে। তবে এটা তোমরা মনে রেখ, তোমাদের গাড়ির বা বলদের কোন ক্ষতি আমরা করবো না। তোমরা গরীব, তাই তোমাদের আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু তোমরা গাড়িতে করে যে ধনী লোকের জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছ, সেগুলোই আমাদের দরকার।

গাড়োয়ানরা তখন বাধ্য ছেলের মতো ওদের আদেশ মেনে নিল। বরং তাদের যে কিছু না করে ছেড়ে দিয়েছে সেজন্য নিজেদের ধন্য মনে করল। তারা পরের দিন ভোরে এসে সেই একই স্থানে গাড়িগুলোকে দেখতে পেল : কেবল দামী শস্যগুলোই নেই। বাকীগুলো গাড়িতে পড়েছিল। আসল কথা, ডাকাতরা সংখ্যায় কম ছিল, যদি বেশী লোক থাকতো তাহলে সবই ওরা নিয়ে যেতো।

এইভাবে ঐ রাস্তার উপরেই আরও দু-তিনবার ডাকাতি হল। ফলে ঐ পথ ধরে রাত্রিবেলা গাড়ি যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল এবং তাদের বদলে পুলিস রাস্তায় পাহারা দিতে লাগল। শের খাঁ সহ আরো কয়েকজনকে ডাকাতির সন্দেহে একজায়গায় জমা করা হল। তাদের মারধর করে হাজতে আটকে

রাখা হল। কিন্তু তারা যে ডাকাতি করেছে সেটা অস্বীকার করতে লাগল। কেবল বলতে লাগল, তারা নির্দোষ এবং যখন ডাকাতি হয় তখন তারা বিশেষ কাজের জন্য অন্য জায়গায় ছিল।

একবার এইরকম মারধর খেয়ে জগতে যে অবিচার চলছে তারস্বরে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করতে করতে শের খাঁ শিবানীপল্লীতে ফিরে আসছিল। কিন্তু সে যখন চেঁচাচ্ছিল তখন তার চোখে কপট দৃষ্টি। এভাবেই তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়।

"শের খাঁ" শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "ব্যাঘ্রদের মধ্যে প্রধান"। সে ডাকাত হলেও তার চরিত্রে কতকগুলো ভাল গুণ ছিল এবং সে কারণেই তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। শিবানীপল্লীতে গেলে কখনও আমি তার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে চা খেতে ভুলে যাই না এবং সেও আমার কোন কথা অমান্য করতে পারে না।

তাই এর আগের ঘটনাটা ঘটার পরই সকালবেলা আমি শের খাঁ-এর কাছে গিয়ে হাজির হলাম এবং তার সাহায্য প্রার্থী হলাম। আমি ভাল মতই জানতাম যে আমি যেহেতু খুব সামনে থেকে গুলি করেছি তাই লক্ষ্যচ্যুত হইনি। আমি বাঘটাকে যে ঠিকই গুলিবিদ্ধ করেছি সেটাই বারে বারে মনে হতে লাগল। তাই জঙ্গলে যে-বাঘের সন্ধান করতে যাচ্ছি তা আহত বাঘ এবং তাকে আয়ত্তে আনতে হলে কম করে দু'জন লোকের দরকার।

ঝোপঝাড়ে, পাতার উপরে এবং শক্ত ভূমিতে কোথায় রক্তের দাগ রয়েছে তা দেখে দেখে চলতে গেলে মন এবং চোখ দুটোই সতর্ক থাকা দরকার। এদিকে-ওদিকে, সবদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে দেখতে হবে কোথায় পাতার তলায়, গাছের গায়ে অথবা পাথরের উপর একফোঁটা রক্ত লেগে আছে। আবার এও হতে পারে যখন কেউ এইরকম মনোযোগ নিয়ে দেখার কাজে ব্যস্ত তখন বাঘটা সামনে কোন জায়গায় ওৎ পেতে বসে অপেক্ষা করছে। আবার এও হতে পারে যে, বাঘটা সেই সময় ঐ ব্যক্তির ডান অথবা বাঁ দিকে কোন ঘাসের ঝোপ, বাঁশ ঝাড়, গাছ অথবা উঁই ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে থেকে শিকারকে তার লাফের পাল্লার মধ্যে আসতে দিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করছে। অন্যদিকে এও হতে পারে যে, বাঘটার যখন সন্ধান চলছে, বাঘটাই হয় তো তখন ঐ ব্যক্তিকে অনুসরণ করছে। পরম নিশ্চিন্তে বাঘের পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে করতে বাঘের উপস্থিতি সে হয়তো খেয়ালই করবে না।

আবার আহত বাঘটার দিকে নজর রাখতে গেলে দেখা যাবে বাঘের চলার দাগ হারিয়ে গেছে। সোজা কথা, দুটো কাজ সম্পূর্ণভাবে সফল করতে হলে একজনের পক্ষে সম্ভব নয়, দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্য দরকার। একজন বাঘের রক্ত ও পায়ের ছাপ খুঁজে বার করবার কাজে মনোযোগী হবে, আর অন্যজন ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পিছনে সতর্ক নজর রাখবে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তির উপরে শুধু তার জীবনই নয় তার সঙ্গীর জীবনও নির্ভর করছে।

শেরখাঁ চটপট রাজী হয়ে গেল। কিন্তু যাত্রা শুরু করবার আগে সে আমাকে এক কাপ চা খেয়ে নেবার অনুরোধ করলো। সে একবার হাততালি দিতেই তার চার স্ত্রীর একজন সাড়া দিল। সে আমার জন্য সবচেয়ে সেরা চা তৈরী করতে বলল।

আমরা চায়ের পর্ব শেষ করে যাত্রা করলাম। শের খাঁর বন্দুক নেই। তার বন্দুকের বদলে একটা জং-ধরা তরবারি এনেছে। সে জানাল, ঐ তরবারি তার পৈতৃক সম্পত্তি, ওটা ছিল তার প্রপিতামহের বাবার। যিনি মহীশূরের শের বলে পরিচিত মহান টিপু সুলতানের অধীনে সৈনিকের কাজ করতেন। এই ব্যক্তির প্রপিতামহের বাবা টিপু সুলতানের সমসাময়িক হতে পারেন কিনা তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখতে গেলে যে অঙ্ক করার দরকার তা করবার সময় আমার নেই। আমরা ওখান থেকে কথা বলতে বলতে অনেকটা রাস্তা এগিয়ে এসেছি। আমি এমনভাবে একটা প্রশ্ন করলাম যেন বাতাসের উদ্দেশে বলছি—"অন্ধকারের ভেতর থেকে কেউ অনেকগুলো গরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে গুলি করবে বলে ভয় দেখাচ্ছে; অথচ তার কাছে বন্দুক নেই। এটা কি করে হতে পারে শের খাঁ?"

মুহূর্তের জন্য দুজনেই নির্বাক হয়ে রইলাম। কারোর মুখেই কথা নেই। তারপর একসময় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শেরখাঁ বলে উঠল, "আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা ছিল তাই। ঐ সময় আমার সঙ্গে বন্দুক বা অন্য কেউ ছিল না। আমার কোন কালে বন্দুক ছিল না, এখনও নেই। আর সাহেব, ঐ ডাকাতের দলটা ছিল আমাকে আর আমার তিন স্ত্রীকে নিয়ে গঠিত। আমার অন্য স্ত্রীর এসব করবার বয়স আর নেই। কিন্তু তার বুদ্ধি সাংঘাতিক। এসব মতলব সেই দিয়েছিল।

আমি তার কথা অবিশ্বাস করলাম না।

আমরা প্রায় আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আগের দিন

রাত্রে যে ঢালু পাথরটার ওপর থেকে শয়তানটাকে গুলি করেছিলাম সেটা দেখা যাচ্ছে। মাটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে আমরা হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু কোন রক্তের ফোঁটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাছাড়া এখানকার মাটি এত শক্ত যে বাঘের পায়ের ছাপ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পথের ধারে যে ঝোপটার মধ্যে বাঘটা উধাও হয়েছিল, আমি মুখে কোন কথা না বলে আঙুল দিয়ে দেখালাম।

আমি আগে, আর আমার পেছনে হাঁটছিল শের খাঁ। যদিও চারিদিকে স্তব্ধতা বিরাজ করছে তবুও প্রমাণ পেলাম যে, একটু আগেই এই রাস্তা দিয়ে কোন ভারী দেহবিশিষ্ট জন্তু গিয়েছে। বেশ কয়েকটি গাছের ডাল তখনও ঝুলে রয়েছে। আমরা কয়েক পা এগোনোর পরেই হঠাৎ চমকে থেমে গেলাম— রক্ত !

তামাটে রঙের শুকনো পাতার ওপর উজ্জ্বল লালরঙের রক্তের ছিটে লেগেছিল। আমি আঙুল দিয়ে রক্তটা তুলে নিয়ে হাতের চেটোয় ঘসে ফেললাম ; রক্তটা ভারী এবং জমে গেছে। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে আগের দিন রাত্রে আমি যে গুলি ছুড়েছি সেটা বাঘটাকে রীতিমতো বিদ্ধ করেছে এবং ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।

এবার আমরা পরস্পরের স্থান বদলে নিলাম। আগে শের খাঁকে দিলাম। সে কেবল তার সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে রক্তের সন্ধান করে যাবে আর আমি চারিদিক দেখতে দেখতে নিজেকে এবং তার দিকে নজর রাখবো।

শের খাঁ লোকটি যদিও জাত পথপ্রদর্শনকারী ছিল না তবুও সে তার বুদ্ধি দিয়ে ব্যাপারটা পুষিয়ে নিয়েছিল। জংলী অধিবাসীদের আর কেউ হলে দাগ অনুসরণ করে চলতে যত সময় নিত তার চাইতে অনেক বেশী সময় নিয়ে বেশ হাঁফাতে হাঁফাতে বাঘটার চলার দাগ খুজছিল শের খাঁ। কিন্তু সে একটার পর একটা রক্তের দাগ খুঁজে বার করছিল। বোঝা গেল বাঘটার গা থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হয়েছে। নিঃসন্দেহ, লাফ দেবার ফলে তার শরীরের উপর যে চাপ পড়েছে তাতে ক্ষতের মুখ খুলে গেছে। ফলে, বাঘটার সমস্ত চলার পথ ধরে রক্ত পড়েছে। আর তাই বাঘটাকে অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে খুবই সহজ হয়ে পড়েছে।

সামনের দিকে একটা ক্ষীণ নড়াচড়া আমার নজরে পড়ল ! আমি হাত দিয়ে ধীরে শের খাঁকে স্পর্শ করলাম ! এটা থামার ইঙ্গিত। আগেই আমাদের বলা

ছিল। তাই শের খাঁ থেমে গেল এবং একেবারে নিশ্চল হয়ে রইল। আমি রাইফেল কাঁধে নিয়ে সেই জায়গাটার দিকে উচিয়ে ধরলাম। চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। কারণ শত্রুর জন্য ওৎ পেতে থাকায় বা পেছন থেকে শত্রুকে অনুসরণ করায় আহত বাঘ যে কতটা চালাকির আশ্রয় নেয় তা আমার ভালোই জানা।

আমাদের কয়েক ফুট দূরে সামনের দিকে একটা ছোট গাছের ডাল এমন ভাবে নড়তে লাগল যে ব্যাপারটা ভাল মনে হল না। আমি গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরী হলাম। হাত বাড়িয়ে শের খাঁর ঘাড় চেপে ধরে তাকে টেনে পেছনে নিয়ে এলাম।

আবার ডালটা নড়তে লাগল। পলকহীন চোখে এক মিনিট তাকিয়ে রইলাম। তারপর শান্ত হলাম। আমি অহেতুকই ভয় পেয়েছি। দেখলাম ঝুলন্ত ডালটার সবগুলো পাতা ঝুলে আছে। একটা হাতী ডালটা ভেঙেছে এবং ডালটার ভার ধারণে সক্ষম এমন কতগুলো শক্ত লতা আটকে ডালটা যেখান থেকে ভেঙেছিলো সেখানেই ঝুলছে।

এই অবস্থায় কথা বলা একদম চলবে না। তাই আমি কথা না বলে আবার শের খাঁকে ঠেলে সামনে দিলাম। তারপর তাকে এগিয়ে যাওয়ার ইশারা করলাম।

খানিকটা এগিয়ে যেতেই হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা ঝোপের তলাকার শুকনো ঘাস রক্তে লাল হয়ে আছে। মনে হয় গোটা জায়গাটাতে বড় বাঘটা নিশ্চয়ই এখানে গড়াগড়ি দিয়েছে। বাঘটা তার ক্ষত বিক্ষত মুখটা থাবা দিয়ে চেপে ধরেছিল। ফলে জমাট-বাঁধা রক্ত চাপ হয়ে পড়ে আছে।

আমি আবার শের খাঁর দেহ স্পর্শ করে তাকে থামিয়ে দিলাম। কান পেতে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলাম। কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। আমরা সারা রাস্তা চুপচাপ ছিলাম। কিন্তু এখানে এসে নীরবতা ভঙ্গ করলাম কিছুটা। অবশ্য এর একটা উদ্দেশ্য ছিল। যদি আশেপাশে বাঘটা থাকে তাহলে সে আমাদের শব্দ শুনে গর্জন করবে, হানা দেবে বা নিঃশব্দে পালিয়ে যাবে। কিন্তু সেরকম কিছুই হল না।

রক্তের দাগটা এখানে এসে বাঁ দিকে মোড় নিয়েছে। বুঝতে পারলাম, পাহাড়ের পাদদেশে যে ক্ষুদ্র নদীটা রয়েছে বাঘটার গন্তব্যস্থল সেই দিকে। আঘাতের ফলে বাঘটা এতই কাহিল হয়ে পড়েছিল যে, সে তৃষ্ণার্ত হয়ে

উঠেছিল। আর তাই জলের সন্ধানে ঐ নদীতে যেতে বাধ্য হয়েছে। বছরের এই সময়টা নদীটা শুকিয়ে যায়। কেবলমাত্র বিক্ষিপ্ত কয়েকটা জায়গায় জল জমে থাকে। বাঘটা ঐ জলার একটার দিকে গেছে। যে পর্যন্ত না তার ক্ষত ভাল হবে বা ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হবে সেই পর্যন্ত বাঘটার এই নদীর কাছাকাছি থাকারই বেশী সম্ভাবনা।

আমি জীবজন্তুকে আহত বা জখম করতে ভালোবাসি না। যদি কোন জন্তুকে আহত করি তাহলে তার যন্ত্রণার উপশম করার জন্য তাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করি। বাঘটার রক্ত যেরকম ধারায় পড়েছে তাতে মনে হল আমার গুলি তাকে ভীষণভাবে আহত করেছে এবং তার মৃত্যুর সম্ভাবনাই বেশী।

আমি শের খাঁকে থামিয়ে কয়েক মিনিট ধরে নীচু স্বরে কথা বললাম। নদীগর্ভে একটা জলা আছে সেটা আমার জানা। কিন্তু আন্দাজ করলাম সেটা এখান থেকে প্রায় দু' মাইল হবে। তাই শের খাঁ আমার কথায় রাজী না হয়ে বলল, পাশেই আর একটা জলা আছে। সেটা ছোট হলেও জল বারোমাস থাকে। সেটা মাত্র এক মাইল দূরে। তাই আমরা রক্তের দাগ অনুসরণ করে এগোতে লাগলাম। একটু পরেই শের খাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ হল।

আমরা যতই নদীগর্ভের দিকে এগোতে লাগলাম ততই ভূমির নিম্নতা বাড়তে লাগল। বুনো মোরগের বারবার চীৎকার শুনে বুঝতে পারছিলাম যে আমরা নদীগর্ভের কাছেই পৌঁছে গিয়েছি। নদীর উভয় দিকে যে বিস্তৃত গাছপালা ও ঝোপঝাড়ের সারি ছিল তার ভেতর থেকেই বুনো মোরগগুলো ডাকছিল। শুকনো বালির তলা দিয়ে যে অদৃশ্য নদী বয়ে চলেছে সেই জলেই গাছপালাগুলো বেঁচে আছে। কয়েক মিনিট যেতেই জল না পাওয়া এবং সূর্যের প্রখর উত্তাপে শুকিয়ে যাওয়া ছোট ছোট ঘাস অদৃশ্য হল এবং তার স্থানে লম্বা লম্বা সবুজ ঘাস দেখা গেল। বুঝতে পারলাম আমরা নদীর তটে পৌঁছে গিয়েছি।

ডানে বাঁয়ে নদীগর্ভের শুকনো বালি দেখা যেতে লাগল। রক্তের ফোঁটা সোজা চলে গেছে। বুঝতে অসুবিধা হল না, ঐ আহত বাঘটা আজ ভোরেই হোক বা কাল রাত্রেই হোক তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এই জলহীন বালিরাশির মধ্যে কি যন্ত্রণাই না ভোগ করেছে!

কিন্তু শের খাঁ নীচু স্বরে জানাল যে তার পরিচিত জলাটা বাঁ দিকে। বাঘটা ভুল করেনি, বাঘের চলার দাগ ঐ জলাটার দিকেই। আবার আমি আমার

সাথীর সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করলাম। এখন আর রক্তের দাগ খুঁজে খুঁজে চলতে হচ্ছিল না। কারণ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, বাঘটা ঐ জলার দিকেই গেছে। এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঐখানেই তার সন্ধান পাব। আমরা ইতিমধ্যে একটা বাঁক ঘুরলাম কিন্তু কোন জলা না দেখতে পেয়ে আমি মুখে কিছু না বলে চুপ করে রইলাম।

শের খাঁ তখন এগিয়ে এসে পেছন থেকে একটা চওড়া শীর্ষদেশ বিশিষ্ট পাথরের মাটির উপর বেরিয়ে আসা অংশকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

পাথরটার ওপর দিয়ে একটা টিট্টিভ ডাকতে ডাকতে উড়ে পালাল। বুঝতে পারলাম পাহাড়ের কোন গর্তের মধ্যে জল আছে। আমাদের কাছে সেটা অদৃশ্য। ওখানে নদীটা ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। দু'পাশের তীর একসঙ্গে মিশে গেছে এবং ঘন ঝোপঝাড়ের সৃষ্টি হয়েছে।

আবার আমরা থামলাম। চারিদিক নিশ্চুপ। বাঘটা যে ওখানে আছে এরকম কোন চিহ্ন আমরা পেলাম না। এখন আর কোন রক্তের দাগও দেখতে পাচ্ছিলাম না। বুঝলাম বাঘটা নদীগর্ভের রাস্তা ছেড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে।

অবশেষে আমরা ঐ জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ছোট্ট জলাশয়টার জলে এবং জলাশয়টা পর্যন্ত নেমে আসা ঢালু পাথরটা থেকে কতবড় দুঃখবহ কাহিনীই না প্রকাশিত হয়ে পড়ছিল। কারণ জল রক্তে লাল হয়েছিল। এবং পাথরটা রক্তে শু কয়ে চটচট করছিল। তৃষ্ণা নিবারণ এবং ক্ষতের যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য যন্ত্রণাদগ্ধ শয়তানটা জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে শুয়েছিল। পাথরটার বহু জায়গায় রক্তের ওপরেই নিজের পায়ের ছাপ পড়েছে। অবশেষে সে নদী তীরে নিরাপদ আশ্রয় নেবার আশায় আবার রওনা হয়েছে। আমার এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। তাই জানতাম, এই মানুষখেকো হিংস্র জানোয়ারটাও অন্যান্য জন্তুর মত মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রতীক্ষায় শীতল ঝোপঝাড়ের আড়ালে এসে আশ্রয় নেবে।

তারপর আমার মনে পড়ল, যতদূর জানা গিয়েছে, কোন বিশেষ কারণ ছাড়াই এই বাঘটা একজন মানুষকে হত্যা করেছে। এখনই যদি তাকে মারা না হয় তাহলে ভবিষ্যতে যে একটা পাকা মানুষখেকোতে পরিণত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি শের খাঁকে ওখানেই দাঁড়াতে বলে বাঘটাকে খুঁজে বের করে হত্যার উদ্দেশ্যে এগোতে লাগলাম।

হঠাৎ পিছনের দিকে একটা সামান্য শব্দ পেয়ে পেছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম, শের খাঁ আমাকে অনুসরণ করছে। ধারণা হলো, হয়তো নাটকের শেষ দৃশ্য দেখার বাসনা তার মনে জেগেছে। অথবা তাকে একা রেখে আসার ভয়েই সে চলে এসেছে। আমরা খানিকটা এগিয়ে গেলাম।

এমন সময় হঠাৎ নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে বাঘ হুঙ্কার তুলল। মনে হল আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার কাছাকাছি থেকেই হুঙ্কারটা আসছে। এর পরের ব্যাপারটা অতি দ্রুত ঘটে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ঝোপঝাড় সরিয়ে একটা বিরাট ভারী দেহ প্রায় আমার মাথার উপর দিয়ে গিয়ে শের খাঁর উপর পড়ল। শের খাঁ আর আমার দূরত্ব ছিল মাত্র দুই ফুট।

শের খাঁ চীৎকার করতে করতে পাগলের মত চক্রাকারে ঘুরতে লাগল আর তার ধারবিহীন তরবারিটা ঘোরাতে লাগল। ভোঁতা অস্ত্রটা গিয়ে একসময় বাঘের গায়ে আঘাত করল এবং দেহের একপাশে বিদ্ধ হল। শের খাঁ পড়ে গিয়ে চেঁচাতে লাগল। বাঘটাও তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু শের খাঁর ভাগ্য ভালই বলতে হবে। কারণ সে বিপদে পড়ে ভয়ে তার উপস্থিত বুদ্ধি হারায় নি। তাই বাঘটা যখন তাকে কামড়াতে চেষ্টা করছিল তখন সে দুহাত দিয়ে মাথা আর মুখ ঢেকেছিল। আমি বাঘের পেছন দিকে লক্ষ করে রাইফেলের নিশানা ঠিক করলাম এবং বন্ধুর যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে সতর্ক হয়ে গুলি ছুঁড়লাম।

আবার দ্বিতীয়বার গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে শের খাঁ ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে এক লাফে বাঘটার থাবার নাগালের বাইরে চলে গেল। এরপর এই নাটকের সমাপ্তি ঘটল।

তবে একটা আশ্চর্যের বিষয় যে, আমার বন্ধুটি বলতে গেলে আহতই হয় নি। কেবল তার গায়ে কয়েকটা থাবার আঁচড় লেগেছিল। দেখলাম, আমার আগের দিন রাত্রের গুলি বাঘটার কণ্ঠনালী এমন ভাবে ভেদ করেছিল যে, তার নাকের কাছের সমস্ত মাংস সামনের দিকে ঝুলে পড়েছিল। এর হাত থেকে হতভাগ্য জীবটা কোনদিনই মুক্তি পেত না।

সৌভাগ্যক্রমে শের খাঁ যে নিশানা করেছিল বাঘটাকে লক্ষ্য করে তা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় নি। কারণ আমি তার তরবারির কাছাকাছি ছিলাম। যদি শের খাঁ তার তরবারিতে বাঘটাকে বিঁধতে না পারতো তাহলে সেটা সোজা আমাকে দু' টুকরো করে দিত।

পরে আমরা আলোচনা করবার সময় এই কথাটা উল্লেখ করায় শের খাঁ হেসে উঠেছিল। সে বলল, আমি নাকি তার প্রতিশোধ নিয়েছি। কারণ, আমি বাঘটার ঘাড় লক্ষ্য করে যে গুলিটা ছুঁড়েছিলাম সেটা শের খাঁর মাথার কয়েক ইঞ্চি মাত্র উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। শের খাঁ আমাদের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্মারক হিসাবে বাঘের চামড়াটা নিতে চাইল। অনেক দোষ-ত্রুটি থাকলেও শের খাঁ যে দুঃসাহসী ও আকর্ষণীয় ব্যক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া সে যেভাবে চার চারটে স্ত্রীকে নিয়ে মানিয়ে গুছিয়ে ঘর করছিল তার জন্য তাকে আমি ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না। আমি আশা করি, স্ত্রীদের প্রতি শের খাঁ এবং শের খাঁর প্রতি স্ত্রীদের এই ভালবাসা বহুদিন বজায় থাক!

আমরা ক্যাম্পের কাছে আগুনের পাশে গরম হতে হতে শের খাঁর সঙ্গে নিজেদের জীবনের দুঃসাহসিকতাপূর্ণ এবং ভয়াবহ ঘটনার গল্প করতে লাগলাম। শের খাঁও তার জীবনের অনেক অসম সাহসিকতার গল্প বলতে লাগল। তখন ক্যাম্পের বাইরে বিরাজ করছে অন্ধকার, দূরের জঙ্গলটা ঘন আঁধারে ঢাকা।

আমরা আগুনের তাপ নিতে লাগলাম। হঠাৎ শের খাঁর ঘরের পেছন থেকে শেয়ালের দল ডেকে উঠল তাদের নিজস্ব সুরে—"হুক্কা হুয়া! হুক্কা হুয়া! হুয়া! হুয়া।"

তারপরেই হঠাৎ একটা নৈঃশব্দ চারিদিক ঘিরে ধরল। যেন মুহূর্তের মধ্যে গভীর নিস্তব্ধতা এসে গিলে ফেলল গোটা পৃথিবীকে। এই নীরবতার বিশেষত্ব অনুভব করা কঠিন নয়। এই নীরবতার কারণটাও কারও অজানা নয়। অভাবিতের আবির্ভাবকে চিহ্নিত করে এই নীরবতার জাগরণ, এ নীরবতা সম্পূর্ণ নীরবতা, যেন নীরবতার বোতাম টিপে দেওয়া হয়েছে।

এরপর দূরে পাহাড়ের অন্যদিক থেকে একটা ডাক শোনা গেল—উ—ন্! গাক্ গাক্!" ঐ ডাক পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, বনের বুক চিরে, উপত্যকার দু-পালার মাথার উপর দিয়ে ভেসে আসতে লাগল।

একটা বাঘের গর্জন!